৩৫ তম বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি

কৃতজ্ঞতাঃ Samad Azab, Md Zakir Hossain, Study Venture

ভূমিকম্প

লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি + বাংলা ২য় পত্র
ভূমিকম্প: উৎপত্তি, কারণ,পরিমাপ,ট্যাকটোনিক প্লেট, ভূমিকম্প জোনে বাংলাদেশের অবস্থান,ঝুঁকি, প্রস্তুতি ও করণীয়

Related Topics ::::
বাংলাদেশ বিষয়াবলি : Nature and challenges, Geography of Bangladesh.
বাংলা ২য় পত্র : রচনা (৪০ নম্বর)

********* বাংলাদেশে ভূমিকম্প: ঝুঁকি, প্রস্তুতি ও করণীয় **********

********** ভূমিকম্প কী? **********

ভূ মানে পৃথিবী আর কম্পন হলো কাঁপা; সোজাভাবে ভূমিকম্প হলো পৃথিবীর কেঁপে ওঠা। তার মানে পৃথিবী যখন কাঁপে তখন আমরা তাকে ভূমিকম্প বলি। পৃথিবীতে বছরে গড়ে কত ভূমিকম্প হয়, শুনলে কপালে উঠতে পারে চোখ। বছরে গড়ে ছয় হাজার ভূমিকম্প হয়। তবে এগুলোর অধিকাংশই মৃদু যেগুলো আমরা টের পাই না।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্লেটের মাঝে দিন দিন প্রচুর শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে। এই শক্তির হঠাৎ অবমুক্তিতে পৃথিবীর ভূমিতে এক ধরনের কাঁপুনির সৃষ্টি হয় যা সিস্মিক তরঙ্গ নামে পরিচিত। এই কম্পনের নামই ভূমিকম্প।

ভূমিকম্প বলতে পৃথিবীপৃষ্ঠের অংশবিশেষের হঠাৎ অবস্থান পরিবর্তন বা আন্দোলনকে বোঝায়। হঠাৎ বুঝতে পারলেন আপনার ঘরের কোনো জিনিস নড়ছে, দেয়ালের ঘড়ি, টাঙানো ছবিগুলো নড়ছে, আপনিও ঝাঁকুনি অনুভব করছেন, তখন বুঝতে হবে ভূমিকম্প হচ্ছে।

********** ভূমিকম্প কেন হয় **********
ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ। সাধারণ ভৌগোলিক তলের বিচ্যুতি, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ইত্যাদি কারণে ভূমিকম্প হয়। এছাড়া ভূমিতে মাইন বিস্ফোরণ, গভীর নলকূপ হতে অত্যধিক পানি উত্তোলন, তেল ও কয়লা খনি এবং পরমাণু পরীক্ষার কারণেও ভূমিকম্প হয়। সাধারণত তিন ধরনের বিচ্যুতি কারণে ভূমিকম্প হয় নরমাল রিভার্স এবং স্টাইক স্লিপ।

********** ভূমিকম্পের উৎপত্তি **********
সাধারণত তিনটি প্রধান কারণে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়ে থাকে-
১. ভূপৃষ্ঠজনিত
২. আগ্নেয়গিরিজনিত
৩. শিলাচ্যুতিজনিত

********** ভূমিকম্পের প্রকারভেদ **********
সাধারণত তিন ধরনের ভূমিকম্প হয়ে থাকে-
প্রচণ্ড,
মাঝারি ও
মৃদু।

আবার উৎসের গভীরতা অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-
অগভীর,
মধ্যবর্তী
গভীর ভূমিকম্প।

ভূমিকম্পের কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠের ৭০ কিলোমিটারের মধ্যে হলে সেটি অগভীর ভূমিকম্প, ভূমিকম্পের কেন্দ্র ৭০ থেকে ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে হলে সেটি মধ্যবর্তী ভূমিকম্প এবং ভূমিকম্পের কেন্দ্র ৩০০ কিলোমিটারের নিচে হলে সেটিকে গভীর ভূমিকম্প বলে।

উপরের আলোচনা থেকে অনেকেই হয়তো ধারণা করে নিয়েছেন ভূমিকম্প বেশী হবার সম্ভাবনা থাকবে প্লেট বর্ডারে। হ্যা, আসলেই তাই। যেখানেই দুটো প্লেটের সংযোগস্থল রয়েছে সেখানেই ঘর্ষণ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকবে এবং এর ফল স্বরূপ হবে ভূমিকম্প। নিচের ছবিটি দেখুন। এই ছবিতে টেকটনিক প্লেটগুলো এবং সেগুলোর নাড়াচাড়ার গতি পথ দেখানো হয়েছে। জাপান, চিলি, হেইতি বা ইন্দোনেশিয়ার দিকে যদি তাকান তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন কেন ঐ স্থানগুলোতে নিয়মিত বড় বড় ভূমিকম্প হয়ে থাকে। গোটা পৃথিবীতে মোট ১৩টি বড় টেকটনিক প্লেট এবং ছোট ছোট ৩০টি টেকটনিক প্লেট সমন্বয়ে গঠিত।

********** ভূমিকম্পের পরিমাপ **********
সিসমোগ্রাফ আবিষ্কারের আগে মানুষ শুধু বলতে পারত ভূমিকম্প হয়েছে। কিন্তু কোন মাত্রায় হলো, বলা সম্ভব ছিল না। আধুনিক সিসমোগ্রাফের বয়স প্রায় ১৫০ বছর। ভূমিকম্প মাপা হয় দুইভাবে- তীব্রতা এবং প্রচণ্ডতা বা ব্যাপকতা। ভূমিকম্পের মাত্রা মাপা হয় রিখটার স্কেলে। স্কেলে এককের সীমা ১ থেকে ১০ পর্যন্ত। রিখটার স্কেলে মাত্রা ৫-এর বেশি হওয়া মানে ভয়াবহ দুর্যোগের আশঙ্কা। মনে রাখতে হবে, ভূমিকম্প এক ডিগ্রি বৃদ্ধি পেলেই এর মাত্রা ১০ থেকে ৩২ গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

********** রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা **********
৫ - ৫.৯৯ মাঝারি
৬ - ৬.৯৯ তীব্র
৭ - ৭.৯৯ ভয়াবহ
৮ - এর ওপর অত্যন্ত ভয়াবহ

********** রিখটার স্কেল **********
ভূমিকম্প ফলে যে শক্তির অবমুক্ত হয় তা পরিমাপের জন্য যে মানদন্ডের ব্যবহার করা হয় তা রিখটার স্কেল নামে পরিচিত। ১৯৩৫ সালে মার্কিন পর্দাথবিদ চালর্স ফ্রান্সিস রিখটার এবং জার্মান ভূতত্ববিদ বেনো গুটেনবার্গ এই স্কেল উদ্ভাবন করেন। আর যে যন্ত্রের

সাহায্যে ভূমিকম্প মাপা হয় তাকে সিস্মোমিটার বলে। ভূমিকম্পের ফলে বিশেষ তরঙ্গ (সিস্মিক তরঙ্গ) তৈরি হয়। সিস্মোমিটারে সাহায্যে এই তরঙ্গের ধরনের পাঠ নেওয়া হয়। এই তরঙ্গের বিস্তারে ১০ ভিত্তিক লগারিদম নিয়ে রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের আপেক্ষিক তীব্রতা গণনা করা হয়। যেহেতু স্কেলটি ১০ ভিত্তিক লগারিদম তাই এর প্রতি ২ এককের পার্থক্য দশমিক স্কেলের প্রতি ২ এককের পার্থক্যের ১০ গুণ। অর্থাৎ রিখটার স্কেল অনুযায়ী ৬.০ মাত্রাতে ভূমিকম্পের যতকুটু কম্পন অনুভূত হয় ৭.০ মাত্রার ভূমিকম্পে তার চেয়ে কমপক্ষে ১০ গুণ বেশি কম্পন অনুভূত হবে।

এখন পর্যন্ত রেকর্ড করা সবচেয়ে তীব্র ভূমিকম্পের মাত্রা হল ৯.৫; যা ১৯৬০ সালের ২২ মে মাসে সংগঠিত হয়। এর উৎসস্থল ছিল চিলির রাজধানী সান্তিয়াগো থেকে ৭০০ কিলোমিটার দূরে ক্যানিটি নামক স্থানে এটি গ্রেট চিলিয়ান আর্থকোয়াক নামে পরিচিতি এর প্রভাবে সৃষ্ট সুনামি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়িয়ে এশিয়া মহাদেশের জাপান ও ফিলিপাইন এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল।

*****কম্পনের তীব্রতা মডিফায়েড মার্সিলি ইনটেনসিটি (এমএমআই)*****
ভূমিকম্পের মাত্রা রিখটার স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু কম্পনের তীব্রতা একাধিক যা মডিফায়েড মার্সিলি ইনটেনসিটি (এমএমআই) স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হয় (১ থেকে ১২ রোমান সংখ্যার মাধ্যমে)। কম্পনের তীব্রতা ভূমিকম্পটির উৎসস্থল থেকে দূরত্বের সঙ্গে সাধারণত কমতে থাকে এবং । নেপালে ২৫ এপ্রিলের এই ভূমিকম্পে কাঠমান্ডুতে আট থেকে নয়, ভারতের উত্তরাঞ্চলে সাত থেতে আট, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে চার থেকে পাঁচ, ঢাকায় তিন থেকে চার তীব্রতা ছিল। মাত্রা এবং তীব্রতাকে গুলিয়ে ফেলে একত্রীকরণ করা ভুল, যা গণমাধ্যমের কর্মীরা প্রায়ই করে থাকেন। বাংলাদেশ ছোট তীব্রতায় কম্পিত হলেও মানুষ ভয়ংকরভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে।

********** ট্যাকটোনিক প্লেট **********
১৯১২ সনে জার্মান বিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়েগনার পৃথিবীর মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এক সময় পৃথিবীর মহাদেশগুলো একত্রে ছিল যা কালক্রমে ধীরেধীরে একে অপরের থেকে দূরে সরে গিয়েছে। ওয়েগনারের এই তত্বকে বলা হয় কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট। এ তত্ব বলে পৃথিবীর উপরিতল কতগুলো অনমনীয় প্লেটের সমন্বয়ে গঠিত। এই প্লেটগুলোকে বলা হয় ট্যাকটোনিক প্লেট। একেকটি ট্যাকটোনিক প্লেট মূলতঃ পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গলিত পদার্থের বাহিরের আবরণ যা একটি পাথরের স্তর। ভূ-স্তরে যা কিছু রয়েছে তা এই প্লেটগুলোর উপরে অবস্থিত।

গোলাকার এই পৃথিবী অনেকগুলো ব্লকে বিভক্ত। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত মূল যে চারটি স্তর আছে এর মধ্যে কেন্দ্র থেকে প্রথম স্তরটি ১২০০ কিমি., ২য় টি ২৩০০ কিমি., ৩য় টি ২৮০০ কিমি. এবং ত্বকের স্তরটি মাত্র ৮০ কিমি. পুরু। সর্বশেষ বা ত্বকের এই স্তরটি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একটি স্তর নয় বরং বিভিন্ন ব্লক বা প্লেটে বিভক্ত যা ট্যাকটোনিক প্লেট (tectonic plates) নামে পরিচিত।

ট্যাকটোনিক প্লেটগুলো একে অপরের সাথে পাশাপাশি লেগে রয়েছে। এগুলো প্রায়ই নিজেদের মাঝে ধাক্কায় জড়িয়ে পড়ে। কখনও মৃদু, কখনও সজোরে। যেহেতু প্লেটগুলো শিলা দ্বারা গঠিত, তাই ধাক্কার ফলে তাদের মাঝে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়। এই ঘর্ষণের মাত্রা অধিক হলে এক ধরনের শক্তি নির্গত হয় যা ভূ-স্তরকে প্রকম্পিত করে। যদিও ভূমিকম্পের আরও কারণ রয়েছে (যেমন আগ্নেয়গিরি), তবে এই কারণটিই অধিকাংশ ভূমিকম্পের জন্যে দায়ী।

ট্যাকটোনিক প্লেট একটির সাথে অন্যটির ঘর্ষনের সৃষ্টি হয়, আঘাত করে এবং কখনো পিছলে পরার ঘটনা ঘটে। দুটি ট্যাকটোনিক প্লেটের সংযোগ স্থলকে বলা হয় প্লেট বাউন্ডারি। একটি প্লেট যখন হঠাৎ করে অন্যটি থেকে স্লিপ করে তখন প্লেট বাউন্ডারি এলাকায় ভূমিকম্পের (earthquake) সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় বড় ভূমিকম্পের আগে বার বার মৃদু আকারে ভূমিকম্প দেখা দেয়। এবং বড় ভূমিকম্পের পর সপ্তাহ, মাস এমনকি বছরান্তে মৃদু ভূমিকম্প ঘটতে দেখা যায়।

********** বাংলাদেশে ভূমিকম্প **********
১৮৫৭ সালে ভয়াবহ ভূমিকম্পের কারণে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। ওই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ওই লাইনেই ছিল। বর্তমানেও সেটা পূর্ব দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। তবে গভীরতা কমবে কি-না সেটা নিশ্চিত নয়। ওই লাইনকে ভূমিকম্পের ভবিষ্যৎ উৎসস্থল ধরে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বগুড়া, রংপুর, সৈয়দপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ শহর সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে

আছে। কিন্তু ঢাকা শহরের মাটির মান খারাপ ও অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে ওই শহরগুলোর চেয়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে পড়তে পারে ঢাকা। যদিও ওই শহরগুলোর চেয়ে ঝুঁকির দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে ঢাকা।

সর্বশেষ ১৯১৮ সালে ১৮ জুলাই শ্রীমঙ্গলে ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল যা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। কিন্তু ঢাকায় এর প্রভাব সামান্যই পড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্পের পুনরাবৃত্তি ঘটে গড়ে প্রতি ১০০ থেকে ১৫০ বছরের মধ্যে। সেই হিসাবে ঢাকায় ১৩০ বছরে কোন বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়নি যা চট্টগ্রামে ২৫০ বছর এবং সিলেটে ১০০ বছর। এই সময় গ্যাপের কারণে খুব শীঘ্রই একটি ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে।

********** ভূমিকম্প জোনে বাংলাদেশের অবস্থান **********
বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান প্লেটেরই একটি অংশ। ইন্ডিয়ান প্লেট উত্তর পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর আগে বার্মিজ প্লেট এবং উত্তরে তিব্বতিয়ান প্লেট, যা ইউরেশিয়ান প্লেটের একটি অংশ। ইন্ডিয়ান প্লেট উত্তর পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ায় কৌনিকভাবে বার্মিজ এবং তিব্বতিয়ান প্লেটকে ধাক্কা দিচ্ছে। ফলে পূর্বদিকে ইন্ডিয়ান প্লেট দেবে যাচ্ছে বার্মিজ প্লেটের নীচে এবং বার্মিজ প্লেট ওপরে ওঠায় আরকান-ইয়োমা পর্ব শ্রেণীর সৃষ্টি। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম-সিলেট এলাকা পর্বতশ্রেণীর অংশ। পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমিকম্পের উৎপত্তি দুটি প্লেটের সংযোগস্থলে। গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে এ ধরনের আরো দুটি ফল্ট রয়েছে (মধুপুর ও দুখাই) যা থেকে বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে। কমপ্রিহেনসিভ ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রধান তিনটি শহর ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামে ৬-৭ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় ৫ লাখ ৫৮ হাজার স্থাপনা ধ্বসে পড়বে। যাতে ঢাকায় প্রায় ৭৮ হাজার ঝুকিপূর্ণ ভবন রয়েছে যাতে সরকারি ভবন প্রায় ৫ হাজার। দিনে ভূমিকম্প হলে মারা যাবে প্রায় ১.৫ লাখ মানুষ এবং আহত হবে আরও ১ লাখ মানুষ। রাতে ভূমিকম্প হলে আরও প্রায় ২ লাখ মানুষ আহত বা মারা যেতে পারে। সিলেট ও চট্টগ্রামে প্রায় ৯৫ ভাগ বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে।

***** বাংলাদেশের ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা সমূহ চিহ্নিতকরণ *****
দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের বাংলাদেশ ভারতীয়, ইউরেশিয় এবং মায়ানমার টেকটনিক প্লেটের মাঝে আবদ্ধ। ফলে এই প্লেটগুলোর নাড়াচাড়ার ফলে আমাদের দেশে মাঝেমাঝেই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তাছাড়া ভারতীয় এবং ইউরেশিয় প্লেট দুটো হিমালয়ের পাদদেশে আটকা পড়ে রয়েছে এবং ১৯৩৪ সনের পর গত ২৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে নেপালে যে ভূমিকম্প হল এটাই প্লেটগুলোর সবচেয়ে বড় ধরনের নাড়াচাড়া। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, এই প্লেট দুটো হয়তো নিকট ভবিষ্যতে আরো নড়ে উঠবে যা বড় ধরনের ভূমিকম্পের কারণ হবে।

টেকটনিক প্লেটের অবস্থান দেখলে বোঝা যায় যে, আমাদের উত্তর ও পূর্বে দুটো বর্ডার বা টেকনিকাল ভাষায় ''ভূ-চ্যুতি'' রয়েছে যা বাংলাদেশের ভূমিকম্পের কারণ। এজন্যে বাংলাদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চল তথা সিলেট এবং ততসংলগ্ন এলাকা প্রবল ভূমিকম্প প্রবণ। এর পরের অংশগুলোও যেমন ঢাকা ও রাজশাহী শহরও ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। নিচের ছবিতে বাংলাদেশের মানচিত্রে লাল অংশ বেশী, হলুদ মাঝারি এবং সবুজ অংশ কম ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৮৯৭ সনের ১২ জুন ৮.৭ মাত্রার ''দ্যা গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকোয়েক'' ভারতবর্ষকে আঘাত হানে যা আজও পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ভূমিকম্প হিসেবে পরিচিত। এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ভারতের শিলং শহর। তবে এর প্রভাব বর্তমান বাংলাদেশ সহ বহু দূর পর্যন্ত অনুভূতি হয়েছিল। সে সময়ের ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন মিশনারীদের বিল্ডিং ভেঙ্গে পড়েছিল এই ভূমিকম্পের কারণে। এছাড়াও ঢাকায় ৪৫০ জনের মত নিহত হবার খবর পাওয়া গিয়েছিল, যা সেই সময়ের তুলনায় রীতিমত অনেক বড় সংখ্যা।

এ ভূমিকম্পগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মোটামোটি প্রতি একশ বছর পরপর এই অঞ্চলে বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। ১৯১৮ সন ছিল সর্বশেষ বড় ভূমিকম্পের বছর। এরপর প্রায় একশ বছর কেটে গিয়েছে কিন্তু আর কোন বড় ভূমিকম্প আঘাত করে নি বাংলাদেশকে, যা বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে। অনেক আবহাওয়াবিদ এটাও মনে করেন যে, ছোটছোট ভূমিকম্প বড় ভূমিকম্পের বার্তা বহন করে। সে হিসেবে বাংলাদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প যে কোন সময় আঘাত হানতে পারে। আর যদি সেটা ঘটে, তাহলে সেটার ভয়াবহতা হবে মারাত্মক।

********** ভূমিকম্প ঝুঁকি **********
ভূমিকম্প ঝুঁকি অনুযায়ী ভূ-তাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। সিলেট বিভাগসহ নেত্রকোনা, শেরপুর,

কুড়িগ্রাম জেলা এবং ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, গাইবান্ধা, রংপুর ও লালমনিরহাট জেলার অংশবিশেষ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মধ্যে রয়েছে। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ইত্যাদি জেলা মাঝারি ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় পড়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহর ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত হলেও বিশেষ করে ঢাকায় অপরিকল্পিত নগরায়ন, নাজুক দালান-কোঠা এবং অত্যধিক জনসংখ্যা ভূমিকম্পে ক্ষয়-ক্ষতির সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে।

১৮৮৫ সালে ঢাকার কাছে মানিকগঞ্জে বিশাল এক ভূমিকম্প হয়েছিল (আনুমানিক ৭ থেকে ৮ মাত্রার) যা ইতিহাসে 'বেঙ্গল আর্থকোয়েক' নামে পরিচিত। এখন যদি ঢাকায় এ ধরনের কোনো ভূমিকম্প হয়, তবে অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ভূমিকম্পের ফলে ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতার যে মাত্রা রয়েছে সে সূচক অনুযায়ী ঢাকা পৃথিবীর শীর্ষ ২০ টি ঝুঁকিপূর্ণ শহরের অন্যতম। ভূমিকম্প ঝুঁকি অনুযায়ী ঢাকাকে চারটি এলাকায় ভাগ করা যায় । ম্যাপে দেখা যাচ্ছে উত্তরা এলাকা সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং খিলগাঁও, বাড্ডা, গুলশান, ক্যান্টনমেন্ট এবং পুরনো ঢাকার বুড়িগঙ্গা সংলগ্ন অঞ্চল বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় রয়েছে।

********** ভূমিকম্প প্রস্তুতি **********

আপনি যদি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় থাকেন তবে খোঁজ নিন আপনার ভবনটিতে ভূমিকম্পরোধক ব্যবস্থা আছে কিনা, থাকলে তা কী মাত্রার ভূমিকম্প সহ্য করতে পারবে। যদি না থাকে তবে রেট্রোফিটিং-এর ব্যবস্থা নিন। কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পুরনো ভবনেও রেট্রোফিটিং-এর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। জাপানে ভূমিকম্প একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু তাদের ভবনগুলিতে ভূমিকম্পরোধক ব্যবস্থা থাকায় তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয় অতি সামান্য।

• পরিবারের সবার সাথে বসে এ ধরনের জরুরী অবস্থায় কি করতে হবে, কোথায় আশ্রয় নিতে হবে- মোট কথা আপনার পরিবারের ইমার্জেন্সি প্ল্যান ঠিক করে সব সদস্যদের জানিয়ে রাখুন। ভূমিকম্পের সময় হাতে খুব সামান্যই সময় পাওয়া যাবে। এ সময় কী করবেন তা সবাইকে নিয়ে আগেই ঠিক করে রাখুন।

• বড় বড় এবং লম্বা ফার্নিচারগুলোকে যেমন- শেলফ ইত্যাদি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখুন যেন কম্পনের সময় গায়ের উপর পড়ে না যায়। আর টিভি, ক্যাসেট প্লেয়ার ইতাদি ভারী জিনিষগুলো মাটিতে নামিয়ে রাখুন।

• বিছানার পাশে সবসময় টর্চলাইট, ব্যাটারী এবং জুতো রাখুন।

• বছরে একবার করে হলেও ঘরের সবাই মিলে আসল ভূমিকম্পের সময় কী করবেন তার একটা ট্রায়াল দিন।

********** ভূমিকম্পের সময় করণীয় **********

নিচের পরামর্শগুলো বেশি কার্যকরী যদি ভবনে ভূমিকম্পরোধক ব্যবস্থা থাকেঃ

১। ভূমিকম্পের সময় বেশি নড়াচড়া, বাইরে বের হবার চেষ্টা করা, জানালা দিয়ে লাফ দেবার চেষ্টা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা উচিত। একটা সাধারণ নিয়ম হল- এ সময় যত বেশি মুভমেন্ট করবেন, তত বেশি আহত হবার সম্ভাবনা থাকবে। আপনার ভবনে যদি ভূমিকম্পরোধক ব্যবস্থা থাকে বা রেট্রোফিটিং করা থাকে তবে ভূমিকম্পের সময় বাসায় থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ।

২। আমেরিকান রেডক্রসের পরামর্শ অনুযায়ী- ভূমিকম্পের সময় সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল 'ড্রপ-কাভার-হোল্ড অন' বা 'ডাক-কাভার' পদ্ধতি। অর্থাৎ কম্পন শুরু হলে মেঝেতে বসে পড়ুন, তারপর কোন শক্ত টেবিল বা ডেস্কের নীচে ঢুকে কাভার নিন, এমন ডেস্ক বেছে নিন বা এমনভাবে কাভার নিন যেন প্রয়োজনে আপনি কাভারসহ মুভ করতে পারেন। কোনো ভবন ভূমিকম্পরোধক হলে তা খুব কমই ধসে পড়ে; যেটা হয় তা হল আশেপাশের বিভিন্ন জিনিস বা ফার্নিচার গায়ের উপর পড়ে আহত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই এগুলো থেকে বাঁচার জন্য এ সময় কোন শক্ত ডেস্ক বা টেবিলের নিচে ঢুকে আশ্রয় নেয়া জরুরী।

৩। ভূমিকম্পের সময় এলিভেটর/লিফট ব্যবহার পরিহার করুন।

৪। ভূমিকম্পের সময় যদি গাড়িতে থাকেন তবে গাড়ি বন্ধ করে ভেতরে বসে থাকুন। গাড়ির বাইরে থাকলে আহত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৫। 'মেইন শক' বা মূল ভূমিকম্পের আগে এবং পরে মৃদু থেকে মাঝারি আরো কিছু ভূমিকম্প হতে পারে যেগুলো 'ফোরশক' এবং 'আফটার শক' নামে পরিচিত। সতর্ক না থাকলে এগুলো থেকেও বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে। সাধারণত কোনো বড় ভূমিকম্পে 'আফটার শক' প্রথম ঘন্টার মধ্য থেকে শুরু করে কয়েক দিনের মধ্যে হতে পারে।

৬। প্রথম ভূমিকম্পের পর ইউটিলিটি লাইনগুলো (গ্যাস, বিদ্যুত ইত্যাদি) একনজর দেখে নিন। কোথাও কোন লিক বা ড্যামেজ দেখলে মেইন সুইচ বন্ধ করে দিন।

তানভীর ইসলাম: সহকারী অধ্যাপক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, জ্যাকসনভিল স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র। (Edited)

ভূমিকম্পের সময় কী করা উচিত--
১. বাড়ির ভেতরে থাকলে টেবিল বা খাটের তলায় আশ্রয় নিন
২. কোনও মজবুত আসবাব থাকলে শক্ত করে ধরে থাকুন
৩. বাড়ির কোনও কোণে আশ্রয় নিন
৪. হাত দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকুন
৫. ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়লে চোখ-মুখ ঢেকে রাখুন
৬. ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়লে মুখে আওয়াজ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন

ভূমিকম্পের সময় কী করা উচিত নয়--
১. বাড়ির বাইরে থাকলে গাছ বা কোনও বহুতলের নীচে দাঁড়াবেন না
২. বেশি নড়াচড়া করবেন না
৩. কোনও দেওয়ালের কাছে দাঁড়াবেন না
৪. গাড়িতে থাকলে ব্রিজে উঠবেন না

********** ভূমিকম্পের সময় আসলে কতটুকু সময় পাওয়া যায়? **********
ভূমিকম্পের সময় প্রথম যে কম্পন টের পাওয়া যায় তা হলো প্রাইমারি ওয়েভ বা P-wave. এর গতিবেগ ১-১৪ কিমি/সে পর্যন্ত হতে পারে। এরপর আসে সেকেন্ডারি ওয়েভ বা Shear wave যার গতিবেগ ১-৮ কিমি/সে। এ দু'টো বডি ওয়েভ। এছাড়া লাভ এবং রেলেই নামে আরো দু'টো ওয়েভ আছে যেগুলো সারফেস ওয়েভ এবং তুলনামূলকভাবে শ্লথগতিসম্পন্ন। আমরা ভূমিকম্পে যে ঘরবাড়ি, অবকাঠামো ধ্বংস হতে দেখি তার জন্য মূলত দায়ী সেকেন্ডারি ওয়েভ এবং সারফেস ওয়েভগুলো- কারণ, এগুলোই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। এখন প্রাথমিক ভূ-কম্পন বা P-wave টের পাবার কতো সময় পর বাকিগুলো টের পাবেন? উত্তর হচ্ছে ব্যবধান খুব সামান্য। ধরুন আপনার অবস্থান ভূমিকম্পের এপিসেন্টার বা উৎপত্তিস্থল থেকে ২০০ কিমি দূরে। সেকেন্ডে যদি ১৪ কিমি বেগে P-wave আসে তবে ২০০ কিমি অতিক্রম করতে সময় নেবে প্রায় ১৪ সেকেন্ড। আর এরপর ৮ কিমি/সে বেগে সেকেন্ডারি ওয়েভ আসতে সময় নেবে প্রায় ২৫ সেকেন্ড। অর্থাৎ আপনি ভূমিকম্প টের পাবার মোটামুটি ১১ সেকেন্ডের ব্যবধানে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে। এর মধ্যেই আপনাকে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

********** ধ্বংসস্তুপে আটকে পড়লে করণীয় **********
১। ধুলাবালি থেকে বাঁচার জন্য আগেই সাথে রুমাল বা তোয়ালে বা চাদরের ব্যবস্থা করে রাখুন।
২। ম্যাচ জ্বালাবেন না। দালান ধ্বসে পড়লে গ্যাস লিক হয়ে থাকতে পারে।
৩। চিৎকার করে ডাকাডাকি শেষ অপশন হিসেবে বিবেচনা করুন। কারণ, চিৎকারের সময় মুখে ক্ষতিকারক ধুলাবালি ঢুকে যেতে পারে। পাইপে বা ওয়ালে বাড়ি দিয়ে বা মুখে শিস বাজিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে পারেন। তবে ভাল হয় সাথে যদি একটা রেফারির বাঁশি বা হুইসেল থাকে, তার প্রিপারেশন নিয়ে রাখুন আগেই।

প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মানুষের নেই। কিন্তু মানুষ সতর্ক হতে পারে। গত ২৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে নেপালে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে আট হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে কুঁড়ি হাজারেরও বেশি মানুষ। তখন ভারত ও বাংলাদেশেও সেই ভূমিকম্পের তীব্র কম্পন টের পাওয়া গেছে। আজ ১২ মে ২০১৫ তারিখে আবার এভারেস্ট ও কাঠমান্ডুর মাঝখানে ৭.৪ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। এরপর আফটার শক যে ভূমিকম্প হয়েছে তার মাত্রা ৬.৩। তবে আজকের ভূমিকম্পে নেপালে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তেমন বেশি নয়। আজও বাংলাদেশে এই ভূমিকম্প টের পোয়া গেছে কিন্তু এটা ২৫ এপ্রিলের চেয়ে কম তীব্রতর ছিল।

********** আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন সচেতনতা ও প্রস্তুতি **********
২৫ ও ২৬ এপ্রিল, এরপর আবার ১২ মে,২০১৫ পরপর কয়েকটি ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে বাংলাদেশ। এর কেন্দ্র নেপালে, দুদিন ধরে সেখানে দফায় দফায় ভূমিকম্প ঘটেই চলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভারত ও ভুটানের মতো কাছের দেশগুলোও। উত্তর ভারতেও অর্ধশত প্রাণহানি ঘটেছে। বাংলাদেশেও তিনজন লোক মারা গেছে বলে গণমাধ্যমে এসেছে। রাজধানী ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে কিছু ভবন হেলে

পড়েছে বলে জানা গেছে। ভূমিকম্প যেহেতু বলে-কয়ে আসে না এবং পৃথিবী থেকে এর বিদায় নেওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই ভূমিকম্পে প্রস্তুতি ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।
একসময় ছিল যখন ঢাকার বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় দ্বিতল বাড়ির অধিক উচ্চতার বাড়ি ছিল না। ওই অবস্থায় ভূমিকম্প হলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাড়ির বাইরে খোলা জায়গায় বের হয়ে আসা সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন বহুতল বা সুউচ্চ আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনগুলো থেকে ৩০-৪০ সেকেন্ডের একটি কম্পনের মুহূর্তে গ্যাসলাইন, বিদ্যুৎ লাইন ইত্যাদি বন্ধ করে হাঁকডাক দিয়ে পরিবারের লোকজন সঙ্গে করে বের হয়ে আসা (তা–ও লিফট ব্যবহার করা যাবে না বলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে) অসাধ্য।
কম্পনের মুহূর্তে এসব সুউচ্চ ভবন থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা না করে নিজ নিজ ফ্ল্যাটের মধ্যে আশ্রয় খোঁজা ভালো, যে সম্পর্কে নির্দেশনামূলক লেখা গণমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। দেশে থাকা ভূমিকম্পের কোড মেনে তাঁরা ভবন ডিজাইন ও নির্মাণ করছেন কি না, সে বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি থাকা দরকার। জাপানের টোকিও শহরে শিনজুকু এলাকায় ৫০ তলা বা তদূর্ধ্ব ভবন কয়েক ডজন আছে। অফিসের সময় বড় তীব্রতার কম্পন হলেও এসব অফিসে কাজ করা লোকজন এক ইঞ্চিও নড়েন না। বরং তাঁরা আশপাশের ভবনগুলোর দোল খাওয়া নিজ ভবনের প্যানারোমিক উইন্ডো থেকে দেখে মজা পান। এর মূল কারণ স্টিলের ফ্রেমের ওপর তৈরি (কিছু কংক্রিটের তৈরি) এসব ভবন কতটা তীব্রতা সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে সে সম্পর্কে জনগণের আস্থা।
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাকিল আকতার বলেন, পরিকল্পিত নগরায়ন ছাড়া ভূমিকম্প সহনশীল নগর তৈরি করা সম্ভব না। তিনি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ উল্লেখ করে বলেন, এখানকার নগরায়ন যে দিকে হচ্ছে সেটা ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাতেই হচ্ছে। ভূমিকম্প থেকে বাঁচার জন্য একটি শহরের প্রস্তুতির মধ্যে শহরের ভবনগুলো বিশেষ করে জরুরি সাহায্য যেমন হাসপাতাল, দমকলবাহিনীর ভবনগুলো ভূমিকম্প নিরোধক করতে হবে। শহরের মাঝে মাঝে খোলা মাঠ এবং খোলামেলা জায়গার খুব প্রয়োজন রয়েছে শুধুমাত্র ভূমিকম্পের সময় আশ্রয়স্থল নয় পরবর্তী আফটার শকের সময়গুলোতে সেখানে আশ্রয় নেওয়ার জন্য কয়েকটি বাড়ি পরপর খোলা জায়গার বিকল্প নেই।

যদি রানা প্লাজার কলামে ফাটল দেখার পর ব্যবহার থেকে বিরত থেকে ভবনের কলামকে রেট্রোফিটিং করা হতো, তবে ওই বিপর্যয় খুব সহজে এড়ানো যেত। রেট্রোফিটিং বিষয়টি হলো একটি দুর্বল কাঠামোকে শক্তিশালীকরণ। কাঠামোটি যখন নির্মিত হয়েছিল তখন অজ্ঞতাবশত বা যে কারণেই হোক দুর্বলভাবে নির্মিত হয়েছিল, পরে তাকে প্রয়োজনীয় শক্তিশালীকরণই হচ্ছে রেট্রোফিটিং। কলামকে আরসি জ্যাকেটিং করে এবং দুই কলামের মাঝে ব্রেসিং, সিয়ার ওয়াল বা উইং ওয়াল নির্মাণ করে দুর্বল কার পার্কিং তলাটিকে রেট্রোফিটিং করা যায়। এ জন্য সচেতনতার বিষয়টি খুবই জরুরি। ২০ কোটি টাকার একটি ভবনের দুর্বল বা ত্রুটি ২০ লাখ টাকা খরচ করে শক্তিশালী করিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার মতো ইচ্ছা থাকতে হবে। জাইকার অর্থায়নে ঢাকার সেগুনবাগিচার গণপূর্ত ভবনের একটিতে কয়েকটি পদ্ধতিতে রেট্রোফিটিংয়ের কাজ করে রাখা হয়েছে, যা সহজেই সরেজমিনে দেখা যেতে পারে। এ ভবনের নকশা ও কাঠামোর ডিজাইন করার সময় এই ত্রুটির বিষয়টি স্থপতি ও কাঠামো প্রকৌশলীর মাথায় থাকা দরকার। দেশের পাঁচটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় ও সব কটি কারিগরি প্রতিষ্ঠানে রেট্রোফিটিং বিষয়টি পাঠদানের অন্তর্ভুক্ত করা খুবই প্রয়োজন। এর মধ্য দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনকে নিরাপদ ভবনে রূপান্তরিত করা দরকার। আর নতুন ভবনগুলো যেন এসব ত্রুটিমুক্ত থাকে, সেদিকে খেয়াল থাকা দরকার। তাহলে ভবনের ওপর বাসিন্দাদের আস্থা সুদৃঢ় হবে।
.....

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য
MyMahbub.Com

(তথ্যসূত্র: বিভিন্ন পত্রিকা, ব্লগ, টেলিভিশনের নিউজ এবং বই হতে সংগৃহীত ও সম্পাদি

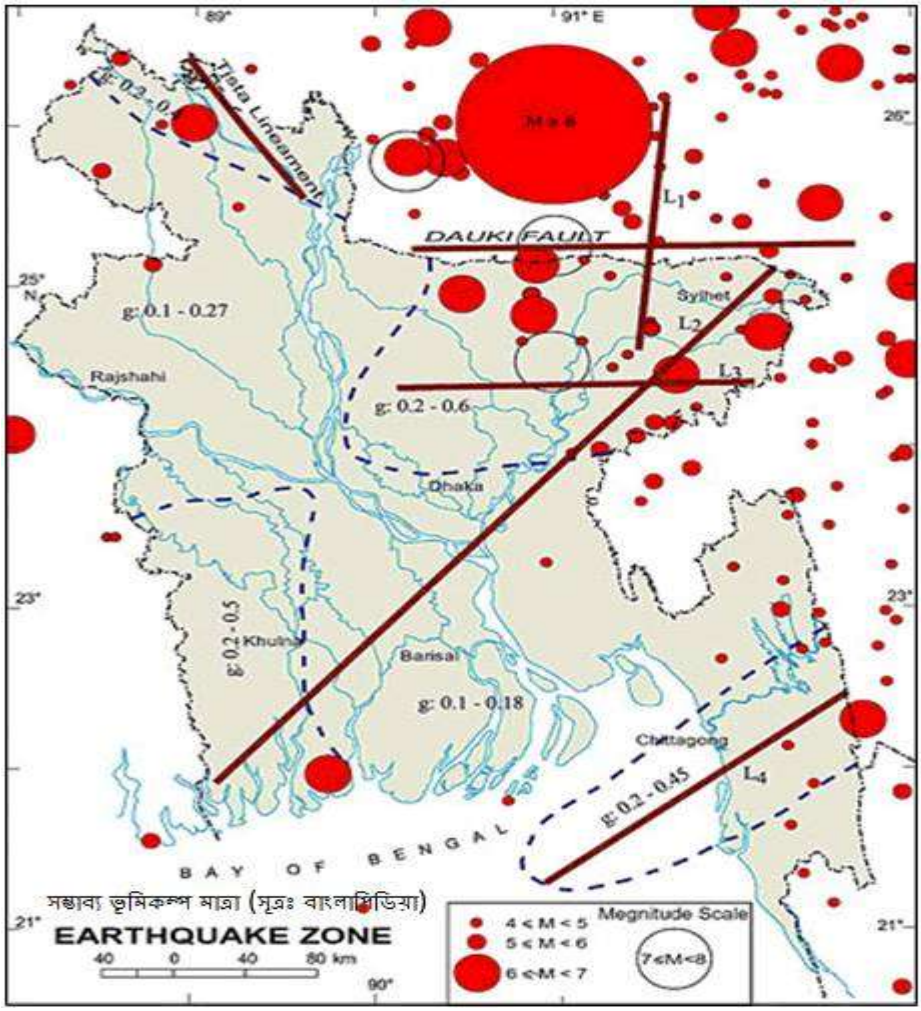

মানব পাচার ও বাংলাদেশ

.....

বাংলাদেশে প্রতি ২০ জনের একজন বিদেশে কর্মরত। বিদেশে ৮০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে এতে কোন সন্দেহ নাই। এ ব্যাপারে জনশক্তি রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান যেমন অনস্বীকার্য তেমনি আদম ব্যাবসায়ী নামের একশ্রেণীর প্রতারকের পরতারণাও অনেক বিয়োগান্তক ঘটনার জন্ম দিয়েছে। বিদেশে নিয়ে চাকরি না দিয়ে প্রতারণার ঘটনাই শুধু নয়, বিদেশে চাকরি দেয়ার নাম করে লাখ লাখটাকা নিয়ে উধাও এমনকিজীবন কেড়ে নেয়ার ঘটনাও ঘটছে অনেক। সাম্প্রতিক সময়ে জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে দুর্নীতি তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেলেও সাগরপথে মানব পাচারের ঘটনা বেড়েই চলেছে। বিশেষত মালয়েশিয়ায় চাকরির নামে প্রতিবছরই প্রতারণার শিকার হচ্ছে শত শত মানুষ। ২০১৫ সালেরপ্রথম তিন মাসেই সাগরপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়ারউদ্দেশে যাত্রা করেছে প্রায় ২৫ হাজার বাংলাদেশি এবং মিয়ানমারের নাগরিক। এদের অধিকাংশের ভাগ্যেই জুটেছে বন্দি ও ক্রীতদাসের জীবন। অতি সম্প্রতি থাইল্যান্ডের গহীন জঙ্গলে মানব পাচারকারী চক্রের গোপন আস্তানা আবিষ্কার এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় একের পর এক গণকবরের সন্ধান লাভ এ বিষয়ে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

.....

পরিনতিঃ

.....

ভাগ্য ফেরাতে এ দেশের সাধারণ গরিব দুঃখী মানুষেরা জীবনের ঝুঁকি নেয়। গবাদি পশুর মতো গাদাগাদি করে বসে থাকে নৌযানে, ভাসতে থাকে উত্তাল সাগরে। অবৈধ পথে রওনা দিয়ে মালয়েশিয়া পৌঁছানোয় তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের অধিকাংশেরই আর মালয়েশিয়ায় পৌঁছানো হয় না। হয় দালালদের নির্যাতনে মাঝ দরিয়াতেই মারা পড়ে, নয়তো ঠাঁয় হয় থাইল্যান্ডেরগহীন জঙ্গলে। পাচারকারীরা মালয়েশিয়ায় নিয়ে যাওয়ার বদলে তাদের সেখানে বন্দী করে। তাদের হত্যার হুমকি দিয়ে পরিবারের কাছ থেকে আদায় করে মোটা অঙ্কের টাকা। তবে টাকা দিলেও অনেক সময় মুক্তি মেলে না। তাদের হত্যা করে কবর দেয়া হয় গহীন বনেই। নিজের জীবনকে এক অনিশ্চয়তার হাতে তুলে দিয়ে অবৈধভাবে সাগর পাড়ি দিয়ে অজানায় হারিয়ে যাচ্ছে এদেশের হাজার হাজার মানুষ। দেশের সীমান্তবর্তী কয়েকটি এলাকা, কক্সবাজার এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে রওনা হওয়া এ মানুষগুলোর স্বপ্নের মৃত্যু ঘটে সেই উত্তাল সাগরের বুকে নয়তো প্রতারক দালালদের হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে। অনেকে বন্দী হয় বাংলাদেশি বা ভারতীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে। তারপর কারাবাস। মাসের পর মাস বিভিন্ন দেশের কারাগারে তাদের বন্দী থাকতে হয়। অনেকে সমুদ্র আর পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পৌঁছে যায় থাইল্যান্ড সীমান্তে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরই চোখ ফোটে তাদের। সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে দালালরা তাদের নিয়ে বন্দী রাখে গহীন অরণ্যে। জঙ্গলের ভেতরে তাঁবু গেড়ে শত শত মানুষের ওপর শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন। খেতে দেয়া হয় না। যে কাপড়ে এসেছে সে কাপড়েই থাকতে হয় মাসের পর মাস। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। কপাল পোড়া এই মানুষগুলোর ভাগ্যে এরপর নৃশংস মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই জোটে না। এই পরিচিত ঘটনাগুলো বারবার ঘটছে। তবু থেমে থাকে না সমুদ্রপথে অবৈধ বিদেশযাত্রা। সমুদ্রপথে তাদের একমাত্র বাহন সাধারণ ট্রলার কিংবা কার্গো বোট। এভাবে সমুদ্রে মালয়েশিয়ায় পৌঁছাতে সময় লাগে সাত দিন সাত রাত। স্বপ্ন বুকে অবৈধপথে যাত্রা করা মানুষগুলোকে বোঝানো হয় ওই সময়টা কোন রকম পার করতে পারলেই হলো, তারপর মালয়েশিয়া কিংবা থাইল্যান্ড। সেখানে গেলেই মিলবে অনেক বেতনের চাকরি। জীবন বদলে নেয়ার এই সুযোগ পেতে ট্রলারে চেপে বসে মানুষগুলো। একবার ঘুনাক্ষরেও টের পায় না যে তারা উত্তাল সমুদ্রের বুকে হারিয়ে যেতে বসেছে।

.....

সাম্প্রতিক পরিস্থিতিঃ

.....

সারা বিশ্বে যত মানুষ কাজের জন্য বিদেশে পাড়ি জমায় তার ৪০ শতাংশই যায় ইউরোপে। কিন্তু বাংলাদেশের অভিবাসীদের মধ্যে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ কয়েকটি দেশের প্রতি আগ্রহ থাকায় দালালচক্র থাইল্যান্ডের বনাঞ্চলগুলোকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। সম্প্রতি থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের অভিবাসীদের একাধিক গণকবরের খবরে পুরো দেশবাসী স্তম্ভিত। প্রতিনিয়ত পাওয়া যাচ্ছে নতুন নতুন গণকবরের সন্ধান। দেশটির উদ্ধারকর্মীরা মনে করছে সংখলা প্রদেশ ছাড়াও এ ধরনের গণকবর আরও থাকতে পারে। এদিকে রয়টার্স বলছে, অভিযানের পর সেখানে প্রাপ্ত প্রমাণাদি থেকে পরিষ্কার যে আটক ব্যক্তিদের সেখানে কঠিন নির্যাতন করা হতো। এবং নির্যাতন সইতে নাপেরেই এক পর্যায়ে ক্ষুধা ও রোগ ভোগে আটক ব্যক্তিরা মারা যেত। উদ্ধার করা লাশের একটি মহিলার বলেও

বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত হয়েছেন। রাজকীয় থাই পুলিশের ফরেনসিক উপদেষ্টা পল জেনারেল জারুমপর্ণ সুরামানি ধারণা করেন যে লাশগুলোর অধিকাংশই মাস খানেকের পুরনো। তবে একটি লাশ দিন কয়েক আগের হলেও তাকে দাফন করা হয়নি। এ সমস্ত ভয়াবহ নির্যাতন ও সমূহ বিপদের খবর জানা সত্ত্বেও নৌপথে স্বপ্নের মালয়েশিয়া যাত্রা থামছে না। এসব কারণে সাগরপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়াগামী যাত্রীদের নিখোঁজের তালিকা দিন দিন দীর্ঘ হচ্ছে। অবৈধভাবে প্রতিবছর বহুলোক থাইল্যান্ডে যাচ্ছে।প্রথমে তাদের সীমানার কাছাকাছি কোন জঙ্গলে রাখা হয়। দীর্ঘ কয়েকমাস অবস্থান করার পর সুযোগ বুঝে দুইতিনজন করে শহরে – পাঠাদালালরা। ক্যাম্পে অবস্থানরত শরণার্থীদের অসহায়ভাবে দিন কাটাতে হয়। তাদের পর্যাপ্ত খাবার, পানি ও ঘুমের সুযোগ দেয়া হয় না। আর অনাহারে কিংবা অসুস্থ হয়ে কেউ মারা গেলে তাদের একসঙ্গে জড়ো করে গণকবর দেয়া হয়। থায়ল্যান্ডের গণকবর থেকে পাওয়া লাশের মধ্যে অধিকাংশই বাংলাদেশিদের বলে শনাক্ত করেছে থাই ফরেনসিক বিভাগ। এদিকে উদ্ধারপ্রাপ্ত বাংলাদেশি যুবক আনুজার হাসপাতালে সাংবাদিকদের জানান, আদম পাচারকারীদের টাকা দিতে না পারায় তারা তাদের ওই ক্যাম্পে আটক করে রেখেছিল। ২৮ বছরের আনুজার জানান, তাদের সবসময় মারধর করা হতো। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অনেকে মারা যায়। ঠিকমত খাবার এমনকি পানি পর্যন্ত দেয়া হতো না। আনুজার আরও জানান, মারা গেছে এমন অন্তত ৩০ জন রোহিঙ্গা ও ১০ জন বাংলাদেশিকে তারা গণকবর দিয়েছে। এছাড়াও থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের গভীর জঙ্গলে নতুন আরও একটি শিবিরে পাঁচটি কবর আবিষ্কার করেছেন দেশটির তদন্ত কর্মকর্তারা। কবরগুলোয় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের অভিবাসীদের দেহাবশেষ থাকতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ। এছাড়া সেখানকার শংখলা প্রদেশের পেদাং বেসার শহরের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে আরেকটি বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে আসা এক রোহিঙ্গা নারী জানিয়েছেন, সেখানে একটি বন্দী শিবিরেই ৪০০ জন রয়েছেন। তাদের বেশিরভাগই রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি। ভয়ঙ্কর এই আদম পাচার কঙ্বাজার উপকূলীয় অঞ্চলের ৫০টি পয়েন্ট দিয়ে এখন অব্যাহত রয়েছে। এই পাচারচক্রে জড়িত রোহিঙ্গাসহ সাত শতাধিক স্থানীয় ও বহিরাগত দালাল। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দলের কতিপয় নেতাকর্মীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় প্রতিদিন সাগরপথে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রা করছে অসংখ্য মানুষ। সংগঠিত দালালচক্রের কারণেই বন্ধ হচ্ছে না মানব পাচার। ফলে স্বজনহারা পরিবারগুলোর আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠছে এলাকারপরিবেশ।

.....

আদম পাচারকারী সিন্ডিকেটের টার্গেট কর্মক্ষম যুবক, নারী ও শিশু। এই চক্রের সদস্যরা নামেমাত্র অগ্রিম টাকায় বাংলাদেশিদের পাচার করছে প্রতিনিয়ত। পাশাপাশি মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে রোহিঙ্গাদেরও বাংলাদেশি বানিয়ে পাচার করছে। দিনের পর দিন অনাহারে রেখে, নির্যাতন চালিয়ে, পায়ে শিকল বেঁধে মধ্য সমুদ্রে মাছ ধরতে পাঠানোর মতো নানা বর্বরতা চালানো হয় পাচারের শিকার মানুষদের ওপর। আরাকান প্রজেক্টের পরিচালক থ্রিস লেওয়ার অভিযোগ করেন, থাই ও মালয়েশিয়ার আদম পাচারকারীরা একজোট হয়ে কৌশলে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের নাগরিকদের বন্দি করে গত এক দশক ধরে আদম ব্যবসা করছে। থ্রিস লেওয়া আরও অভিযোগ করেন, অন্তত ৭ থেকে ৮ হাজার মানুষকে ট্রলার বা কার্গোতে এনেথাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার সীমান্ত সংলগ্ন উপকূলএলাকায় ছড়িয়ে দেয়াহয়েছে যাদের অধিকাংশই রয়েছে আদম পাচারকারীদের হাতে বন্দি। সাম্প্রতিক সময়ে যত অভিবাসন বিষয়ক দুর্যোগের খবর পাওয়া গেছে, সব জায়গাতেই ঘটনার শিকার হিসেবে বাংলাদেশিদের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে যা আমাদের জন্য উদ্বেগের বিষয়।

.....

এর কারণ হিসেবে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের অভিবাসনবিষয়ক কর্মসূচির প্রধান হাসান ইমাম বিবিসিকে বলেন,

বাংলাদেশের অভিবাসী শ রমিকদের মূল গন্তব্য যেসব দেশ, সেখানে নিয়মিত অভিবাসন প্রক্রিয়া যখনই ব্যাহত হয়, তখনই অবৈধপথে বিদেশ যাবার প্রবণতা বাড়ে।

এছাড়া দেশেকর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকাও অবৈধভাবে বিদেশে যাবার প্রবণতার একটি অন্যতম কারণ। তবে, ঠিক কি পরিমাণ লোক প্রতিবছর অবৈধভাবে বিদেশে যায়, সে বিষয়ে সঠিক কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না।

অবৈধভাবে বিদেশে যাবার ক্ষেত্রে প্রতারণার শিকার হওয়া এবং সেখানে গিয়ে অমানবিক জীবনযাপনে বাধ্য হবার কথা জেনেও, মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ পথে বিদেশে যায়, তার আরেকটি কারণ হিসেবে অজ্ঞতাকে দায়ী করেন হাসান ইমাম।

.....

মানব পাচার এখন এক বৈশ্বিক সমস্যার নাম। মানব পাচারকারীদের পাল্লায় পড়ে এ দেশের শত শত শিশু মধ্যপ্রাচ্যে উটের দৌড় প্রতিযোগিতায় জকি হতে বাধ্য হয়েছে। ইউরোপে কর্মসংস্থানের আশায় ঝুঁকিপূর্ণ পথে ভূমধ্যসাগর পাড়ি

দেয়ার সময় অনেকে প্রাণ হারিয়েছে জাহাজ বা নৌকাডুবিতে। সাহারা মরুভূমি পাড়ি দিতে গিয়ে বেঘরে প্রাণ হারিয়েছে অনেক যুবক। মালয়েশিয়ায়চাকরির আশায় অবৈধপথে সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে ট্রলারডুবিতে কত মানুষের প্রণহানি ঘটেছে তার হিসাব নাই। আর থাইল্যান্ডভিত্তিক মানব পাচার মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। কোন কোন পাচারকারী চক্র দাসপ্রথাও চালু করেছে। পাচারের শিকার হতভাগ্যদের
বেশিরভাগই বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা। কাজেই এটি আমাদের দেশের জন্য ভয়াবহ একটি সমস্যা এবং অচিরেই এর সমাধান করতে হবে।সমাধান.....:

মানবাধিকার কর্মীরা মনে করেন নিজের দেশে যখন নিরাপত্তাহীনতা, বেকারত্ব ও জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা মাথা চাড়া দেয় তখনই মানুষ পাড়ি জমায় অন্য দেশে। মানবাধিকারকর্মী এলিনা খান বলেন, জীবন জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ তার সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে দালালের হাতে তুলে দিচ্ছে। আর সেই অসহায় মানুষগুলোকে নিয়ে দিনের পর দিন নির্যাতন করা হচ্ছে। তারা মৃত্যুর কোলে ঢলেপড়ছে। এ ধরনের ঘটনার লাগাম টেনে ধরার প্রধান দায়িত্ব সরকারের।
সরকার তার প্রশাসনযন্ত্রকে আরও তৎপরতার সঙ্গে ব্যবহার করলে দালালের দৌরাত্ম্য কমে আসবে।
অবৈধভাবে বিদেশে পাড়ি জমানোর বিরুদ্ধে শক্ত জনসচেতনতা সৃষ্টি ছাড়া বিকল্প নেই।
এছাড়া এ বিষয়ে জাতিসংঘেরও ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।
তবে সরকার, মিডিয়া এবং এরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলো যদি দালালের তৎপরতার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কাজ করে তাহলে জনগণ বেশি উপকৃত হবে।
এছাড়াও মানব পাচার বন্ধে সরকারকে প্রথমে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এ দেশীয় দালালদের বিশেষ করে এদের গডফাদারদের গ্রেফতার করে কঠোর বিচার করা। এদেশীয় দালালচক্র দীর্ঘদিন যাবৎ সক্রিয় থাকলেও তাদের নির্মূল করা যায়নি। কখনো কখনো দু একজন দালালকে ধরাহলেও গডফাদাররা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। যদিও গত ৮ মে শুক্রবার কক্সবাজারের টেকনাফে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মানব পাচারকারী ধলু হোসেনসহ তিনজন নিহত হয়েছে, কিন্তু এতে মানব পাচার সমস্যার সমাধান হবে না। এজন্য এর পেছনের মূল পরিকল্পনাকারী এবং নিয়ন্ত্রণকারীগডফাদারদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে।
আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী চক্রের সঙ্গেএদেশীয় দালালদের নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে হবে।
সমুদ্র উপকূলে ও স্থল সীমান্তে বিশেষ করে রাতের বেলায় সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষের মধ্যে মানব পাচার বিরোধী প্রচারণা চালাতে হবে।
বিদেশ যাওয়ার মিথ্যা প্রলোভন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে।
আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে কর্মকৌশল ঠিক করতে হবে।
এজন্য পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।
এ ঘৃণ্য অপরাধে যারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির বিধান সংশ্লিষ্ট সবার কর্তব্য হয়ে উঠবে এমনটিই আমরা দেখতে চাই।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

লিখিত প্রস্তুতি আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি ::::
সম্ভাব্য প্রশ্ন:
১সমস্যা ও সম্ভাবনা মূ - ভারত সম্পর্ক-বাংলাদেশ .ল্যায়ন করুন।
২প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি সম্পর্কে আপনার মতামত উল্লেখ করুন। - ভারত সম্পর্ক-বাংলাদেশ .
সম্পর্কিত বিষয়) Related Topics):
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি =Politics in South Asia: Bangladesh-India relations, regional integration, water dispute, border problems and terrorism.
****

বাংলাদেশ ভারত মোট ছিটমহল- > ১৬২টি । বাংলাদেশ পেল> ১১১টি যা ভারতের ছিল আর ভারত পেলে ৫১টি যা বাংলাদেশের ছিল।
১১১টি ছিট মহলের আয়তন> ১৭, ১৫৮ একর । ৫১টি র আয়তন> ৭,১১০ একর। ৬ .কি ৫.মি অচিহ্নিত হবে।
১২পশ্চিম বঙ্গের কুচবিহারে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে ছিটমহল গুলো .> ৪৭টি । আর ভারতের ছিটমহলগুলো বাংলাদেশের লাল মনির হাটে সবচেয়ে বেশি> 59টি।

****

********** ভারতসমস্যা ও সম্ভাব - বাংলাদেশ সম্পর্ক-না ********

আধুনিক পররাষ্ট্র নীতি হল 'Win -Win situation'. এখন আর সেই দিন নেই যে আমরা কিছুনা পেয়েও ভারতকে সব দিয়ে দেওয়ার চুক্তি করলে সেটা গোপন থাকবে। সত্যি হল, দুটি দেশের মধ্যে কোন গোপন চুক্তি হয় না যে কোন - চুক্তিই উভয় দেশের সংসদে পাশ করাতে হয়।

ভারত বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রতিবেশী। বলতে গেলে ভারত প্রায় চারদিক দিয়েই বাংলাদেশকে ঘিরে রেখেছে।
স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশভারতের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রয়োজন। কিন্তু এই দু দেশের মধ্যে অনেক- সমস্যা রয়েছে। আর এসব সমস্যা সমাধান না হওয়ায় দু দেশের সম্পর্কটা কখনোই আন্তরিক হচ্ছে না। সমস্যাগুলো হচ্ছেÑ সীমান্ত সমস্যা, ছিটমহল সমস্যা, অভিন্ন নদীর পানিবন্টন সমস্যা, ট্রানজিট সমস্যা, বাণিজ্যিক ঘাটতি ইত্যাদি।

ভারতেরও বড় তিনটি বিষয় জড়িত । যেমন সন্ত্রাসবাদ, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং ট্রানজিট ও অবৈধ অভিবাসন।
বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, মিজোরাম আসাম এবং ত্রিপুরা প্রায় ৪০৯৫ কিলোমিটার সীমান্ত সম্পর্ক রয়েছে।
এখানে ২,৯৭৯ কি১স্থল ভূমি ও .মি .,১১৬ কিমি জলসীমা নদীর সীমান্তে রয়েছে। . উত্তরপূর্ব ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো ট্রানজিটের মাধ্যমে যুক্ত করা গেলে ভারতের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয় দ্রব্য ও মেশিনসমূহ আদানপ্রদানের -

ক্ষেত্রে। দু'দেশের জন্যই বাণিজ্য সম্পর্কটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের তৈরি পোষাকশিল্প ভারতের বাজারে তার শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের কাচামাল হিসেবে থান কাপড় এবং সুতা আসে ভারত থেকে । চীনের পর বাংলাদেশ ভারত থেকে আমদানি করে থাকে সবচাইতে বেশি । বেশির ভাগ গার্মেন্টস মালিক মনে করেন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে তাদের উৎপাদন খরচ বেশি । এ শিল্পকে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে বাইরের দেশের পন্যের সাথে । এদেশের বাণিজ্য ব্যবস্থা অনেকটাই ভারত নির্ভর । বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে কাচামালের ক্ষেত্রে ভারত নিজেদের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারছে |সেই কারণে, ভারতে এদেশের ৪৬ টি গার্মেন্টস পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশ অধিকার পাওয়ায় দুই দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হবে না বরং দুই দেশই লাভবান হবে| পোশাকশিল্প ভারতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পেলে সামনের বছরে ১ মিলিয়ন ডলারের উপর লাভ আশা করা যায় |এর মাধ্যমে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা সহজ হবে |যখন অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু হবে তখন দুই দেশের গার্মেন্টস শিল্প যেমন আরো প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যাবে তেমনি ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সুবিধা হতে পারে |

********** ছিটমহল বিনিময় **********

ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ দক্ষিণ বেরুবাড়ি ভারতের কাছে হস্তান্তর করে। বিনিময়ে দহগ্রামআঙ্গরপোতায় – বাংলাদেশের অবাধে যাতায়াতের জন্য তিনবিঘা করিডোর ২৪ ঘন্টা খোলা থাকার কথা ছিল। কিন্তু ভারত প্রথমে ৬ ঘন্টা এবং পরবর্তীতে ১২ ঘন্টা এই করিডোর বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে দেয়। অবশেষে মনমোহন সিংয়ের সফরে ভারত তিনবিঘা করিডোর ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার ঘোষণা দিয়েছিল। অথচ বাংলাদেশের এই সুযোগ আরো অনেক আগে থেকে পাওয়ার অধিকার ছিল।

ছিটমহল ইস্যুটি দীর্ঘদিন থেকেই দুই দেশের মাঝে অমীমাংসিত একটি বিষয়। বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও পঞ্চগড়ে ভারতের ১১১টি ছিটমহল রয়েছে। মোট ১৭ হাজার ১৫৮ একর জায়গা নিয়ে এসব ছিটমহলে বর্তমানে ৩৭ হাজারের বেশি মানুষের বসবাস রয়েছে। অন্যদিকে ভারতীয় ভূখণ্ডে বাংলাদেশি ছিটমহল রয়েছে ৫১টি, যার সবকটিই পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলায়। সাত হাজার ১১০ একর জায়গাজুড়ে ছিটমহলগুলোয় বাসিন্দা রয়েছেন ১৪ হাজার ২১৫ জন। এই ছিটমহলগুলোর অধিবাসীরা মূলত নিজ দেশে পরবাসীর মতোই জীবনযাপন করে। ছিটমহল সমস্যা নিরসনে এর আগেও দুই দেশের সরকার বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নিয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে ১৯৫৮ সালে সেময়) নূর-নেহেরু (বাংলাদেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান চুক্তি এবং ১৯৭৪ সালে ইন্দিরামুজিব চুক্তি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিভিন্ন- সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং পশ্চিমবঙ্গের বিরোধিতায় এর কোনোটাই আলোর মুখ দেখেনি। ছিটমহল বিনিময় হলে পশ্চিমবঙ্গ ১৭ হাজার একর ভূমি হারালেও পাবে সাত হাজার একরএমন যুক্তি তুলে ধরে এর বিরোধিতা করছিলেন – মমতার।

লোকসভা নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের সঙ্গে ছিটমহল বিনিময় নিয়ে অবস্থান বদলানোর যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তা বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। সম্প্রতি মমতা অবস্থান পরিবর্তনের ফলে ছিটমহল বিনিময় চুক্তি বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ৬৫ বছর ধরে ঝুলে থাকা সমস্যাটির সমাধানে সম্মতি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে রাজ্য সরকার। ছিটমহল বিনিময়ে সীমান্ত চুক্তি কার্যকরে ভারতের সংবিধান সংশোধন বিল রাজ্যসভায় ওঠার ঠিক আগে এর বিরেধিতাকারী মমতার অবস্থান বদলানোর খবর এল। সীমান্ত চুক্তি ও প্রটোকলের বাস্তবায়ন হলে উভয় দেশের মধ্যে ১৬২টি ছিটমহল বিনিময় হবে। নির্ধারিত হবে ছয় দশমিক এক কিলোমিটার অমীমাংসিত সীমানা। কিন্তু এর জন্য পার্লামেন্টে বিল পাস করতে হলে রাজ্যসভা ও লোকসভায় দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন।

********** অভিন্ন নদীর পানিবন্টন ইস্যু **********

অভিন্ন নদীর পানিবন্টন উভয় দেশের মাঝে বিরাট একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন

৫৪টি নদী রয়েছে যেগুলো ভারতশ উভয়বাংলাদে- দেশেই প্রবাহিত। কিন্তু ভারত এই নদীগুলোর পানিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার কারণে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় পানি পাচ্ছে না।

১৯৯৬ সালে গঙ্গার পানিবন্টন নিয়ে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার সঙ্গে বাংলাদেশের তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও ভারত কখনোই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশকে পানি দেয়নি। এদিকে ফারাক্কা বাঁধের পর ভারত এবার বরাক নদীর টিপাইমুখ নামক স্থানে বাঁধ নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই বাঁধটি কার্যকর হলে তার প্রভাবে বিস্তীর্ণ সিলেট অঞ্চল পানির অভাবে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। এদিকে তিস্তা নদীতেও একই অবস্থা চলছে। তিস্তা নদীর ভারতীয় অংশে ভারত একাধিক স্থানে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলে দীর্ঘদিন থেকেই বাংলাদেশ তিস্তার পানি পাচ্ছে না।

********** আমদানি********** রপ্তানি বাণিজ্য ইস্যু-

বাংলাদেশভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যতম একটা সমস্যা হলো ভারত বাংলাদেশকে- বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়ন করে না বললেই চলে। আবার বিভিন্ন সময়ে স্বাক্ষরিত চুক্তির সঠিক বাস্তবায়নেও ভারতের অনীহা লক্ষ্য করা যায়।

দক্ষিণ এশিয়ার ব্যাপক বাণিজ্য উদারীকরণ এবং একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের লক্ষ্যে সাফটা স্বাক্ষরিত হয়েছিল ২০০৪ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ১২তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে। ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সাফটা কার্যকর হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশগুলোর মাঝে অনীহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষত সাফটা বাস্তবায়নে ভারতের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ বলে অনেকেই দাবি করেছেন। সাফটা কার্যকর হলেও বাংলাদেশরপ্তানি বাণিজ্যে-ভারত আমদানি- প্রতি বছরই ঘাটতি বাড়ছে। প্রতি বছরই বাংলাদেশ থেকে ভারতে পণ্য রপ্তানির তালিকা এবং পরিমাণ বাড়ছে, কিন্তু ভারত থেকে আমদানি পণ্যের পরিমাণ বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত পণ্যের তুলনায় অনেক বেশি।

প্রত্যেকটা দেশের স্থানীয় শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য কিছু স্পর্শকাতর পণ্যের তালিকা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ৪৮০টি পণ্যকে 'স্পর্শকাতর' তালিকায় রেখেছে ভারত। ধীরে ধীরে স্পর্শকাতর পণ্যের তালিকা কমানোর কথা বলা হলেও তা কমানো হচ্ছে না।

বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশভারতের বাণিজ্যে কিছু অগ্রগতিও হয়েছে। সম্প্রতি ভারতের- ত্রিপুরা রাজ্যে ও বাংলাদেশের আখাউড়ার মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপনে সম্মত হয়েছে ঢাকা ও দিল্লি। নতুন এই সংযোগ আন্তঃসীমান্ত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোসহ উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার- বাড়াতে ভূমিকা রাখবে। ইতিমধ্যে গত দু বছরে উত্তরটি৭পূর্ব ভারতের - অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়েছে।

********** সীমান্ত হাট ইস্যু **********

২০১০ সালের ২৩ অক্টোবর ভারতে 'সীমান্ত হাট' স্থাপনে বাংলাদেশভারতের মধ্যে- একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারতে যে সব কারণে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি ব্যাহত হয় তা হলো প্রতিটি চালানের ল্যাবরেটরি পরীক্ষা, পরীক্ষার ফল পেতে বিলম্ব, বিভিন্ন রাজ্যের নিজস্ব শুল্ক, এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ডিউটি ইত্যাদি। এর বাইরে রয়েছে স্থলপথে পণ্য রপ্তানির বাধাসমূহ, যেমন গুদাম ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, রাস্তাঘাটের দুরবস্থা, ভারতীয় কাস্টমসের স্বেচ্ছাচারিতা, পণ্যবাহী যানবাহন পার্কিংয়ের অসুবিধা, ট্রানশিপমেন্ট ইয়ার্ডের অপ্রতুলতা ইত্যাদি।

********** মোদির ঢাকা সফর ও বাংলাদেশ********** ভারত সম্পর্ক-

প্রকাশফেব্রুয়ারি ১৫ :, ২০১৫
বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে- ক'টি বিষয় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে তিস্তার পানিবন্টনের বিষয়টি অন্যতম। বিগত মনমোহন সিং সরকার এ সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে চেষ্টা করছেন সমস্যাগুলো সমাধানের। এরই মধ্যে সীমান্ত চুক্তির ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধানে

সংশোধনী আনা হচ্ছে। হাসিনামোদি- সাক্ষাৎকারে মোদি সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার প্রধানকে আশ্বস্ত করেছেন। গেল বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে মোদির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ভারতে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণ করে এটা স্পষ্ট করেছেন, তিনি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়াকে গুরুত্ব দেন। দক্ষিণ এশিয়া তার অগ্রাধিকার তালিকায় প্রথমে। এ কারণেই দায়িত্ব নেয়ার পর প্রথম সরকারি সফরে তিনি ভুটান গিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি যান নেপালে। বাংলাদেশে তিনি আসেননি বটে। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে তিনি বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের মনোভাব এবং সেইসঙ্গে দেশের অপর একটি বৃহত্তম দল বিএনপির মনোভাব তার জানা প্রয়োজন ছিল। সেটা তিনি জেনেছেন। যতদূর জানা যায়, মার্চ মাসের দিকে তিনি সরকারি সফরে বাংলাদেশে আসতে পারেন। তখন দ্বিপাক্ষিক বিষয়াদি নিয়ে সরকারি পর্যায়ে আলোচনা হওয়ার কথা। এর আগে নভেম্বরে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানেও হাসিনামোদি বৈঠক হয়েছে। তবে সার্ক সম্মেলনে দ্বিপক্ষীয় বিষয়াদি নিয়ে- আলোচনার সুযোগ কম। সৌজন্য সাক্ষাৎকারে সাধারণ কথাবার্তাই বেশি হয়। অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা হয়। এর কোনো ভিত্তি থাকে না। সার্ক চার্টারে দ্বিপক্ষীয় সমস্যা উত্থাপনেরও কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং নিউইয়র্কে যে বৈঠকটি হয়েছে, সেখানে সিরিয়াস কোনো আলোচনা হয়নি। দুই নেতা পরস্পর পরস্পরকে চিনেছেন। জেনেছেন। একজন অন্যজনকে তার দেশ সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিঃসন্দেহে সুযোগটি গ্রহণ করেছেন। সীমিত সুযোগে তিনি বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশার কথা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাতে ভোলেননি। এক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় কোনো আলোচনার সুযোগ ছিল না।
ভারত বড় দেশ। বড় অর্থনীতি। আমাদের উন্নয়নে ভারতের ভূমিকাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ভারত সমমর্যাদার দৃষ্টিতে বাংলাদেশকে দেখছে না। বাংলাদেশসুবিধা দিয়েছে। সেই তুলনায় -ভারতকে যথেষ্ট সুযোগ- বাংলাদেশের যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা পূরণে ভারত এগিয়ে আসেনি। বরং ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের ভূমিকায় একটি বাংলাদেশবিরোধী মনোভাব আমরা লক্ষ্য করেছি।

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশপতিভারত সম্পর্ক যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। রাষ্ট্র- প্রণব মুখার্জি যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন তখনও বাংলাদেশ প্রত্যাশা করেছিল সমস্যাগুলোর সমাধানের ব্যাপারে তিনি একটি বড় উদ্যোগ নেবেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের তিনি বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ভারতীয় মন্ত্রিসভায় তিনি বাংলাদেশের বিষয়টি নিজেই দেখভাল করতেনএরকম একটি কথা - আমরা বরাবরই শুনতে পেয়েছি। একজন বাঙালি হয়ে বাংলাদেশের সমস্যাগুলোর ব্যাপারে তিনি পূর্ণ অবগত ছিলেন। তবে রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার ভূমিকা সীমিত থাকায় তিনি সমাধানের কোনো পথ বের করতে পারেননি। তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সমস্যাগুলোর জট খোলেনি। আসলে ভারতের আমলাতন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী। এ আমলারা নীতিনির্ধারণে প্রভাব খাটায়। এ আমলাতন্ত্রের কারণেই বাংলাদেশ- ভারত সম্পর্ক ধীরে ধীরে তিক্ততায় পরিণত হয়েছিল। তাই ব্যক্তিগতভাবে প্রণব বাবুর বাংলাদেশের সমস্যাগুলোর ব্যাপারে 'সিমপ্যাথি' থাকলেও তা সমাধানে কোনো অগ্রগতি হয়নি। এমনকি ড. মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১১ সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন। প্রণব বাবুর মতো তিনিও আমাদের আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছিলেন যে, সমস্যার সমাধান হবে। বিশেষ করে সীমান্ত হত্যা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি দিলি্ল ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তে হত্যা হয়েছিল। তার ঢাকা সফরের সময়ই আমরা শুনেছিলাম, মমতা ব্যানার্জির কারণে কোনো তিস্তা চুক্তি হচ্ছে না। কিন্তু এক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জিকে রাজি করানোর দায়িত্বটা কেন্দ্রীয় সরকারের, বাংলাদেশ সরকারের এখানে কোনো ভূমিকা নেই।
ভারতের একগুঁয়েমির কারণে যদি বাংলাদেশভারত সম্পর্কের অবনতি ঘটে-, তাহলে তা থেকে সুবিধা নেবে জঙ্গিরা, বিশেষ করে আল কায়দা। জাওয়াহিরি তার একটি ভিডিও বার্তায় দক্ষিণ এশিয়া ও মিয়ানমারে আল কায়দার শাখা খোলার কথা ঘোষণা করেছেন। এটা ভারত ও বাংলাদেশের জন্য চিন্তার অন্যতম কারণ। উভয় দেশেই জঙ্গিরা আছে। এখন দুই দেশ জঙ্গি দমনে একসঙ্গে কাজ করতে পারে। মোদির জন্য বাংলাদেশের জনগণের আস্থা অর্জন করাটা জরুরি। তিস্তার পানিবন্টন চুক্তি করে এ আস্থাটা নিঃসন্দেহে অর্জিত হতে পারে। আমরা চাই, ভারত বাংলাদেশের সমস্যাগুলোর ব্যাপারে উদার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসুক। 'বড় ভাই'সুলভ আচরণ বন্ধ করুক। অতীতে কংগ্রেস সরকার সমস্যাগুলো জিইয়ে রেখে বাংলাদেশ থেকে ফায়দা উঠিয়েছে মাত্র। এতে করে একটি শক্তিশালী ভারতবিরোধী মনোভাব বাংলাদেশে জন্ম হয়েছে। মোদি সরকার সীমান্ত সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের আস্থা অর্জনের উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। মমতা আসছেন। আমাদের প্রত্যাশা, বাকি সমস্যাগুলোর ব্যাপারেও ভারত উদ্যোগ নেবে।

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com

ব্লু ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতি

ব্লু ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতি, সমুদ্র বিজয়ে বাংলাদেশের প্রাপ্তি, কীরূপ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত, বিশ্ব অর্থনীতিতে সমুদ্রের অবদান, সরকারের গৃহীত কর্মসূচী এবং করণীয়

লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি + আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি + বাংলা ২য় পত্র
সম্ভাব্য প্রশ্ন : ব্লু ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতি কী ? সমুদ্র বিজয়ে বাংলাদেশের প্রাপ্তি কী ? এর ফলে দেশের কীরূপ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? বিশ্ব অর্থনীতিতে সমুদ্রের অবদান, সরকারের গৃহীত কর্মসূচী এবং করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

সিলেবাসে উল্লেখকৃত বিষয় : (Related Topics)
বাংলাদেশ বিষয়াবলি : Natural resources of Bangladesh.
আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি : Bangladesh in International Affairs: Major achievements.
বাংলা ২য় পত্র : রচনা (৪০ নম্বর)

********** ব্লু ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতি কী ? **********

বিংশ শতাব্দীজুড়ে পরিবেশগত নানা আন্দোলন ও সম্মেলন আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে একের পর এক পরিবেশবান্ধব মডেল। এসব মডেলের মধ্যে গ্রিন ইকোনমি মডেল বা সবুজ অর্থনীতি মডেল ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এই মডেলের অধিকতর সম্প্রসারণের। গ্রিন ইকোনমি মডেলের পরবর্তী ধাপ তথা সম্প্রসারণই ব্লু ইকোনমি নামে পরিচিত, যা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে ইতোমধ্যেই পৃথিবীজুড়ে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে।

১৯৯৪ সালে অধ্যাপক গুন্টার পাউলি ভবিষ্যতের অর্থনীতির রূপরেখা প্রণয়নের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। বিস্তারিত আলোচনা, গবেষণা আর নিজের অধীত জ্ঞানের মিশ্রণ ঘটিয়ে পাউলি একটি টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব মডেল হিসেবে ব্লু ইকোনমির ধারণা দেন। গত দুই দশকের নানা পরিমার্জন-পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে ব্লু ইকোনমি মডেল আজ একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা। নতুন এই মডেলের আদ্যোপান্ত তুলে ধরতে অধ্যাপক পাউলি ২০১০ সালে প্রকাশ করেন তার সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'The Blue Economy 10 Years-100 Innovations-100 Million Jobs' মোট ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বইটিতে ধাপে ধাপে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ব্লু ইকোনমির পেছনের তত্ত্ব, তথ্য ও তার প্রয়োগ। নতুন এই মডেল সাদরে বরণ করে নিচ্ছে পৃথিবীর নানা প্রান্তের উদ্যোক্তারা। স্থানীয় প্রযুক্তি, নিজস্ব অভিজ্ঞতা আর ব্লু ইকোনমি মডেলের তত্ত্বীয় জ্ঞানের মিশেল ঘটিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্ভাবন করা হচ্ছে অভিনব নানা ব্যবসা পদ্ধতির। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি এসব ব্যবসা আর্থিকভাবেও লাভজনক বিনিয়োগে পরিণত হয়েছে।

********** সমুদ্র বিজয়- বাংলাদেশের প্রাপ্তি কী ? **********
আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে ২০১২ তে মিয়ানমারের সাথে আর ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তি হওয়ায় মোট ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশী টেরিটোরিয়াল সমুদ্র এলাকা এখন বাংলাদেশের। সাথে আছে ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে সব ধরনের প্রাণীজ-অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার।

মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রে বিরোধপূর্ণ ১৭ টি ব্লকের ১২টি পেয়েছিল বাংলাদেশ। আর এবার ভারতের দাবিকৃত ১০টি ব্লকের সবগুলোই পেল বাংলাদেশ। সাথে বিরোধপূর্ণ ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের ১৯ হাজার পেয়েছে বাংলাদেশ আর বাকি ৬ হাজার দেওয়া হয়েছে ভারতের অধিকারে। দুই বছরের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত এ রায়দুটোকে প্রত্যেকেই বাংলাদেশের 'সমুদ্র বিজয়' বলে অভিহিত করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাহমুদ আলী অবশ্য এবছরের রায়কে ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় দেশের বিজয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। বাংলাদেশের বিজয় নাকি ভারত-বাংলাদেশ উভয়ের জয় সে বিতর্কে না জড়িয়েই বলা যায় হল্যান্ডের হ্যাগের এ রায়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যে প্রাপ্তি তা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন; নিঃসন্দেহে নবযুগের সূচনা।

এ রায়ে বাংলাদেশের স্থলভাগের বাইরে জলসীমায়ও আরেক বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। ১ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটারের বাংলাদেশের জন্য ১ লক্ষ ১৯ হাজার বর্গ কিলোমিটারের সমুদ্রসীমা আরেকটা গোটা বাংলাদেশই বটে। তাই এ রায়কে যুগান্তকারী এবং বিজয় বললে অত্যুক্তি হবার কথা নয়। তবে সমুদ্র বিজয়ই চূড়ান্ত বিষয় নয়; বরং বলা চলে সম্ভাবনার সূচনামাত্র। এখন এই বিজয়কে প্রকৃতার্থে অর্থবহ করে তুলতে চাই বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ।

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় কি পরিমাণ সম্পদ ছড়িয়ে আছে তা আজও বাংলাদেশের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তেল-গ্যাসের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান করার জন্য অতীতে বারবার আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করার পরও কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ধরনের সাড়া পাওয়া যায়নি। এ সাড়া না পাওয়ার একমাত্র কারণ সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ। এখন এ রায়ের ফলে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উত্সাহী হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রায়ে ভারতের দাবিকৃত সমুদ্ররেখা যদি প্রতিষ্ঠা পেত তবে বাংলাদেশ সমূহ বিপদের মুখে পরতে পারত। তখন গভীর সমুদ্র থেকে জলযান বাংলাদেশ সীমায় প্রবেশ করতে সমস্যা হতো। সম্ভাব্য সে আশঙ্কা থেকেও মুক্তি পাওয়া গেছে এ রায়ের কল্যাণে। এরায়কে মেনে নিয়ে সত্যিকার অর্থে ভারত এবং মিয়ানমার সরকার গণতান্ত্রিক এবং পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় বিরোধ নিরসন হচ্ছিল না বলে উদ্যোগী হয়ে এ বিরোধকে আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়ে যাওয়া এবং বিরোধ মিমাংসায় বাংলাদেশের প্রাপ্তি তুলানমূলক বিচারে বেশি হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সরকারের সকল সদস্যদের জানানই আন্তরিক অভিনন্দন।

******** ব্লু-ইকোনমি: সমুদ্র বিজয়- খুলে গেছে নীল বিপ্লবের অপার দুয়ার ********
প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমার বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে যে তেল-গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে ভূ-তাত্বিকরা বলছেন প্রবল সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশ অংশেও পাবার।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র সম্পদ বাংলাদেশকে যেমন দিতে পারে আগামী দিনের জ্বালানী নিরাপত্তা, তেমনি বদলে দিতে পারে অর্থনীতির সামগ্রিক চেহারা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাগরে প্রাণিজ-অপ্রাণিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, জিডিপিকে দুই অঙ্কের ঘরে নিতে পারে খুব সহজেই।
এমনকি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে সামুদ্রিক খাবার ও পুষ্টি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করাও সম্ভব।

অন্যদিকে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে সমুদ্র নির্ভর ব্লু ইকোনোমির বদৌলতে।
সোনার বাংলাদেশ গড়ার পথে ব্লু ইকোনোমির নীল বিপ্লব এখন তাই সময়ের দাবি।

********** বিশ্ব অর্থনীতিতে সমুদ্রের অবদান/গুরত্ব কী ? **********
পৃথিবীর তিন ভাগ জল। এই বাস্তবতায় পৃথিবীর দেশসমূহ তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা মেটাতে তাকিয়ে আছে সমুদ্রবক্ষে সঞ্চিত সম্পদের দিকে। ২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯০০ কোটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার যোগান দিতে তখন সমুদ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। সেই লক্ষে জাতিসংঘ ২০১৫ সাল পরবর্তী যে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নিতে যাচ্ছে তার মূলকথাই হচ্ছে ব্লু ইকোনোমি। আর ব্লু ইকোনোমির মূল ভিত্তি হচ্ছে টেকসই সমুদ্র নীতিমালা।

বিশ্ব অর্থনীতিতে সমুদ্র অর্থনীতি বহুবিধভাবে অবদান রেখে চলেছে। বছরব্যপী ৩ থেকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকান্ড সংঘটিত হচ্ছে সমুদ্রকে ঘিরে। বিশ্বের ৪ শ ৩০ কোটি মানুষের ১৫ ভাগ প্রোটিনের যোগান দিচ্ছে সামুদ্রকি মাছ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু। পৃথিবীর ৩০ ভাগ গ্যাস ও জ্বালানী তেল সরবরাহ হচ্ছে সমুদ্রতলের বিভিন্ন গ্যাস ও তেলক্ষেত্র থেকে।

সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে সমুদ্র নির্ভর ঔষুধশিল্পও গড়ে তোলা সম্ভব বলে মত দিয়েছেন জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) অন্যতম পরিচালক ইন্দ্রয়োনো সয়েসিলো। তিনি আরো বলেছেন, ব্লু ইকোনোমি একাধারে দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান করতে পারে এবং জিডিপি বৃদ্ধি করে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করতে পারে।

সমগ্র বিশ্বে ক্রমশঃ ব্লু ইকোনোমি জনপ্রিয় হচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে যতগুলো আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে তার সবগুলোতেই ব্লু ইকোনোমি ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। ২০১২ তে রিও+২০, সমুদ্র বিষয়ক এশীয় সম্মেলন, ২০১৩ সালে বালিতে অনুষ্ঠিত খাদ্য নিরাপত্তা এবং ব্লু গ্রোথ ইত্যাদি সম্মেলনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক সহায়তা এবং উন্নয়ন সংস্থা (OECD), জাতি সংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP), বিশ্ব ব্যঙ্ক, ফাউ (FAO), ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (EU) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উন্নয়ণ কৌশলের মূলেও থাকছে ব্লু ইকোনোমি।
আন্তর্জাতি সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট বড় দেশ ব্লু ইকোনোমি নির্ভর উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় অর্থনীতির সিংহভাগ সমুদ্র নির্ভর। সাম্প্রতিকসময়ে দেশটি এমনকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যে তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা গেলে সমুদ্র থেকে আহরিত সম্পদের মূল্যমান জাতীয় বাজেটের দশগুণ হবে। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া সমুদ্রসম্পদ থেকে বর্তমানে প্রায় ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে থাকে। আর ২০২৫ সাল নাগাদ এই আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ বিলিয়ন ডলারে। দ্যা জাকার্তা পোষ্ট এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে দ্যা লমবক ব্লু ইকোনোমি বাস্তবায়ন কর্মসূচী ৭৭ হাজার ৭০০ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করার পাশাপাশি প্রতিবছর ১১৪.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করবে।

********** সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কী ? **********

সমগ্র বিশ্ব যখন সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদ নির্ভর ব্লু ইকোনোমির দিকে ঝুঁকছে ঠিক সেসময়ে বাংলাদেশের সমুদ্র জয় অপার সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে, সুযোগ করে দিয়েছে ব্লু ইকোনোমীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হতে। দীর্ঘদিন উপেক্ষিত থাকার পর সরকার এখন আগ্রহী হয়ে উঠেছে এই সমুদ্র অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমিকে কাজে লাগানোতে। যদিও প্রতিবেশী ভারত, শ্রীলংকা মিয়ানমার ব্লু ইকোনমি নিয়ে কাজ করছে বহু আগে থেকেই।
আশার কথা, ইতিমধ্যেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেশকিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। এ বছরের সেপ্টেম্বরে ঢাকাতে ব্লু ইকোনোমি নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসংক্রান্ত গবেষণা ও নিয়মিত অনুষদ খোলা হয়েছে।
চট্টগ্রামে সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। এসবই ইতিবাচক ও বাস্তবসম্মত উদ্যোগ। সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও তার সুফল পেতে এসব উদ্যোগের সুদূরপ্রসারী প্রভাব থাকবে তা সহজেই অনুমেয়।

********** করণীয় কী ? **********

সমুদ্রের যতটা জানা তার চেয়ে বেশী অজানা বাংলাদেশের কাছে। হয়নি কোন জরিপ তাই নেই কোন তথ্য। এরপরও সমুদ্রবিজ্ঞানীরা আভাস দিলেন কি সম্পদ আছে এই ব্লু-ইকোনমির আওতায়। তবে সবার আগে প্রয়োজন জরিপ, যা দিবে তথ্য। এরপর নিজেদের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি।

১) ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোর গৃহিত পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করে একটি সমুদ্র নীতিমালা প্রণয়ণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একাজে বিদেশিদের সাহায্য ও পরামর্শ নেবার সাথে সাথে দেশের বাইরে যেসব বাংলাদেশী এইখাতে গবেষণায় ও কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিতে হবে।

২) সমুদ্র নির্ভর শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে কার্যকরী সকল ধরনের পদক্ষেপ ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

৩) মেরিন সায়েন্সের বিকাশে ও স্থানীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪) বিদেশি বিনিয়োগকারিদের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি দেশীয় শিল্পোদ্যগতাদের ব্লু ইকোনোমি ঘিরে শিল্প প্রতিষ্ঠায় আকৃষ্ট ও আগ্রহী করতে হবে।

৫) চীন ও জাপান এরইমধ্যে ব্লু ইকোনমিতে বাংলাদেশকে সহায়তার আগ্রহ দেখিয়েছে। এখন প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি তৈরী করে নিজেদের সক্ষমতা বাড়িয়ে এই সম্পদকে নিজেদের কাজে লাগানো।

সমুদ্র বিজয়ই এখন আর চূড়ান্ত বিষয় নয়; বরং বলা চলে সম্ভাবনার সূচনামাত্র। তাই এখন এই বিজয়কে প্রকৃতার্থে অর্থবহ করে তুলতে চাই বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ।

লিখিত প্রস্তুতি আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি + বাংলাদেশ বিষয়াবলি ::::
সম্ভাব্য প্রশ্ন:

১। জলবায়ু কনভেনশন কি?

২। জলবায়ু কূটনীতি?

৩। জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপী কিরূপ পরিবেশ বিপর্যয় হতে পারে?

৪। বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন – বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন হুমকীস্বরূপ/ ব্যাখা করুন।

৫। জলবায়ু পরিবর্তন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কীরূপ আন্তর্জার্তিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ?

৬। বাংলাদেশের জলবায়ু কূটনীতি কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

৭। জলবায়ু পরিবর্তন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের করণীয় কী?

৮। লিমা সম্মেলনে ২০১৪ আলোচনা করুন। –

********** জলবায়ু কনভেনশন **********

বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলাভূমি, বনভূমি, উপকূলীয় অঞ্চল ও সমুদ্রের পরিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে আজ। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ সমস্যাকে মোকাবেলার জন্য ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় একটি কনভেনশন স্বাক্ষর করে। পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রই এ কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। এই কনভেনশনে স্বীকার করে নেওয়া হয়, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলোই দায়ী। তাই, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় তাদের দায়িত্বটাই বেশি। কিন্তু পরে লন্ডন, মেক্সিকো সিটি, কানকুন, ডারবান ও দোহার সম্মেলনেও উন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর নীতিমালা প্রণয়নে ঐকমত্যে পৌঁছতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

********** জলবায়ু কূটনীতি **********

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর ক্ষতিকর প্রভাব রোধকল্পে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমন্বিত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে 'জলবায়ু কূটনীতি' নামে নতুন এক প্রপঞ্চের (phenomenon) আগমন ঘটেছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল প্রক্রিয়ায় যেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট, সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলো কীভাবে তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে, ধনী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আলোচনার কৌশল কী হবে, ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের ধরন, ব্যয়ের খাত কীভাবে নির্ধারিত হবে, সুশাসন, জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে কী কৌশল নেওয়া হবে, সে বিষয়ে কার্যকর অবস্থান এবং প্রতিনিধিত্বই হচ্ছে জলবায়ু কূটনীতি।

জলবায়ু কূটনীতির প্রকৃতি, কৌশল, উপাদানগুলো গতানুগতিক কূটনীতি থেকে ভিন্ন। রাইটস অ্যান্ড রেসপন্সসিবিলিটি ক্লাইমেট নেগোশিয়েশনে একটি স্বীকৃত বিষয়। কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয় অত্যধিক পরিমাণে কার্বন নিঃসরণ বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তাএ দুটি বিষয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সরল স্বীকারোক্তি ক্লাইমেট – নেগোশিয়েশনের বড় অর্জন।

******* বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন *******

নাসা আশঙ্কা করছে, গ্রিনল্যান্ডে যে বরফ জমা রয়েছে, তা যদি উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে গলে যায়, তাহলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৭ মিটার বৃদ্ধি পাবে। তাই কার্বন ডাইঅক্সাইড হ্রাসের কথা বলছে নাসা। –

টুভালু:
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিশ্লেষকদের কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, কোপেনহেগেনে জলবায়ু সম্মেলন চলাকালে টুভালু নামের দ্বীপরাষ্ট্রটি যেমাত্রায় মনোযোগ আকর্ষণ করতে- পেরেছে, তা ওই দেশটির আকারের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। এক রত্তি দেশ টুভালু, নয়টি ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে পুরো রাষ্ট্রটির মোট ভূখণ্ডের আয়তন মাত্র ২৬ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা হাতে গোনা যাবে—মাত্র ১১ হাজার ৯৯২ জন। পৃথিবীর চতুর্থ ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাষ্ট্র টুভালুর দ্বীপগুলো এত নিচু যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা আর মাত্র ছয় থেকে আট ইঞ্চি বাড়লেই প্রশান্ত মহাসাগরে তলিয়ে যাবে গোটা দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার গরিব দেশগুলোর জন্য ২০২০ সাল নাগাদ বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার দেওয়া হবে—যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ রকম এক প্রয়াসের কথা জানালে টুভালুর প্রধানমন্ত্রী আপিসাই ইয়েলেমিয়া বলেন, 'টাকার বিনিময়ে আমরা আমাদের অস্তিত্ব বিক্রি করতে আগ্রহী নই।'

মালদ্বীপ:
সহস্রাধিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গঠিত মালদ্বীপের ৮০ শতাংশ ভূখণ্ড সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র তিন ফুট উঁচু। যে হারে জলবায়ুর উষ্ণতা বাড়ছে, তা অব্যাহত থাকলে মালদ্বীপ নামের কোনো দেশ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যাবে। সেই দেশের রাষ্ট্রপতি কোপেনহেগেনে জলবায়ু সম্মেলনে বললেন, 'কার্বন নিঃসরণ কমানোর পথ দেখাবে মালদ্বীপ। আমরা আগামী ২০২০ সালের মধ্যে কার্বননিউট্রাল- দেশে পরিণত হব।' ওই সময়ের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করার ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহাম্মদ নাশিদ বলেন, 'শিল্পোন্নত দেশগুলোর আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া আমরা এটা করতে পারব না। আমি শিল্পোন্নত দেশগুলোকে বলি, আপনাদের টাকা আছে, প্রযুক্তির সিংহভাগও আপনাদের আছে। আমাদের সবুজ হতে সহযোগিতা করুন। কিন্তু একই সঙ্গে আমি এ কথাও বলতে চাই, দয়া করে মনে রাখবেন, জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আলোচনার সঙ্গে টাকাপয়সার কোনো-, আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

********** সাগরের নিচে মন্ত্রিসভার বৈঠক **********
জলবায়ু সম্মেলনের আরেক আলোচিত বক্তা ছিলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নাশিদ। সাগরের নিচে মন্ত্রিসভার বৈঠক করে ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে আলোচিত ৪২ বছর বয়সী যুবক এই রাষ্ট্রপতি জলবায়ু সম্মেলনে সর্বাধিক কার্বন নিঃসরণকারী শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান ২০২০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ ও ২০৫০ সালের মধ্যে ৯৫ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগ নিতে। চীন, ভারত, ব্রাজিল—এসব দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান ২০২০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ কমাতে। আর সবার প্রতি আহ্বান জানান এমন এক চুক্তিতে পৌঁছাতে, যেখানে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে 'পরিমাপযোগ্য ও আন্তর্জাতিকভাবে যাচাইযোগ্য' (কোয়ান্টিফাইয়েবল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনালি ভেরিফাইয়েবলপদক্ষেপ নেওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা থাকবে। (

******* বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন হুমকীস্বরূপ ********

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হবে, তা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জাতিসংঘের রিপোর্টেও এ ক্ষতির দিকটি উল্লেখ করা হয়েছে একাধিকবার। প্রতি বছরই জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা কপ বা 'কমিটি অব দ্য পার্টিস' নামে পরিচিত, সেখানেও বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যার কথা উঠে আসে।

দি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ডিজাস্টার রিডাকশনের এর সমীক্ষা:
দি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ডিজাস্টার রিডাকশনের এক সমীক্ষায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে:
১বন্যার ঝুঁকিতে বাংলাদেশ প্রথম .,
২সুনামির ঝুঁকিতে তৃতীয় .,
৩ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকিতে ষষ্ঠ অবস .্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য হুমকীস্বরূপ:
১বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে যে ক .'টি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।
২মিলিমিটার করে সমুদ্রের পানি বাড়ছে। ১৪বাংলাদেশের উপকূলে প্রতি বছর .
৩সেন্টিমিটার ২৮বছরে সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ .।
৪ভাগ এলাকা সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে। ১৭ .
৫তে পরিণতবাংলাদেশে প্রতি সাতজনে একজন মানুষ আগামীতে উদ্বাস্তু . হবে। সমুদ্রের পানি বেড়ে যাওয়ায় উপকূলের মানুষ অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

বাংলাদেশে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনবন্যা –, সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিধস, নদীভাঙন, উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত, ভূগর্ভস্হ পানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিকের প্রভাব, ভূগর্ভস্হ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া ও সর্বোপরি সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির মতো পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন ও এর ক্ষতিকর প্রভাব। নানা গবেষণায় উঠে এসেছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে।

আইপিসিসি'র (ইন্টারগর্ভমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে তলিয়ে যাওয়া অঞ্চল থেকে ২০৫০ সাল নাগাদ ৩ কোটি মানুষ গৃহহীন হতে যেতে পারেন।
ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির মতে, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বাংলাদেশে প্রতি বছর এক থেকে দেড় কোটি মানুষ বড় বড় শহরের দিকে জলবায়ু অভিবাসী হচ্ছেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'জার্মান ওয়াচ'-এর গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী (২০১০), জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে গড়ে বছরে ৮,২৪১ জন মানুষ মারা যাচ্ছেন এবং সার্বিকভাবে বাংলাদেশের বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ ২,১৮৯ মিলিয়ন ডলার, জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে যা শতকরা ১নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। কিন্তু ৮১., বাংলাদেশের মতো অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা দেশের পক্ষে সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এ সমস্যা মোকাবেলা করা সহজ নয়। কারণ, সমস্যাটি বহুজাতিক ট্রান্স) ন্যাশনালআর ।(তাই প্রয়োজন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা।

***** জলবায়ু পরিবর্তন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আন্তর্জার্তিক পদক্ষেপ ******
রিয়েলিজম ও লিবারেলিজম উভয় তত্ত্বের ঘোর সমালোচক প্রভাবশালী চিন্তাবিদ ই এইচ কার ১৯৩৯ সালে তার বইতে গ্লোবাল কমন চিন্তার ভিত্তিতে কমন গুড সাধারণ) কল্যাণখুঁজে বের করার ওপর জোর দিয়েছেন (; যেখানে পৃথিবীর সব রাষ্ট্র এই কমন 'গুডগুলোর' সাধনের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অভিভাবকহীন বিশ্বে প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার নিজের স্বার্থকে যে কোনো কিছুর ওপর প্রাধান্য দেবে এবং অন্যের ক্ষতি তার দেখার বিষয় নয়, এটাই বাস্তবতা। ফলে, কমন গুডের অনুসন্ধানই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর ঝুঁকি মোকাবেলা হচ্ছে, এ রকম একটি কমন গুড বা গ্লোবাল কমন। বিশ্ব সম্প্রদায় কমন গুড কনসেপ্টএর– ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক ঐক্য গঠনে সফল হয়েছে। জাতিসংঘের তত্বাবধানে Inter governmental Panel on Climate Change (IPCC), United Nations Environment Program (ENEP) এবং United Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCC) এর মত আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয়েছে। IPCC'র অধীনে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং UNFCC'র অধীনে বিশ্ব সম্প্রদায়ের ক্লাইমেট নেগোশিয়েশনে অনেক অগ্রগতি হয়েছে।

কিয়োটো প্রটোকল ও Bali Action Plan ক্লাইমেট নেগোশিয়েশনের ইতিহাসে দুটি বড় অর্জন। কিয়োটো প্রটোকলে ধনী রাষ্ট্রগুলো গ্রিন হাউস গাস নিঃসরণ কমিয়ে আনতে কাজ করছে।

Bali Action Plan ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থ ও প্রযুক্তি সহায়তা দানের কাজও এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশেও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট২০১০–' নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক রাজনীতিতে সবার দৃষ্টি এখন বাংলাদেশের দিকে। সবচাইতে বেশি কার্বন নিঃসরণকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র কিয়োটো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। অন্যদিকে, দরিদ্র, অনুন্নত ও ঝুঁকির

ভেতর থাকা দেশগুলি উন্নত দেশগুলির কার্বন নিঃসরণ কমাতে চাপ প্রয়োগে যতটা না আগ্রহী, তার চেয়ে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ে অনেক বেশি আগ্রহী।

******** কেমন হওয়া উচিত আমাদের জলবায়ু কূটনীতি ********

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হবে, এমন দেশগুলোর মধ্যে প্রথম সারির দেশ বাংলাদেশ। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের নির্দোষ শিকার বাংলাদেশকে সহায়তা করা তাদের ধনী দেশগুলোর নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের জলবায়ু কূটনীতি কেমন হওয়া উচিত, আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে আমরা কী ভাষায়, সুরে ও ভঙ্গিতে আমাদের বক্তব্য হাজির করব, এ নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যেসব কথাবার্তা বেশি উচ্চারিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ছিল:
১জলবায়ু উদ্বাস্তু .,
২অভিযোজন তহবিল .,
৩।দিক্ষতিপূরণমূলক তহবিল ইত্যা .

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্লাইমেট নেগোশিয়েশনে নিজেদের জলবায়ু পরিবর্তনগত ঝুঁকিগুলো কার্যকরভাবে উত্থাপন করে যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায়ের কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগে এখন পর্যন্ত দৃঢ়তার প্রমাণ দিতে পারেনি। ক্লাইমেট নেগোশিয়েশনের ক্ষতিপূরণের কৌশলগত এবং বাংলাদেশের 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ'-এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ ও Cost-Benefit বিশ্লেষণ করে লাভবান হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে কূটনৈতিক কৌশল ও দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। তাই এ মূহূর্তে বাংলাদেশের জলবায়ু কূটনীতিতে বাংলাদেশের লস ও ড্যামেজ এবং জলবায়ু অভিবাসনের মতো বিষয়গুলোকে ক্লাইমেট নেগোশিয়েশনে নিয়ে এসে কীভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়, তার কৌশল নির্ধারণ এখনই জরুরি।

********** বাংলাদেশের করণীয় কী **********

জাতীয়ভাবে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কমবেশি প্রতিটি রাষ্ট্রই এককভাবে ব্যর্থ। জলবায়ু পরিবর্তনকে কার্যকরভাবে রোধ করা একমাত্র আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমেই সম্ভব। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কূটচালে এ ধরনের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন, নিরাপত্তা, জনমত ইত্যাদির বেড়াজাল ডিঙিয়ে কীভাবে একটি কার্যকর আর্ন্তজাতিক উদ্যোগ ও মেকানিজম তৈরি করা যায়, এ নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির তাত্বিকরা নানা মতের অবতারণা করেছেন।

১কার্বন নিঃসরণ কমানোর ব্যাপারে . কার্যকর পদক্ষেপ ও সোচ্চার হতে হবে।
২ আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। ক্ষতিপূরণ ও অভিযোজনের পুরো অর্থ .
৩জলবায়ু উদ্বাস্তুদের বিশ্বজুড়ে অভিবাসনের সুযোগ করার দাবি জোরালো করাতে হবে। .
৪) সিজিএফ-সবুজ জলবায়ু তহবিলের .Green Climate Fund) এর অর্থ আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে।
৫যারা সত্যিকার অর্থেই জলবায়ু উদ্বাস্তু ., তারা সাহায্য পাচ্ছে এটা নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু তহবিলের অর্থ ঠিকমতো খরচ হচ্ছে কিনা তা মনিটরের ব্যবস্থা করা জরুরী।
৬জলবায়ু তহবিল ব্যবহারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত . করতে হবে। জলবায়ু তহবিল সংগ্রহের পর তা ব্যবহারে যদি স্বচ্ছতা না থাকে, তবে আন্তর্জাতিক মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং আমাদের ন্যায্য দাবিকে অগ্রাহ্য করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ সমস্যা মোকাবিলায় স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করতে হবে। ব্যস্তচ্যুতি ঠেকাতে এবং অগত্যা ব্যস্তচ্যুতদের সহযোগিতার লক্ষ্যে দেশীয় পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী তথা ধনী ও উন্নত দেশগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতিমালা তৈরি করা একান্ত জরুরি।

********* লিমা সম্মেলনে (২০১৪) **********

লিমা সম্মেলনে অর্থপ্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি। এমনকি প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়েও কোনো সমাধান হয়নি অথচ এ প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়টি উন্নয়নশীল বিশ্ব তথা সাগরপাড়ের দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিবেশের যথেষ্ট ক্ষতি করে। উন্নত দেশগুলো এ বিষয়টিকে এড়িয়ে চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, এমনকি ভারতে কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পাঠক), রামপালে প্রস্তাবিত কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা চিন্তা করতে পারেনবাংলাদেশ বা মালদ্বীপের মতো দেশে সোলার বিদ্যুৎ ও ।(বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও এ ক্ষেত্র দুইটি বারবার উপেক্ষিত থেকে গেছে। গরিব দেশগুলোর কাছে এ প্রযুক্তি সহজলভ্য নয়। প্রযুক্তি হস্তান্তরে উন্নত দেশগুলোর গড়িমসি চোখে লাগার মতো।

লিমা সম্মেলনে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে (২০১৪), প্রতিটি দেশ ছয় মাসের মধ্যে নিজের দেশে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনার ব্যাপারে নিজস্ব কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন ও উপস্থাপন করবে। বাংলাদেশের জন্য বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রামপালে ভারতীয় কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ প্লান্ট তৈরি করছে বাংলাদেশ। এতে পরিবেশ দূষণ তো হবেই। একইসঙ্গে কার্বন নিঃসরণের মাত্রাও বাড়বে। ইটের ভাটায় কয়লা ব্যবহৃত হয়, যা বায়ুমঅক্সাইড ছড়ায়। এখন -লে কার্বন ডাই- বাংলাদেশকে লিমা ঘোষণা বাস্তবায়ন করে একটি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। দেখার বিষয় বাংলাদেশ এখন কী করে।

নিঃসন্দেহে লিমা ঘোষণা একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। তবে প্রশ্ন থাকলই। উন্নত বিশ্ব শেষ পর্যন্ত প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করে কিনা, এর জন্য আমাদের আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে, কংগ্রেসের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের দ্বন্দ্বের আলোকে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত লিমা ঘোষণার ব্যাপারে কোনো আপত্তি তোলে কিনা, সেটাই দেখার বিষয় এখন। তবে আগামী বেশ কয়েক মাস এ নিয়ে বেশ দেনদরবার হবে। উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক আসরে দেনদরবার করবে। জাতিসংঘ উদ্যোগী হবে। তবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, এক্ষেত্রে জাতিসংঘের করার কিছুই নেই। কেননা উন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র যদি রাজি না হয়, তাহলে প্যারিস সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত কোনো চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না।

কটন রুট

লিখিত প্রস্তুতি :::: আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি
Topics :::: International Economic Relations: International trade, free trade, Major Ideas and Ideologies.
সম্ভাব্য প্রশ্ন: টীকা লিখুন:- "কটন রুট' (সাম্প্রতিক ইস্যু)

********** চীনা সিল্কের জবাবে ভারতের কটন রুট! **********

ভারত মহাসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে ভারত 'কটন রুট' কৌশলের আশ্রয় নিতে যাচ্ছে। চীনের 'সিল্ক রোড' অর্থনৈতিক কৌশলের বিপরীতেই এই নতুন কর্মপরিকল্পনা শুরু করেছে তার আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। গত শুক্রবার শেষ হওয়া 'ভারত ও ভারত মহাসাগর: সমুদ্রপথে বাণিজ্য এবং সভ্যতার পরম্পরার সম্পর্কের বিনির্মাণ' শীর্ষক এক সম্মেলনে 'কটন রুটের' নতুন ধারণাটি তুলে ধরা হয়।
ভারত ইতিমধ্যে কয়েকবারই বলেছে, ভারত মহাসাগরে চীনের উপস্থিতি তাদের কাছে মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। ভারত মহাসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহের বার্তা দিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিন কয়েক আগেই শ্রীলঙ্কা, মরিশাস এবং সেশেলস সফর সেরে এসেছেন। সিল্ক রুট কৌশলের মাধ্যমে চীন কেবল সড়কপথেই নয়, সমুদ্রপথেও এসব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে সচেষ্ট।

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিকর বলেন, 'এসব দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি অহিংসার প্রতি আমাদের সম্মিলিত বিশ্বাস। তবে শক্তির মাধ্যমেও সেই ঐক্যের জানান দিতে হবে।' পারিকর বলেন, সমুদ্রপথে নিরাপত্তার হুমকি সব

সময় একরকম থাকে না। সোমালী জলদস্যুরা এখন ভারতের দিকে এগোচ্ছে বলে সতর্ক করে দেন তিনি। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'আমাদের ৯০ শতাংশ বাণিজ্য এবং ৯০ শতাংশ তেল আমদানি সমুদ্রপথেই হয়।'

****** প্রাচীন কটন রুট : ভারত মহাসাগরে আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা ******

ভারত মহাসাগরে ভারত ও চীনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রদের কাছে এখন আলোচনার অন্যতম একটি বিষয়। বিশেষ করে গেল মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারত মহাসাগরভুক্ত তিনটি দেশ– মরিশাস, সিসিলি ও শ্রীলংকা সফর এবং এর ঠিক পরপরই ভারতের ভুবনেশ্বরে ভারত মহাসাগরভুক্ত দেশগুলোর সংস্থা ইন্ডিয়ান ওশেন রিমের শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন প্রমাণ করে দেশটি ভারত মহাসাগরে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইতিমধ্যে ভারত মহাসাগরভুক্ত অঞ্চলগুলোয় চীনের একরকম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চীন যে 'String of Pearls' বা 'মুক্তার মালা' নীতি গ্রহণ করেছে, তার মাধ্যমে এ অঞ্চলের সামুদ্রিক বন্দরগুলোকে একত্রিত করতে চায়। এতে করে আরব সাগর থেকে শুরু করে ভারত মহাসাগরে চীনা নৌবাহিনীর কর্তৃত্ব বেড়েছে। চীনের এ মুক্তার মালা নীতির কারণে দক্ষিণ চীন সাগর থেকে মালাক্কা প্রণালী, ইন্দোনেশিয়ার বালি হয়ে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে অ্যারাবিয়ান গালফ পর্যন্ত যে সমুদ্রপথ, তা থাকছে চীনের নিয়ন্ত্রণে। কারণ এটি তার জ্বালানি সরবরাহের পথ। গাওদারে (বেলুচিস্তান, পাকিস্তান) চীনা নৌবাহিনীর একটি ছোট্ট ইউনিটও রয়েছে, যেখান থেকে চীন ভারত মহাসাগরের সব ধরনের নৌ–মুভমেন্ট লক্ষ্য করবে।

গাওদারের ঠিক উল্টো দিকে ভারত মহাসাগরের এক পাশে রয়েছে শ্রীলংকার হামবানতোতা গভীর সামুদ্রিক বন্দর। এ সামুদ্রিক বন্দরটি চীন নির্মাণ করে দিয়েছে। এখানে চীনা নৌবাহিনীর সাবমেরিনের উপস্থিতি ভারতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দাদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। ভারতের স্ট্রাটেজিস্টরা এ ধরনের কর্মকাণ্ড তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে মনে করেছিল। এজন্য রাজাপাকসেকে ক্ষমতা পর্যন্ত হারাতে হয়েছে। রাজাপাকসে অতিমাত্রায় চীনানির্ভর ছিলেন। এ চীনা নির্ভরতা ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা খুব সহজভাবে নিতে পারেননি। শ্রীলংকায় সরকার পরিবর্তন হয়েছে। নয়া প্রেসিডেন্ট সিরিসেনা দায়িত্ব নিয়েছেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি শ্রীলংকা ঘুরে এসেছেন অতি সম্প্রতি। স্পষ্টতই মোদি সরকার ভারত মহাসাগরভুক্ত অঞ্চলগুলো নিয়ে যে নীতি প্রণয়ন করেছে, তা চীনা স্বার্থকে আঘাত করবে। ভারতের নীতিনির্ধারকরা এখন প্রকাশ্যেই বলছেন, তারা এ অঞ্চলে চীনের উপস্থিতি সহ্য করবেন না। ভুবনেশ্বর সম্মেলনে এ বার্তাটিই তারা দিয়েছেন। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির এটা একটা নতুন দিক। সিসিলি ও মরিশাসের সঙ্গে একাধিক প্রতিরক্ষা চুক্তি ও এ দুটি দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত, শ্রীলংকায় ভারতীয় প্রভাব বাড়ানো এবং ভবিষ্যতে 'জাফনা কার্ড' ব্যবহার প্রমাণ করে ভারতীয় মহাসাগরভুক্ত অঞ্চলে ভারত তার প্রভাব–প্রতিপত্তি বাড়াতে চায়।

ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন, ভারত প্রাচীনকালে তার 'কটন রুট' ব্যবহার করে এ অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করেছিল। দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে প্রাচীন যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার বিকাশে ভারতীয় পণ্ডিতরা একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। হাজার বছর আগে দক্ষিণের চোল বংশের রাজা রাজেন্দ্র চোলের আমলে নৌ–বাণিজ্যে ভারত শক্তিশালী ছিল। ওই সময় ভারত মহাসাগরকে চোল হ্রদ বলা হতো। ভারতীয় নৌ–বাণিজ্যের যে প্রাচীন রুট, তাতে দেখা যায় ভারত, পাকিস্তান, কুয়েত, মিসর, আফ্রিকার মাদাগাস্কার, অন্যদিকে শ্রীলংকা হয়ে সুমাত্রা, জাভা (মালাক্কা প্রণালী), হংকং, জাপান পর্যন্ত ভারতীয় বাণিজ্য রুট সম্প্রসারিত ছিল। মোদি সরকার এ কটন রুটকেই নতুন আঙ্গিকে সাজাতে চায়। প্রাচীনকালে ভারতীয় তুলা তথা সুতি এ সমুদ্রপথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেত। একদিকে চীনা নেতা শি জিন পিং তার 'সিল্ক রুটের' ধারণা নিয়ে ভারতীয় মহাসাগরভুক্ত অঞ্চলে চীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান, অন্যদিকে তার প্রতিপক্ষ হিসেবে ভারত তার পুরনো কটন রুটের ধারণা প্রমোট করছে। দ্বন্দ্বটা তৈরি হবে সেখানেই। বাণিজ্যনির্ভর এ দ্বন্দ্ব শেষ অবদি পরিণত হবে সামরিক দ্বন্দ্বে। চীন তার নৌবহরে বিমানবাহী জাহাজ আরও বাড়াচ্ছে। ভারতও ভারত মহাসাগরে তার নৌবাহিনী শক্তিশালী করছে। আন্দামানে নৌ–ঘাঁটি নির্মাণ করছে।

বলা হয়, একুশ শতক হবে এশিয়ার। তিনটি বৃহৎ শক্তি– চীন, জাপান ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক একুশ শতকের বিশ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এ ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রেরও বড় ভূমিকা রয়েছে। জাপানের নিরাপত্তার গ্যারান্টার যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে। জাপানেও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। একই কথা প্রযোজ্য ফিলিপাইনের ক্ষেত্রেও। ফলে এ অঞ্চলে চীনের সঙ্গে যে বিবাদ (জাপান ও ফিলিপাইনের সঙ্গে) তাতে যুক্তরাষ্ট্র একটি পক্ষ নিয়েছে। চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং যে নয়া সিল্ক রুটের কথা বলছেন, তা অন্য চোখে দেখছে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের ধারণা, এতে করে বিশাল এক এলাকাজুড়ে চীনা কর্তৃত্ব, প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ইতিহাসের ছাত্ররা অনেকেই জানেন, ২ হাজার ১০০ বছর আগে চীনের হ্যান রাজবংশ এ 'সিল্ক রোড'টি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ রুটের মাধ্যমে চীনের পণ্য (সিল্ক) সুদূর পারস্য অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যেত। এর মধ্য দিয়ে আজকের যে মধ্যপ্রাচ্য সেখানেও চীনের প্রভাব বেড়েছিল। চীনের নয়া প্রেসিডেন্ট এর নামকরণ করেছেন 'নিউ সিল্ক রোড ইকোনমিক বেল্ট'। এটা চীনের পশ্চিমাঞ্চল থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত। একইসঙ্গে একটি মেরিটাইম সিল্ক রুটের কথাও আমরা জানি, যা কিনা চীনের সঙ্গে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর একটা যোগসূত্র ঘটিয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, এ মেরিটাইম সিল্ক রুটের ধারণাও কয়েকশ' বছর আগের। এ মেরিটাইম সিল্ক রুট ধরে চীনা এডমিরাল ঝেং হে (মা হে) ১৪০৫ থেকে ১৪৩৩ সাল– এই ২৮ বছর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে চীনা পণ্য নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ১৪২১–১৪৩১ সালে তিনি দু'বার তৎকালীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন। চীন এ নৌরুটটি নতুন করে আবার ব্যবহার করতে চায়। তবে কয়েকশ' বছরের ব্যবধানে এ অঞ্চল অনেক বদলে গেছে। চীন আর একক শক্তি নয়। ভারত তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। আর যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সঙ্গে নিয়েই তার নিজের স্বার্থ আদায় করতে চায়। ফলে এটা স্পষ্ট নয় ভারত–চীন সম্পর্ক আগামীতে কোন পর্যায়ে উন্নীত হবে।

ভারত মহাসাগরে চীন ও ভারতের যথেষ্ট স্বার্থ রয়েছে। মৎস্য সম্পদ থেকে শুরু করে জ্বালানি সম্পদ ও জ্বালানি সম্পদ সরবরাহের অন্যতম রুট হচ্ছে এ ভারত মহাসাগর। পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনীতির কারণে এ সামুদ্রিক রুটের গুরুত্ব বাড়ছে। এ রুটের গুরুত্ব অনুধাবন করেই চীন এ অঞ্চলে তার নৌবাহিনীর উপস্থিতি বাড়িয়েছে। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতের স্বার্থও বিঘ্নিত হচ্ছে। ভারত তাই এ অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোতে তার নৌবাহিনীর উপস্থিতি ও কর্তৃত্ব বাড়াচ্ছে। ফলে এক ধরনের 'স্নায়ুবিক যুদ্ধ' শুরু হয়েছে এশিয়ার প্রভাবশালী এ দেশ দুটির মধ্যে। আগামী মে মাসে নরেন্দ্র মোদি বেইজিং যাবেন। ভারত মহাসাগরভুক্ত অঞ্চলে ভারতীয় তৎপরতা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় হয়তো স্থান পাবে না। কিন্তু চীনা নেতারা বিষয়টি জানেন ও বোঝেন। মোদি নিজে চীনের ব্যাপারে যতই আগ্রহী থাকুন না কেন, ভারতে একটি শক্তিশালী আমলাতন্ত্র আছে এবং ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা পৃথিবীর শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর একটি। তারা ভারতের স্বার্থকে সব সময় বড় করে দেখতে চায়। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় ইতিমধ্যে ভারতের এক ধরনের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের স্ট্রাটেজিস্টদের চোখ এখন ভারত মহাসাগরের দিকে। ভারত মহাসাগরে শুধু যে বিশাল সম্পদই রয়েছে, তা নয়। বরং বিশ্বের কার্গো শিপমেন্টের অর্ধেক পরিবাহিত হয় এ ভারত মহাসাগর দিয়েই। একইসঙ্গে ৩ ভাগের ১ ভাগ কার্গো, ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের ৩ ভাগের ২ ভাগ এবং ৪ ভাগের ৩ ভাগ ট্রাফিক পৃথিবীর অন্যত্র যেতে ব্যবহার করে ভারত মহাসাগরের সমুদ্রপথ। পৃথিবীর আমদানিকৃত পণ্যের (তেলসহ) শতকরা ৯০ ভাগ পরিচালিত হয় এ সামুদ্রিক রুট ব্যবহার করে। এ সমুদ্রপথের নিরাপত্তার প্রশ্নটি তাই গুরুত্ব পাচ্ছে বেশি করে।

ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য ভারত–চীন দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হবে এ অঞ্চলের দেশগুলো। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য এই চীন–ভারত দ্বন্দ্ব নতুন একটি 'জটিলতার' জন্ম দিয়েছে। কেননা বাংলাদেশের বর্তমান সরকার চীন ও ভারতের সঙ্গে 'ভারসাম্যমূলক' কূটনীতি অবলম্বন করেছে। যদিও অনেকেই বিশ্বাস করেন, বাংলাদেশের কূটনীতি বেশিমাত্রায় ভারতনির্ভর, তবে প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালের মার্চে চীন সফরে গিয়েছিলেন। ওই সফরে তিনি কুনমিংও গিয়েছিলেন এবং কুনমিং–কক্সবাজার সড়ক নির্মাণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এখন এ সড়ক নির্মাণের প্রশ্নটি এবং বিসিআইএম (বাংলাদেশ, চীন, ভারত, মিয়ানমার) জোটের জন্ম ও বিকাশ প্রশ্নের মুখে থাকল। কারণ চীন–ভারত দ্বন্দ্বে এই আঞ্চলিক জোটের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চীনের কুনমিং উদ্যোগের পরিবর্তিত নাম বিসিআইএম জোট। এখানে চীনের স্বার্থ বেশি। এ জোট গঠিত হলে চীনা পণ্য সড়কপথে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে বিদেশে রফতানি সম্ভব হবে। অনেকের স্মরণে থাকতে পারে, সোনাদিয়ার অদূরে যে গভীর সমুদ্রবন্দরটি নির্মাণ করার কথা ছিল, তাতে চীন যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিল। ৬০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে চীনের এটি নির্মাণ করে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু এ পরিকল্পনা এখন পরিত্যক্ত। গভীর সমুদ্রবন্দরটি এখন নির্মিত হবে পায়রাবন্দরে। একনেকে এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মূল কারণ ভারতের আপত্তি। এর সঙ্গে ভারত তার নিরাপত্তার প্রশ্নটি তুলেছে। এমনকি ভারতের নীতিনির্ধারকরা এটাও মনে করেন, এ গভীর

সমুদ্রবন্দরটি নির্মিত হলে চীনা পণ্যে এ অঞ্চল ছেয়ে যাবে। এতে ভারতীয় পণ্য মার খাবে। ফলে বিসিআইএম আঞ্চলিক জোট নিয়ে প্রশ্ন থাকলই। উল্লেখ্য, ভুটানে চীনা দূতাবাস খোলার ব্যাপারেও ভারতের আপত্তি রয়েছে। ফলে এ অঞ্চলের নিরাপত্তা, পণ্যের অবাধ চলাচল, সম্পদের আহরণ ইত্যাদির ব্যাপারে আগামী দিনগুলোতে চীন ও ভারতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট হবে। এ অঞ্চলের দেশগুলো এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যেতে পারে।

আঞ্চলিক সহযোগিতাকে কেন্দ্র করেই বর্তমান বিশ্ব বিকশিত হচ্ছে। এখানে সামরিক দ্বন্দ্বের চেয়ে বাণিজ্যিক নির্ভরতার বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চীন ও ভারত বড় অর্থনীতির দেশ। ভারতে দারিদ্র্য থাকলেও দেশটি আঞ্চলিক শক্তি তো বটেই, বড় অর্থনৈতিক শক্তিতেও পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারত। আর চীন দূর প্রতিবেশী। চীনের সঙ্গে আমাদের সীমান্তের দূরত্ব খুব বেশি নয়। দুটি দেশের উন্নয়ন থেকেই আমরা উপকৃত হতে পারি। অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য কাটিয়ে উঠে চীন ও ভারত যদি নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাহলে এ অঞ্চলের দেশগুলো উপকৃত হবে। সেই পঞ্চাশের দশকে হিন্দি-চীন ভাই ভাই সম্পর্ক, পঞ্চশীলার ধারণা (যা ন্যামের জন্ম দিয়েছিল) এ দুটি দেশের মাঝে একটা আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। একুশ শতকে এসে বৈরিতা নয়, বরং আস্থার সম্পর্ক এ অঞ্চলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। এখন দেখার পালা আগামী দিনগুলোতে এ দেশ দুটি বৈরিতা কতটুকু কমিয়ে আনতে পারে।
By ড. তারেক শামসুর রেহমান : অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

.....

BCIM-সিল্ক রুট

বিসিআইএম অর্থনৈতিক করিডর-সিল্ক রুট , বিসিআইএম সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক জোনের একটি , কৌশলগত গুরুত্ব, বাংলাদেশ কীভাবে এর ফলে লাভবান হবে?

লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি + আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি
সম্ভাব্য প্রশ্ন:
১। বিসিআইএম অর্থনৈতিক করিডর কী? সিল্ক রুট কী? বিসিআইএম এর রুটটি কেমন হবে?
২। বিসিআইএম গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? এটি গঠনের উদ্যোগ ও প্রেক্ষাপট আলোকপাত করুন।
৩। আপনি কী মনে করেন বিশ্বের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক জোনের একটি হতে যাচ্ছে বিসিআইএম? কীভাবে?
৪। বিসিআইএম বা নয়া সিল্ক রুট এর কৌশলগত গুরুত্ব কী? কেন বাংলাদেশের জন্য বিসিআইএম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশ কীভাবে এর ফলে লাভবান হবে?
৫। বিসিআইএম গঠনে আশঙ্কা, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত এবং করণীয় সম্পর্কে লিখুন।
****
সম্পর্কিত বিষয় (Related Topics): সিলেবাসে একাধিকবার উল্লেখকৃত।
বাংলাদেশ বিষয়াবলি = Economy, Foreign Policy and External Relations (Economic Diplomacy, International Trade).
আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি = International Economic Relations (International trade, Free trade).

আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি = Section C: Problem-solving (Trade)

********** বিসিআইএম অর্থনৈতিক করিডর কী? **********

বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মিয়ানমারকে নিয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক জোট হলো বিসিআইএম। নতুন এ উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণাটি বাংলাদেশ-চায়না-ইন্ডিয়া-মিয়ানমার' (বিসিআইএম) নামেই অধিক পরিচিত।

বিসিআইএম করিডর একটি মাল্টি মডেল কানেকটিভিটি। বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও মিয়ানমারের সঙ্গে কানেকটিভিটি। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এ করিডর অর্থনীতি ও বাণিজ্য ছাড়াও চার দেশের মানুষের মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করবে।

গত বছরের ডিসেম্বরে চারটি দেশের প্রতিনিধিরা চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিংয়ে মিলিত হয়ে এ ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত রূপরেখা প্রণয়ন করে। প্রস্তাবিত বিসিআইএম করিডরটির আওতায় চীনের ইউনান প্রদেশ, বাংলাদেশ, মায়ানমার ও ভারতের সাড়ে ১৬ লাখ বর্গকিলোমিটারের বিশাল এই অঞ্চলের ৪৪ কোটি মানুষের পাশাপাশি থাকবে সড়ক, জল এবং আকাশ পথের যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক করিডর বিসিআইএম-এর বিষয়ে একমত হয়ে এ সংক্রান্ত এক চুক্তিপত্রে সই করেছে ওই চারটি দেশের পররাষ্ট্র সচিবরা। ২০১৫ সালের জুনে ভারতে পরবর্তী বৈঠকে বিসিআইএম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে এবং এবারের আলোচনা সিদ্ধান্ত আকারে রূপ নেবে।

********** সিল্ক রুট কী? **********
কানেকটিভিটির মাধ্যমে এশিয়ার এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। আফগানিস্তান থেকে সওদাগররা উপমহাদেশে এক সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। মধ্য এশিয়া থেকে উপমহাদেশ হয়ে চীন পর্যন্ত বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। তখন এ রুটে পণ্য বলতে সিল্কের আনাগোনা ছিল। সে কারণে মধ্য এশিয়া থেকে উপমহাদেশ হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ রুট ইতিহাসে সিল্ক রুট' নামে পরিচিত।

********** গঠনের উদ্যোগ ও প্রেক্ষাপট? **********

১৯৩০ সালে ব্রিটিশ সরকার দুই হাজার বছরের পুরনো সিল্ক রুট চালুর উদ্যোগ নিয়েছিল। চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে মিয়ানমার ও চীনের রেল যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়াতেই তখন এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। পরে নানা কারণে সে উদ্যোগ থেমে গেলেও ১৯৯৯ সালে চীনের নেতৃত্বে আবারো সিল্ক রুট চালুর উদ্যোগ নেয় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। আর এটি বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করছে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েতনাম। চট্টগ্রাম বন্দরের পণ্য কক্সবাজার, টেকনাফ হয়ে মিয়ানমারের আকিয়াব, মান্ডালায়ে হয়ে তা কুনমিং পর্যন্ত পৌঁছানোই হল এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। এর জের ধরেই বিসিআইএম অর্থনৈতিক করিডোরের জয়েন্ট স্টাডি গ্রুপ গঠন করে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার ও চীন। ২০১৩ সালের মে মাসে বিসিআইএমের আওতায় ইকোনমিক করিডোর গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

********** এটি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? **********

১। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সম্মেলনে চার অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে যুক্ত করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে 'প্রধান টার্গেট' ধরে আলোচনা হয়েছে।

২। চার দেশের মানুষের মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করবে।

৩। ছাড়াও গঠনের উদ্দেশের মধ্যে রয়েছে - জ্বালানি সহযোগিতা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, বাণিজ্য সহজীকরণ, শুল্ক কমানো, নন-ট্যারিফ বাধা দূর, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়, দারিদ্র্য বিমোচন, তথ্যপ্রযুক্তি খাত।

********** এর রুটটি কেমন হবে? **********

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিংয়ে আলোচনার সময়ই মূলত রুটটি ঠিক করা হয়। চারটি দেশই রুটটির ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। রুটটি হল- চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশের রাজধানী কুনমিং থেকে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম হয়ে ভারতের কলকাতা। রুট হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে কলকাতা থেকে যশোরের বেনাপোল হয়ে ঢাকা। এরপর সিলেট হয়ে শিলচর, ইমপাল-কা-লে-মান্দালাই-রুইলি, তেংচং-ইরাই লেক, ডালি হয়ে কুনমিং গিয়ে শেষ হবে।

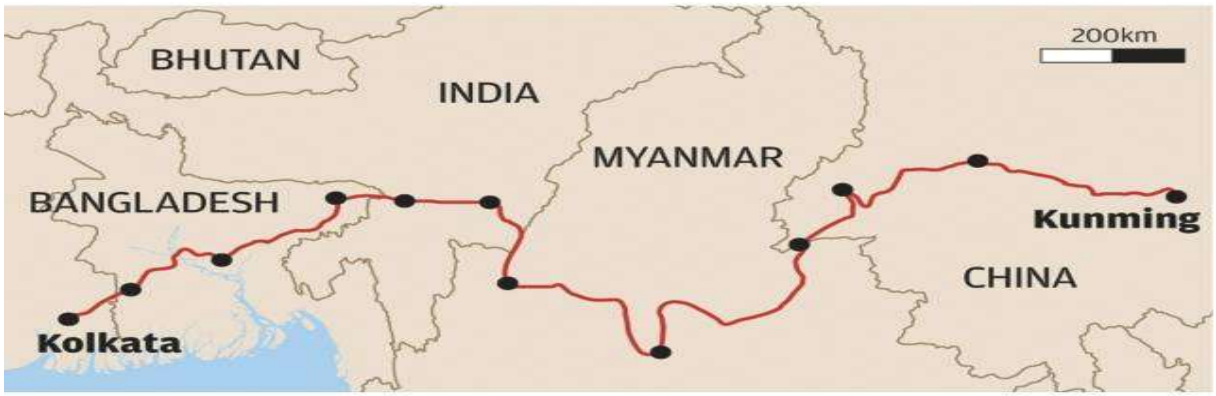

BCIM Economic Corridor : Be a Driving Force

********** বিসিআইএমে রফতানির জন্য ১৫টি পণ্য শনাক্ত: **********

বিসিআইএম অঞ্চলে রফতানির জন্য ১৫টি পণ্যকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রয়েছে শস্যকণা, চামড়া, শুকনা খাবার, ছাগলের মাংস, হস্তশিল্প, সিনথেটিক ফেব্রিক্স। এটি মূলত চীনের বাজারে রফতানির জন্য শনাক্ত করা হয়। পাশাপাশি ভারতের বাজারের জন্য শনাক্ত করা হয়, এন হাইড্রোঅক্সাইড অ্যামোনিয়া, লিড এসিড, সবজি, পাট, টেক্সটাইল পণ্য।

******** বিসিআইএম বা নয়া সিল্ক রুট এর কৌশলগত গুরুত্ব কী? ********

কালের পরিক্রমায় রাজনৈতিক বিবর্তনে সিল্ক রুট এখন নেই। তবে এশিয়ায় চীনের অভাবনীয় অর্থনৈতিক উত্থানে এবং ভারতে পুঁজি বিকাশের ধারায় সেই সিল্ক রুট নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। মন্দায় আক্রান্ত বিশ্বে এশিয়াকেই আগামীর অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র বিবেচনা করা হচ্ছে। ফলে সিল্ক রুট নিয়ে চীনের অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে পশ্চিমারা সরাসরি যুক্ত না হলেও নতুন সিল্ক রুটের ধারণা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে কানেকটিভি জোরদারে এ উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলার উদ্যোগের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিপুল কৌতুহলী। যুক্তরাষ্ট্রও উদ্যোগটিকে সমর্থন জানিয়েছে।

ঐতিহাসিক সিল্ক রুট কিংবা নতুন সিল্ক রুট যাই বলা হোক না কেন- বৃহত্তর ক্যানভাসে বিবেচনা করলে বিসিআইএমকে ওই কানেকটিভিটির অংশ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। পাশাপাশি, ভারত যেভাবে তার এক অংশ থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে পণ্য নিতে বাংলাদেশের কাছে ট্রানজিট চাইছে তারও অনেকখানি পূরণ হবে বিসিআইএম অর্থনৈতিক করিডরে।

চীনের ইউনান প্রদেশের উন্নয়নে এ উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার বিকল্প নেই প্রদেশটির ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে। বাংলাদেশ ও মিয়ানমার এ বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখতে পারে না। এ বিবেচনায় বিসিআইএম অর্থনৈতিক করিডরের বিষয়ে বাংলাদেশের আগ্রহ রয়েছে। বিশেষ করে চীন ও ভারতের মতো অর্থনৈতিক শক্তির ভূমিকা এ অঞ্চলের দেশগুলোর বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে থাকে। তাই দুই বড় দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ যোগ দিয়ে তার অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে অধিক তথ্য ও জ্ঞান আহরণকে বাংলাদেশ যৌক্তিক মনে করছে।

******* বিশ্বের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক হতে যাচ্ছে বিসিআইএম: *******

১। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশেরই বাস এই চার দেশে। বিসিআইএম দেশগুলোতে দুই দশমিক আট বিলিয়ন জনগোষ্ঠী বসবাস করছে। এর মধ্যে ৬৮ শতাংশই কর্মক্ষম।

২। চার দেশের মোট জিডিপি ৫.৭ ট্রিলিয়ন, যা বৈশ্বিক জিডিপির ১০ শতাংশ। অর্থনীতির আকার ১১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৩। চার দেশেই প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। রয়েছে পানি ও জ্বালানি সম্পদ।

৪। এ ছাড়া প্রতিটি দেশেরই আলাদ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- সেবা খাতে বাংলাদেশ ও ভারত অনেক সমৃদ্ধশালী। শিল্পে এগিয়ে চীন। কৃষিতে মিয়ানমার। তাই অর্থনৈতিক করিডর চালু হলে এক দেশের সম্পদ বা প্রযুক্তি অন্য দেশ ব্যবহার করে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হতে পারবে।

Key Statistics – 2012				
	Population	GDP (US$)	GDP Growth	Total Trade (US$)
Bangladesh	154.7 million	115.60 billion	6.3%	60.81 billion
China	1.35 billion	8.23 trillion	7.8%	3.87 trillion
India	1.24 billion	1.84 trillion	3.2%	794.00 billion
Myanmar	58.8 million	51.92 billion	6.3%	13.30 billion

Source: World Bank & CIA World Factbook

********** ৪ টি দেশ কী সুবিধা পাবে ? **********

পর্যালোচনা করে দেখা যায় 'এ করিডোর তার রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক'। যদিও এখানে কারো অর্থনৈতিক লাভ বেশি কারো কম। বিসিআইএম করিডরের মাধ্যমে ভারত ও চীনে বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়বে। এর মাধ্যমে এ দুই দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতিও কমবে। এত দিন যেসব সমস্যা দ্বিপক্ষীয়ভাবে সমাধান হতো না, এখন সেগুলো আঞ্চলিক পর্যায়ে সমাধান করা সম্ভব হবে।

১। চার দেশে সাড়ে ৪৪ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য বৃদ্ধি:

চার দেশের মধ্যে বাণিজ্য খুবই কম। অর্থনৈতিক করিডর চালু হলে বাণিজ্য সহজীকরণ ও দ্বিপক্ষীয় ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে। বিসিআইএম হলে বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও মায়ানমারের মধ্যে ৫৭০ কোটি মার্কিন ডলারের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। যদি সব দেশের

বাণিজ্যনীতি উদারীকরণ হয়। পাশাপাশি বাণিজ্যনীতি পরিমিত উদারীকরণ হলে বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে ৪১০ কোটি মার্কিন ডলারের এবং আংশিক উদারীকরণ হলে বাণিজ্য বাড়বে ২৭০ কোটি ডলার। ওই স্টাডিতে বলা হয়, বিসিআইএম হলে বিসিআইএমের বাইরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য তৈরি হবে সর্বোচ্চ ৩৮০ কোটি মার্কিন ডলার এবং সর্বনিু ১৮০ কোটি ডলারের।

২। অর্থনৈতিক করিডর চালু হলে বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হবে। এর সুবিধা পাবে চার দেশই। রেল, নৌ, সড়ক ও আকাশ পথেও যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা হবে।

৩। বিসিআইএমের মাধ্যমে আঞ্চলিক যোগাযোগ বাড়বে।

৪। এতে গভীর সমুদ্র বন্দরের উপযোগিতা বহুলাংশে আরও বাড়বে।

৫। বিদ্যুত উত্পাদনের জন্য নদী ও জলপ্রপাত ব্যবহার বাড়বে।

৬। আঞ্চলিক যোগাযোগ ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।

৭। একই সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমনে চার দেশ একই প্রযুক্তি ব্যবহার বা আদান-প্রদান করতে পারবে।

৮। একই সঙ্গে আইটি এবং বিনোদনেও পরিবর্তন আসবে।

৯। অর্থনৈতিক করিডর চালু হলে শিক্ষা, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্যসেবা, খেলাধুলা একাডেমিক শিক্ষা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার হবে।

১০। অর্থনৈতিক করিডর চালু হলে চার দেশেরই জীবনযাত্রার মান বাড়বে।

১১। কৃষি, সেচ, প্রযুক্তি লেনদেন, শিল্প পার্ক দারিদ্র্য কমাতে সহায়তা করবে।

১২। পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও ময়লা শোধানাগার নির্মাণ, সুপেয় পানির ব্যবহারও বাড়বে।

১৩। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বাড়বে।

১৪। একই সঙ্গে পর্যটন খাতও বিকশিত হবে।

১৫। চারটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সহজীকরণ করা হলে আমদানি ও রফতানি ব্যয় কমবে।

********** কেন বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ? **********

১। প্রতিষ্ঠার পর ২৮ বছর পেরিয়ে গেলেও সার্ক, সাফটা কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। এগুলো আমাদের ইচ্ছা অনুসারে মুভ করছে না। এসব যদি কার্যকর হতো তাহলে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে রপ্তানি আরও অনেক বেশি হতো। আরেক জোট বিমসটেকেরও করুণ দশা। বিসিআইএমের ওপর তাই অনেক কিছু নির্ভর করছে।

২। বিসিআইএম কার্যকর হলে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য আরো অনেক বেড়ে যাবে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বাড়বে। বিসিআইএম বাস্তবায়নের ফলে বাণিজ্যিকভাবে বাংলাদেশ অনেক লাভবান হবে।

৩। বিশ্ব অর্থনৈতিক শক্তিতে চীনের অবস্থান দ্বিতীয় এবং ভারতের অবস্থান তৃতীয়। এ দুটি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বেশি। শিল্পের কাঁচামাল আমদানির কারণেই এ দুটি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘাটতি বাণিজ্য রয়েছে। ঘাটতি কমাতে ভারত ও চীন বাংলাদেশকে বাণিজ্য সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে। বিসিআইএম কার্যকর হলে এ বাণিজ্য ঘাটতি উল্লেখযোগ্যহারে কমে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

৪। চীন বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং উন্নয়ন সহযোগী। বাংলাদেশ চীনকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প গড়ে তোলার সুযোগ করে দিচ্ছে। এতে বাংলাদেশে চীনের শিল্প খাতে বিনিয়োগ অনেক গুণ বেড়ে যাবে।

৫। বাংলাদেশ চীন ও ভারত থেকে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেলেও মিয়ানমার থেকে পায় না। সে কারণে সে দেশে আমাদের রপ্তানিও সামান্য। শুল্ক বাধা দূর হলে বাণিজ্যও বাড়বে। এই করিডর হলে মিয়ানমারেও রপ্তানি বাড়বে।

৬। বিসিআইএম হলে ভারত-চীনের পর্যটকেরা এ দেশে আরও বেশি আসবে।

বিসিআইএম নিয়ে গবেষণাকারী সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান যুগান্তরকে জানান, বিসিআইএমের মাধ্যমে যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত হলে অর্থনৈতিক অঞ্চল ও স্পেশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠবে। চট্টগ্রাম বন্দরসহ বাংলাদেশের নানা উদ্যোগ থাকবে। এসব এলাকার উন্নয়নও হবে ব্যাপক। অর্থনীতিও পরিবর্তন হবে।

বিসিআইএম প্রসঙ্গে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বলেন, চার দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক করিডর চালু হলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। বাংলাদেশের জ্বালানি খাত সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি দেশে মানবসম্পদ বাড়বে। তাঁর মতে, এই জোটের মধ্য দিয়ে একটি বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এতে সড়ক, রেল, নৌ, বিমানসহ সব খাতেই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগবে। বিসিআইএমের মাধ্যমে শুধু পরিবহন যোগাযোগই বাড়বে না, বিনিয়োগও আসবে। এই অঞ্চলে নতুন পর্যটন স্থান গড়ে উঠবে। এটি বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে আঞ্চলিক সরবরাহব্যবস্থায় যুক্ত করবে। তবে এই করিডরের জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এবার নতুন জোট গড়ে সুফল পেতে বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে (বিসিআইএম) অর্থনৈতিক করিডর চালুর জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে।

********** বাংলাদেশ কীভাবে লাভবান হবে? **********

১। সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকার শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে বাংলাদেশ:
বিসিআইএমে অন্তর্ভুক্ত হলে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ৭০ কোটি মার্কিন ডলার (দেশীয় মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা) এবং সর্বনিু ৪০ কোটি ডলারের শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা গ্রহণ করবে। বিসিআইএম নিয়ে এশীয় প্যাসিফিক রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং নেটওয়ার্ক অন ট্রেডের গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের এই আর্থিক সুবিধার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। ওই সংস্থাটি বিসিআইএম হলে কোন দেশ কি সুবিধা পাবে তার ওপর একটি স্টাডি করেছে। গবেষণায় দেখানো হয়েছে- চারটি দেশের মধ্যে যদি বাণিজ্যনীতি আংশিক উদারীকরণ করে তাহলে সর্বনিু ৩ হাজার ১২০ কোটি টাকার শুল্কমুক্ত সুবিধা ভোগ করতে পারবে বাংলাদেশ। তবে, যে দেশের অর্থনীতির আকার বড় ওই দেশ এই শুল্ক সুবিধা বেশি ভোগ করতে পারবে।
২। বিসিআইএম কার্যকর হলে চীন ও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমবে।
৩। বাংলাদেশের রাজস্ব আয় কমবে না:
বিসিআইএমে অন্তর্ভুক্ত হলে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আয় হারাবে ভারত। অপর দিকে বাংলাদেশের কোনো রাজস্ব ক্ষতি হবে না। বিসিআইএমের অপর তিনটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাজস্ব সুবিধা দিতে গিয়ে ভারতের রাজস্ব বর্তমান আয়ের চেয়ে ৫৪ শতাংশ হ্রাস পাবে। এটি সর্বনিু ৩৬ শতাংশ হতে পারে। অপর দিকে চীনের রাজস্ব কমবে ৫৭ শতাংশ, মিয়ানমারের ৫৫ শতাংশ। তবে বাংলাদেশ বিসিআইএমে সম্পৃক্ততার পর যে বাণিজ্য সুবিধা পাবে বিপরীতে যা রাজস্ব আয় কমবে উভয় মিলে সমান থাকবে। ফলে বাংলাদেশের কোনো রাজস্ব ক্ষতি হবে না।
৪। কল্যাণমূলক আর্থিক সুবিধায় দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশ:
চারটি দেশের মধ্যে কল্যাণমূলক সুবিধার দ্বিতীয় স্থানে থাকছে বাংলাদেশ। বিসিআইএমের মধ্যে কল্যাণমূলক সুবিধা ভোগ করবে ভারত। আর্থিক দিক থেকে এই সুবিধার মূল্যমান হচ্ছে প্রায় ২৭ কোটি মার্কিন ডলার। সবচেয়ে কম সুবিধা পাবে মিয়ানমার। তাদের ক্ষেত্রে কল্যাণমূলক সুবিধার আর্থিক মূল্য হচ্ছে ৫০ লাখ ডলার। তবে দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশ কল্যাণমূলক আর্থিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে ৭ কোটি মার্কিন ডলারের।
৫। চীন ও ভারত থেকে বছরে ১১০০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করতে হয়। এসব পণ্য আমদানিতে পরিবহন ব্যয় বড় বিষয়। বিসিআইএমের ফলে পরিবহন ব্যয় অনেক হ্রাস পাবে।
৬। শুল্কের চেয়ে অশুল্ক বাধা বেশি। ফলে বাণিজ্য সহজীকরণ করা হলে অশুল্ক বাধাগুলো দূর হবে।
৭। গভীর সমুদ্র বন্দর হলে এর অবকাঠামো ব্যবহার করা যাবে বিসিআইমের মাধ্যমে।
৮। আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে পর্যটন, বিদ্যুত ও গ্যাসের সুবিধা বাংলাদেশ পাবে।

********** বিসিআইএম : অর্থনৈতিক হাব হবে বাংলাদেশ **********

চীন, ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বহুল আলোচিত অর্থনৈতিক করিডর চালু হলে বদলে যাবে বাংলাদেশের চেহারা। বিকাশমান দুই দেশ ভারত ও চীনের সংস্পর্শে সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ সব দিকেই লাভবান হবে দেশ। বিকশিত হবে এই দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। কমবে দারিদ্র্যের হার, সমৃদ্ধ হবে যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য। দূর হবে বাণিজ্য বাধা। তিন দেশ থেকেই পাওয়া যাবে জ্বালানি সহযোগিতা। ভৌগোলিক কারণে অন্য তিন দেশ থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। বিসিআইএম নিয়ে তৈরি করা সরকারের এক ধারণাপত্রে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, অর্থনৈতিক করিডর চালু হলে জোটভুক্ত চার দেশেই ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহার বাড়বে। আর জ্বালানি ব্যবহারে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে বাংলাদেশ। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো বড় আকারে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করছে। সেখান থেকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ আনতে পারবে। এ ছাড়া আঞ্চলিক জ্বালানি সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ উপকৃত হবে।

********** আশঙ্কা, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত **********

বিসিআইএম এর ভবিষ্য নির্ভর করছে চীনের ওপর। বিসিআইএম হলে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া যুক্ত হতে পারবে। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান, আফগানিস্তানও যুক্ত হবে।

বিসিআইএম নিয়ে তৈরি করা সরকারের এক ধারণাপত্রে কিছু আশঙ্কা এবং উদ্বেগের কথাও আছে। এতে বলা হয়েছে, জোটভুক্ত এই চার দেশের মধ্যে ভারত ও চীন প্রতিযোগী দেশ। উভয় দেশই অর্থনৈতিকভাবে বিকাশমান। আগামী বিশ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে ভারত ও চীন হবে বিশ্বের পরাক্রমশালী দুটি দেশ। তাই স্বাভাবিকভাবে দুই দেশের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই থেকেই যাবে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যেও দ্বিপক্ষীয় জটিলতা রয়েছে। রোহিঙ্গা এখনো অমীমাংসিত ইস্যু। এসব জটিলতা উতরাতে পারলে আশিয়ান ও ব্রিকসের মতো বিসিআইএম শক্তিশালী জোট হবে বলে ধারণাপত্রে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

********** প্রতিবন্ধকতা **********

তবে এই করিডর চালু হওয়ার পথে কিছু প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। এর মধ্যে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা, দুর্বল বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রথাগত জটিলতা অন্যতম। এ ছাড়া মুদ্রা বিনিময় এবং চার দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা নিয়েও জটিলতা আছে।

********** করণীয়? **********

চারটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য জোরদার করতে পরিবহনব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে। ইতিমধ্যে সড়ক পথের রুট চিহ্নিত করা হয়েছে। রেল ও নৌপথের রুট চিহ্নিত করতে হবে। এজন্য অবকাঠামো উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিসিআইএমকে কার্যকর করতে দ্বিপক্ষীয় সমস্যাগুলো গতিশীলভাবে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া, অশুল্ক বাধা দূর করা, ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়ার প্রস্তাব দেন তথ্যমন্ত্রী।

********** উপসংহার **********

আমরা এখন অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের মধ্যে আছি। আমরা যত বেশি দেশের সঙ্গে একত্রে থাকতে পারব, তত উন্নতি করব। বিসিআইএম অর্থনৈতিক করিডর কার্যকর হলে লাভবান হবে বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি বাড়বে। এ জন্য বিসিআইএমকে দ্রুত কার্যকর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন।

MDG

লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি
Topic :::: Economy....emphasis on developments, Poverty Alleviation.
Sub Topics :::: সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG), টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)

প্রশ্ন: বাংলাদেশের MDG বাস্তবায়নে সাফল্য, অগ্রগতি এবং পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে আপনার মতামত উল্লেখ করুন।

+++++++++ MDG (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য): আরও পথ বাকি +++++++++

এমডিজি: নিলওয়াকরের প্রতিবেদন
(নিল ওয়াকার, বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক)

১৫ বছর আগে স্বাক্ষর হওয়া সহস্রাব্দ ঘোষণা প্রথমবারের মতো উন্নয়নের একটি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়, যা আজ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) হিসেবে পরিচিত।

প্রথম থেকে এমডিজি বৈশ্বিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপরেখা হিসেবে বিবেচিত। কারণ এটিই জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রগুলোর প্রথম উন্নয়নবিষয়ক সর্বসম্মত রূপরেখা, যা শুধু সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য নয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জনযোগ্যও বটে।

বস্তুত এই লক্ষ্যসমূহ বর্তমান বিশ্বের আটটি উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি বৈশ্বিক রোডম্যাপ হিসেবে পরিগণিত। এই লক্ষ্যমাত্রার মূল প্রতিপাদ্য হলো, এই আটটি এমডিজির সব বাস্তবায়িত হলে তা মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন নিয়ে আসবে, দূর করবে বৈশ্বিক দারিদ্র্য ও বঞ্চনা। এ ধরনের লক্ষ্য নির্ধারণের ধারণাটি ছিল চমৎকার, আর এই লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয়টি বেশ ফলদায়কও প্রমাণ হয়েছে। এর ফলে 'ফল-অর্জনভিত্তিক ব্যবস্থাপনা' ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্তত তিনভাবে সহায়তা করেছে।

প্রথমত, এমডিজির অধীনে, 'মানব উন্নয়ন' বৈশ্বিক উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে স্থাপিত হয়েছে। সহস্রাব্দ ঘোষণা সমতা, সংহতি, সহনশীলতা, প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্বের অংশীদারির নীতির ওপর জোর দিয়েছে। উন্নয়নের জন্য দরকার এই নীতিগুলোকে কাজে পরিণত করা। উন্নয়ন যে কেবল বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মডেলের ওপর নির্ভরশীল না, উন্নয়ন মানে যে মানবিক সামর্থ্য ও সম্ভাবনা—মানুষের পছন্দের আওতা বিস্তৃত করায় বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো তা প্রতিষ্ঠা করেছে। এই কর্মপদ্ধতি কেবল যে মানুষের জীবনের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে তা নয়, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন-প্রক্রিয়ায় মানুষের অংশগ্রহণও বাড়িয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১৫ বছরের জন্য পরিষ্কার রূপকল্প হাজির করেছে এবং জোগান দিয়েছে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল। তার পরও এটা সত্য যে উন্নয়ন-সহযোগীরা যতটা আশা করা হয়েছিল প্রকৃত ক্ষেত্রে ততটা তহবিলের জোগান দেয়নি, তার পরও তাদের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। এর লক্ষ্যবিন্দু যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তাকে সমন্বিত করা হয়েছে অভিন্ন লক্ষ্যে করা জাতীয় বিনিয়োগের সঙ্গে। এই প্রচেষ্টা সত্যিকার সাফল্য অর্জন করে। এমনকি অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সময়েও দাতাদেশগুলোর তরফে তাদের সরকারি উন্নয়ন-সহযোগিতা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া ও তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে এমডিজি। এসব লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় বাজেট ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেশগুলোর নিজস্ব বিনিয়োগের বিশেষ গুরুত্বের দিকেও আমি জোর দিতে চাই। এই পথেই দাতাদেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের মতো গ্রহীতা দেশগুলোর অংশীদারি সম্পর্ক আরও জোরদার হয়। এমডিজির মালিক সরকার—এমডিজি অর্জনে সরকারগুলোর নিজস্ব বিনিয়োগই এর প্রমাণ। এমনকি সরকারগুলো নাগরিকদের জীবনের মান উন্নয়নে দাতাদের তরফে বাড়তি বিনিয়োগ আহ্বানেও সক্ষম।

চূড়ান্তভাবে আগে এমডিজি-পূর্ব উন্নয়ন অন্বেষণ ছিল অসমন্বিত আর ছিল না অভিন্ন ভবিষ্যতের কোনো রূপকল্প। কিন্তু এমডিজি কোনো উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন নয়, বরং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও তা গণকেন্দ্রিক, সময়াবদ্ধ ও পরিমাপযোগ্য। সাফল্য পরিমাপের জন্য এই লক্ষ্যমাত্রার রয়েছে সুস্পষ্ট রূপরেখা, রয়েছে ঘাটতি নিরূপণের ব্যবস্থা এবং তা উত্তরণে কার্যকর সহায়তা। এর ফলে উন্নয়ন কার্যকারিতা ও সহায়তা সমন্বয়ের মতো ব্যাপারগুলোর আলোচনায় বিশেষ করে ২০০০ সালের পর থেকে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। এখন, ২০১৫ সাল নাগাদ যখন এমডিজি পূরণের সময়সীমা এগিয়ে আসছে, তখন আমাদের যেমন অর্জনের খতিয়ান নিতে হবে, তেমনি তাকাতে হবে সামনে।

******* বাংলাদেশের এমডিজি অভিজ্ঞতা: সাফল্য ********
বাংলাদেশের সফলতার বাস্তব পরিমাপ বাংলাদেশ ত্বরান্বিত এমডিজি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের মডেল হিসেবে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলাদেশের এই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে সরকার ও সরকারবহির্ভূত সংস্থাগুলোর লাগাতার দায়বদ্ধতার জন্য। এমডিজির গতি ত্বরান্বিত করায় বাংলাদেশ হলো অন্যতম প্রথম দেশ, যা অদক্ষতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তা পূরণে সম্পদকে কাজে লাগিয়েছে। ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের সরকারগুলো জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেটের কাঠামোর সঙ্গে সরাসরি এমডিজির লক্ষ্যকে যুক্ত করে নিয়েছে।

এমডিজি প্রক্রিয়ার সাফল্য তুলে ধরায় যে তিনটি লক্ষ্যে বাংলাদেশ লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে, সেগুলোর উল্লেখ করব।

এমডিজি ১ চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ:
১৯৯০ সালে যেখানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৬০ শতাংশ, সেখানে ২০১২ সালে, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্কলন অনুযায়ী তা নেমে এসেছে ২৬.৪ শতাংশে। ক্ষুধাও অনেক কমিয়ে আনা গেছে। তা হলেও, খাদ্যপ্রাপ্তির সুযোগ বাড়া মানেই অধিকতর পুষ্টি আহরণ নয়। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের ৪৫ শতাংশ এখনো ওজন ঘাটতিতে আছে। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতায়ও এই প্রবণতা প্রতিফলিত হচ্ছে। আসল চ্যালেঞ্জ এখনো খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত নয়, উচ্চ পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্যপ্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করাই আসল চ্যালেঞ্জ।

এমডিজি ২ সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা:
প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ফারাক এখনো ১০ শতাংশের কম। বাংলাদেশে ১৯৯০ থেকে ২০১১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৬০ থেকে ৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই হারের মধ্যে ছেলে ও মেয়েদের অংশ সমান সমান। এটা এক দারুণ অর্জন, যদিও আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এমডিজির পূর্ণ লক্ষ্য আংশিকভাবেই অর্জিত হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই যে অন্য আরেকটি শিক্ষাগত লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছাতে হবে, সেটা হলো মানসম্পন্ন শিক্ষার ধারণা। এ ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়ার পথে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এমন পাঠ্যসূচি, যা নবীন বাংলাদেশিদের কেবল জটিল কাজের দক্ষতাই শেখাবে না, শেখাবে নাগরিকতা, জাতীয় ইতিহাস ও সহনশীলতার পাঠ। তাহলে আমাদের শিক্ষকদের পেছনেও বিনিয়োগ করতে হবে এবং হতে হবে সৃজনশীল। বাংলাদেশ যেখানে গিয়ে এমডিজি অর্জনে কমতিতে থাকবে সেটা হলো, শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ধরে রাখা।

এমডিজি ৫ মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন:
বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৯৪ সালে ছিল জীবিত শিশুর জন্মের ক্ষেত্রে প্রতি এক লাখে ৫৭৪ জন। এটাই ছিল পরিমাপের ভিত্তি। ২০১১ সালে সংখ্যাটি নেমে গেছে ১৯৪ জনে। এটা যুগান্তকারী অর্জন হলেও এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন সাফল্য এখনো অর্জনের অপেক্ষায়। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং ক্লিনিকের অপ্রাপ্যতা এখনো মাতৃস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একই অবস্থা প্রসবের সময় পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মী পাওয়ার বেলায়ও।

এ বছরের এপ্রিল মাসে আমরা 'পদক্ষেপের ১০০০ দিন' কর্মসূচি চালু করেছি। এর লক্ষ্য ২০১৫ সালে এমডিজি পূর্ণ করার যে সময়সীমা, তার আগের ১০০০ দিনে অসম্পূর্ণ লক্ষ্যগুলো পূরণে কর্মকাণ্ড জোরদার করা। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জ্বালানি ও পয়ঃপ্রণালি খাতে লক্ষ্যভিত্তিক বিনিয়োগ বাড়ানো; নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন; সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় থাকা মানুষের ওপর আলোকপাত; সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পালন এবং অবস্থা বদলের স্বার্থে সরকার ও তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড জোরদার করা। বাংলাদেশের সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে মনোযোগ দরকার এমন অন্য খাতগুলোর কথাও ভুলে যাওয়া চলবে না আমাদের। বিশেষ করে, এমডিজি৩ (লিঙ্গসমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা)-এর ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনা দরকার। এ বিষয়ে আলোকপাতের সময় আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে নারীর সমতা ও ক্ষমতায়ন কেবল এই ক্ষেত্রে কাজের ওপর নির্ভরশীল না, বরং তা অন্যান্য ক্ষেত্রের লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

যা হোক, উন্নয়ন আসলে কোনো সংখ্যার খেলা নয়। আমাদের উচিত সংখ্যার সীমায় পৌঁছানোর পাশাপাশি উন্নয়নে প্রগতির মান নিশ্চিত করা। এমডিজি কার্যক্ষেত্রে উদ্ভাবনশীল এবং ফলাফল-প্রভাবিত (রেজাল্ট অ্যাফেক্টিভ)-এর থেকেও এগিয়ে যাওয়া সত্যিই এক রোমাঞ্চকর সুযোগ। এমডিজির সাফল্যসোপান আমাদের নির্মাণ করা উচিত এমনভাবে, যাতে আমরা কেবল এর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যেই দৃষ্টিকে সীমিত করে না রাখি। আমরা যে লক্ষ্য বেছে নেব, তা যেন বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক হয়, হয় উচ্চাভিলাষী কিন্তু সম্ভবপর, উত্তরণকামী কিন্তু বাস্তব।

******* ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ******
২০১২ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব এক বৈশ্বিক সংলাপের সূচনা করেন। নাগরিক সমাজ ও সরকারসহ ১০ লাখেরও বেশি মানুষের সঙ্গে ভবিষ্যতে তাদের জীবনের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সংলাপ হয়েছে। তিনি নীতিপ্রণেতাদের কৌশলগত সহায়তার জন্য জাতিসংঘের বিশেষ বিশেষজ্ঞ দল নিয়োজিত করেছেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই জাতীয় পরামর্শ-প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ অল্পসংখ্যক দেশকে তাদের জাতীয় পরামর্শ-প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য বেছে নিয়েছে, যার অন্যতম বাংলাদেশ। এবং বাংলাদেশ 'স্বল্পোন্নত' দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ও সরব দেশ হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছে। এমডিজির অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় এর মূল লক্ষ্যগুলো পূরণের পথে আমাদের আর কী কী কর্মকাণ্ড থাকা উচিত তা নিয়ে বৈশ্বিক সংলাপেও বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়; যেহেতু কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ এখনো পূর্ণ হয়নি এবং ওই সব অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যেহেতু উদ্ভাবনাময় কৌশল নিয়ে সফল হয়েছে। এটা বলাই সংগত যে বিশ্ব বাংলাদেশের কথা শুনছে।

বাংলাদেশে, নাগরিক সমাজ নেতাদের একটি প্যানেল, চিন্তক, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ও সরকারি কর্মকর্তারা ২০১৫ সালের পর উন্নয়ন এজেন্ডা কী হবে তা নিয়ে দেশব্যাপী পরামর্শ-প্রক্রিয়া চালিয়েছেন। এ থেকে বেরিয়ে এসেছে অংশগ্রহণকারীদের নতুন ধ্যানধারণা, চিন্তা, স্বপ্ন ও উচ্চাভিলাষ। ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তাব করেছে: জলবায়ু পরিবর্তনের

প্রভাব, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতা অর্জন, গণতান্ত্রিক পরিচালনা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং গ্রহণবাদী (ইনক্লুসিভ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

যে রূপরেখা আমি চিহ্নিত করলাম তাতে দেখা যাচ্ছে, এমডিজি পূরণে বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ঘটিয়েছে, কিন্তু এখনো করার আছে অনেক কিছু। এ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে ধারণাটি বেরিয়ে এসেছে তা হলো ন্যায়পরায়ণতা। উন্নয়নকে অবশ্যই কেবল সামাজিকভাবে, প্রতিবেশগতভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে টেকসই হলেই হবে না, তাকে হতে হবে ন্যায়পরায়ণ। কেবল বাংলাদেশের বেলায় নয়, পৃথিবীর সব দেশের বেলায়ই এই চ্যালেঞ্জ প্রযোজ্য। খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্বের বিপুলসংখ্যক হতদরিদ্র মানুষ বাস্তবে দরিদ্র দেশগুলোতে বাস করে না। যেমন ধরা যাক, ২০১২ সালে ভারতে প্রায় ৫০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করত, যেখানে বাংলাদেশ রয়েছে দারিদ্র্য হটানোর পথে। কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য হলো, এই অর্জন এখনো নাজুক। এবং বাংলাদেশ ইতিমধ্যে যত দূর এগিয়েছে (দারিদ্র্য ৬০ থেকে ৩২ শতাংশে নামিয়ে আনা) তার থেকে আরও কঠিন হবে ৩০ শতাংশ দরিদ্র মানুষের সংখ্যাকে (ধরা যাক) ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা।

অর্জনের পরের চক্রটিতে আমাদের আরও বাস্তব দৃষ্টিপাত করতে হবে বলে আমি মনে করি। কেবল জ্বালানি, অবকাঠামো ও শিক্ষায় বিনিয়োগ করলেই চলবে না, দুর্নীতি দূরীকরণ এবং টেকসই গণতান্ত্রিক শাসন অর্জন, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতা প্রতিষ্ঠার দিকে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। শক্তিশালী অর্থনৈতিক বিকাশ ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রূপান্তরের সঙ্গে সর্বজনবাদী সামাজিক উন্নয়নের ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হতে পারে, কিন্তু এদের অবশ্যই পরস্পরের ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে। আগামী নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা অনুভূত হলেও, এই দেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে আমি যা আসছে তাতে ভরসা রাখি। ন্যায়পরায়ণতাকে শক্তিশালী করা, শক্তিশালী ও উদার গণতন্ত্রকে সক্ষম করে তোলা, তরুণদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা এবং পুরোনো ও নতুন অংশীদারকে কাজে লাগানোই হবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার। গত ১৩ বছরে এমডিজি অর্জনের ফল প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশ বিশ্বই হোক আর দেশেই হোক, যা অর্জন করতে চায়, তা বাস্তবায়নে সক্ষম।
(ইংরেজি থেকে অনূদিত)
নিল ওয়াকার: বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক

+++++++ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ সমূহের সাফল্য ও অগ্রগতি ++++++++

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্টির জন্য খুলে দিয়েছে অপার সম্ভাবনার দুয়ার। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কৃষি বিপ্ল¬ব, শিল্প বিপ্ল¬বের পর বর্তমান পৃথিবী নতুনতর এক বিপ্ল¬বের মুখোমুখি হতে চলেছে যার নাম তথ্য বিপ্ল¬ব। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যদি এই শতাব্দীকে নতুন কোন নামে অভিহিত করা হয় তবে তথ্য প্রযুক্তির শতাব্দী হবে তার জন্য উপযুক্ত।

বর্তমান শতাব্দীর গ্লে¬াবালাইজেশনের ফলে একটি দেশের উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্যতম নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির হাতিয়ার হচ্ছে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট । কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের বদৌলতে পৃথিবী এখন গ্বাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। বলা চলে পৃথিবী হাতের মুঠোয় নয় আঙুলের ডগায় চলে এসেছে। কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার এবং সফল প্রয়োগ যে কোন অনুন্নত দেশকে উন্নত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সচেষ্ট।

মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ২০১৫
জাতিসংঘ পৃথিবীর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর শান্তি, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নে যে কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে তার নাম সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ বা মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ২০১৫। জাতিসংঘের ১৯১ টি সদস্য রাষ্ট্র মিলিনিয়াম ডিক্লিয়ারেশনের (GA Resolution A/54/2000) মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার ব্যক্ত হয় সকলের জন্য সমান অধিকার , মর্যদা,স্বাধীনতা এবং জীবন ধারণের জন্য নূন্যতম স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

জাতিসংঘ ২০০০ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে টার্গেট করে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও মৃত্যু দূর করে শিক্ষিত, সুস্থ, সমতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ বিশ্ব গঠনের উদ্দেশে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) ঘোষণা করে। ২০০০ সালে ১৮৯টি সদস্য রাষ্ট্র এবং ২৩টি আন্তর্জাতিক সংস্থা আটটি প্রধান লক্ষ্যমাত্রার আওতায় একুশটি উপলক্ষ মাত্রার এই ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করে। ঘোষণাপত্রে

বলা হয়, ২০০০ সাল থেকে ১৫ বছরের মধ্যে অর্থাত্ ২০১৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলো এমডিজি অর্জনে সফল হলে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো সব ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। লক্ষ্যগুলো হলো— চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ; সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন; জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন; শিশু মৃত্যু হ্রাস; মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন; এইডসসহ ঘাতক রোগ নির্মূল; টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের উন্নয়ন বিকশিতকরণ।

পরবর্তীতে সহস্রাব্দ ঘোষণার বিস্তারিত জাতিসংঘের মহাসচিব তাঁর রিপোর্ট "A Road Map Towards the Implementation of the UN Millennium Declaration" (GA Resolution A/56/326). করেন। এই দুইটি ঘোষনাপত্র সমন্বয়ে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূল করা, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, নারী পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন,শিশুমৃত্যু হ্রাস, প্রসূতি স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগের মোকাবেলা, টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং উন্নতির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতিসংঘের ১৯১টি সদস্য রাষ্ট্র এবং ২৩টি আর্ন্তজাতিক সংগঠন সর্বসম্মতিক্রমে ৮টি লক্ষ্য এবং ২১টি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস ২০১৫(এমডিজিস)বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ ঘোষণা করেন।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ এর ৮টি লক্ষ্য সুন্দর ভাবে সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ কে প্রগতিশীল ও সমতাপূর্ণ বিশ্ব বিনির্মানের পথ নকশা হিসেবে উল্লেখ করা যায় । অনুরুপভাবে ভিশন ২০২১ কে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনিমানের পথ রেখা বলা যায়। দিন বদলের অঙ্গীকার সমৃদ্ধ রূপকল্প ২০২১ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ বাস্তবায়নে মাইল ফলক হিসেবে ভবিষ্যৎ বির্নিমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করবে।

++++++ এসডিজি, এমডিজি ও বাংলাদেশ ++++++
বিশ্বকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা থেকে মুক্ত করতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ রয়েছে অনেক। যদিও সেসব উদ্যোগের আন্তরিকতা, বিশেষ করে ধনী দেশগুলোর আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন আছে, এর পরও কিছু কিছু উদ্যোগ কার্যকর হয়েছে, কিছু উদ্যোগ হয়তো ভালো কিছু করার পথ দেখিয়েছে, আর কিছু হয়েছে ব্যর্থ।
পুরো পৃথিবীর মানুষের জীবনমান উন্নয়নে লক্ষ্যে বিশ্ব নেতারা ২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস (এমডিজি) তৈরি করেছিলেন। ২০১৫ সালে সেই লক্ষ্যমাত্রার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার পর কী? ২০১৫-পরবর্তী লক্ষ্য বা উন্নয়ন লক্ষ্য নিয়ে এরই মধ্যে কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। আর এজন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজি) প্রণয়ন প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছে খোদ জাতিসংঘ।

এসডিজি: ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্য
দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, নারী-পুরুষ সমতা, নারী উন্নয়ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, টেকসই পরিবেশ, এইচআইভি এইডস ও সংক্রামক ব্যাধি এবং বিশ্ব সহযোগিতা— এ আট ক্ষেত্রে বিশেষ কতগুলো লক্ষ্য নির্ধারণ করে, সেগুলো পূরণের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০১৫ সাল। ২০১৫ সাল যতোই এগিয়ে আসছে, তখনই এর পরবর্তী লক্ষ্য কী হবে; তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে। এরই সূত্র ধরে ২০১২ সালের জুনে ব্রাজিলে রিওতে বিশ্বের ১৯২টি দেশ একটি প্রক্রিয়া শুরুর ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে।
রিও সম্মেলনে লক্ষ্যগুলোকে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। ২০১৩ সালের ২২ জানুয়ারি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৩০ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি করে দেয়, যারা সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনে নতুন লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের সুপারিশ পেশ করবে। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের প্যানেল ২০১৫-পরবর্তী বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কী হওয়া উচিত, সেটা খুঁজে বের করার জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব বিশ্বের ১২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের প্যানেল গঠন করে দিয়েছেন; যেখানে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন, লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপতি এলেন জনসন সিরলেফ ও ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ড. সুশীলো বামবাং ইয়াধুনো কো-চেয়ার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হোন। উচ্চপর্যায়ের এ প্যানেল পৃথিবীজুড়ে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার আয়োজন করে। এ প্যানেলের বক্তব্য অনুযায়ী, তারা ১২০টি দেশে তৃণমূল সংগঠন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জোট পর্যন্ত ৫ হাজারের বেশি সুশীল সমাজ সংগঠনের সঙ্গে ২০১৫-পরবর্তী লক্ষ্য ও টার্গেট নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তারা কথা বলেছেন ৩০টি দেশের ২৫০টি কোম্পানির প্রধান নির্বাহীর সঙ্গে, যারা ৮ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি কর দিয়ে থাকেন। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাবিদদের সঙ্গে, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও ও সুশীল সমাজ আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে এবং সংসদ সদস্যদের সঙ্গে।

সুশীল সমাজ সংগঠনের উদ্যোগেও পৃথিবীব্যাপী এ বিষয়ে আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যেখানে স্থানীয় সংগঠন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর উঠে এসেছে এবং তাদের বক্তব্য প্যানেলের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়েছে। সুশীল সমাজ প্রতিনিধিরা উক্ত প্যানেলের আনুষ্ঠানিক বৈঠকের সময় নানা প্রান্তের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ফোরাম গঠন করেছে এবং ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন আলোচ্য নিয়ে মতবিনিময় করেছে।

উচ্চপর্যায়ের প্যানেল ৩০ জুন, ২০১৩ "A New Global Partnership : Eradicate Poverty and Transform Economics through Sustainable Development" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।
প্রতিবেদনটিতে ২০১৫-পরবর্তীকালে উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে মোট ১২টি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো— ১. দারিদ্র্য নিরসন; ২. নারী ও মেয়েশিশুর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জন; ৩. মানসম্মত শিক্ষাদান ও আজীবন শিক্ষা; ৪. সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা; ৫. খাদ্যনিরাপত্তা ও উত্তম পুষ্টি নিশ্চিত করা; ৬. পানি ও স্যানিটেশনে বৈশ্বিক প্রবেশাধিকার অর্জন; ৭. টেকসই জ্বালানির সুরক্ষা; ৮. কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই প্রতিবেশ ও সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি; ৯. খনিজ সম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা; ১০. সুশাসন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করা; ১১. স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ নিশ্চিত করা এবং ১২. একটি বৈশ্বিক সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের পথ প্রশস্ত করা।
****

SDG

লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি
Topics :::: Economy....emphasis on developments, Poverty Alleviation.
Sub Topic :::: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)

********* এসডিজি তৈরিতেও শেখ হাসিনার সহায়তা চাইলেন বান কি মুন **********

২০১৫ সাল পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজি) প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস (এমডিজি) নির্ধারণে ভূমিকা রাখার কারণে এবার এসডিজিতেও ভূমিকা রাখতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

২০১৫ সাল পরবর্তী সময়ের জন্য এবার গৃহীত হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজি)। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে চূড়ান্ত হবে সেই লক্ষ্যমাত্রা। আর সে কারণেই জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন।
সূত্র জানায়, এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের অন্যতম অগ্রসর দেশ। নির্ধারিত সময়ের আগেই বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ফেলে। আর সে কারণে এই সময়ে বাংলাদেশ হয়ে ওঠে বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল। এ কারণে জাতিসংঘ মহাসচিব এসডিজি হাতে নেয়ার ক্ষেত্রেও শেখ হাসিনার কাছেই সব রকমের সহযোগিতা চেয়েছেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম জানিয়েছেন, জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা আরও জোরালো হবে। এবার ২০১৫ সালে জাতিসংঘ সম্মেলনে এমডিজির সমাপনী হবে। অন্যদিকে ২০১৫-পরবর্তী লক্ষ্য বা উন্নয়ন লক্ষ্য নিয়ে এরই মধ্যে কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারকার সম্মেলনে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন। কারণ তিনি একমাত্র নির্বাহী প্রধান যিনি এমডিজি প্রণয়নে সামিল ছিলেন এবং এসডিজি প্রণয়নেও সামিল হবেন।

********** টেকসই উন্নয়ন **********

এ বিষয়ে কিছু বলার আগে টেকসই উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় তা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেইরোতে (রিও-তে) যে ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে গৃহীত Agenda-21-এ টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়ঃ টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক বিকাশ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সমন্বিত ব্যবস্থা এবং এটি বাস্তবায়িত হতে হবে মানুষকে কেন্দ্র করে। ২০১২ সালে রিও-তেই অনুষ্ঠিত রিও+২০ সম্মেলনে গৃহীত 'The Future We Want'-এ এই সংজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করা হয় এবং এর মানবকেন্দ্রিকতাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়।

নির্ধারিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময় বেঁধে দেয়া হয়েছিল ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ২০১২ সালের গোড়ার দিক থেকে জাতিসংঘের নেতৃত্বে ২০১৫-উত্তর উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, সেগুলোর আওতায় লক্ষ্যমাত্রাসহ সূচকসমূহ এবং কত বছরে সেগুলো অর্জন করা হবে তার মেয়াদ নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জাতিসংঘ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের মাধ্যমে তত্পরতা চালায়। পাশাপশি সদস্য দেশসমূহ এবং দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী ও নাগরিক প্রতিষ্ঠান সুপারিশ ও প্রস্তাবনা তৈরি করে জাতিসংঘে পাঠাতে থাকে। আর রিও+২০ সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী ২০১৫-পরবর্তী সময়ের জন্য একগুচ্ছ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য এবং সংশ্লিষ্ট সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ প্রস্তাব করতে জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ৩০ আসনবিশিষ্ট একটি Open Working Group (OWG) ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে গঠন করা হয় । পরবর্তীতে এই ৩০টি আসনে ৬৯টি রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ OWG-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিভিন্ন উত্স থেকে প্রাপ্ত নানা বিশ্লেষণ ও প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে এবং এতে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের আলোচনা-পর্যালোচনা-দেনদরবারের ভিত্তিতে OWG ২৫ জুলাই ২০১৪ তারিখে ১৭ লক্ষ্য ও ১৬৯ সূচক সম্বলিত একটি টেকসই উন্নয়ন প্রস্তাব পেশ করে। প্রস্তাবিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সময়-কাঠামো নির্ধারণ করা হয় ২০১৬-২০৩০, এই ১৫ বছর।

দারিদ্র-দূরীকরণ, ক্ষুধা-নির্মূলকরণ, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, লিঙ্গ-সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন, বিশুদ্ধ পানির সংস্থান, সকলের জন্য বহনযোগ্য মূল্যে জ্বালানির ব্যবস্থা, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন, উদ্ভাবন, দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বৈষম্য দূরীকরণ, শহরের পরিকল্পিত উন্নয়ন, টেকসই উত্পাদন ও ভোগ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা, সমুদ্র সংরক্ষণ এবং সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের অবনয়নবোধ এবং উন্নয়ন সাধন, মরুকরণরোধ, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন, এবং গৃহীত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ এবং আন্তজার্তিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি টেকসই উন্নয়ন সক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় OWG প্রস্তাবিত লক্ষ্য ও সূচক সমূহে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আশা করা যায়, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আগামী সভায় (সেপ্টেম্বর ২০১৫) একটি ২০১৫-উত্তর টেকসই উন্নয়ন কাঠামো ও প্রক্রিয়া গৃহীত হবে। ২০১৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এমডিজি অর্জনের লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। এসব সম্মেলন ও আলোচনায় এমডিজি'র ধারণাকে এগিয়ে নেয়া এবং উন্নয়নকে টেকসই করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয় আন্তঃসরকার আলোচনার মাধ্যমে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা নির্ধারণের। যার মধ্যে এসডিজিও থাকবে। এই বিষয়সূচিতে কোন কোন ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত হবে তা তুলে ধরার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের নেতৃত্বে একটি বিশ্লেষণী প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

'২০৩০ সালের মধ্যে মর্যাদার সোপান: দারিদ্র্যের অবসান, সব জীবের উন্নয়ন এবং গ্রহের সুরক্ষা' শীর্ষক এই বিশ্লেষণী প্রতিবেদন গত মাসে সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করা হয়। এই প্রতিবেদন আন্তঃসরকার আলোচনার ইনপুট হিসেবে কাজ করবে। প্রতিবেদনে সদস্য দেশগুলোর দেয়া আকাঙ্ক্ষা ও রূপকল্প নিশ্চিত করা এবং টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা প্রণয়ন ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ছয়টি প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্বলিত একটি সমন্বিত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

এই ছয়টি উপকরণ হচ্ছে—
(ক) দারিদ্র্য অবসান এবং অসমতা মোকাবেলার মাধ্যমে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা;
(খ) নারী ও শিশুর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে সকল মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবন ও জ্ঞান নিশ্চিত করা;
(গ) একটি সুদৃঢ়, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং রূপান্তরিত অর্থনীতি গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধি আনয়ন;
(ঘ) সকল সমাজ ও আমাদের শিশুদের জন্য জীবপ্রক্রিয়া সংরক্ষণ;
(ঙ) নিরাপদ সমাজ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়াকে উত্সাহিত করার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং
(চ) টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।

প্রতিবেদনে একটি সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ, প্রযুক্তি, বিনিয়োগসহ প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোর একটি কার্যকর ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিশ্রুতি পূরণে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়ার সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে পরিসংখ্যানগত সামর্থ্য বাড়ানো এবং প্রথাগত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তাব করা হয়েছে। রাজনৈতিক সদিচ্ছাকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে নেয়া এবং বহুজাতিক পদ্ধতি ও বিভিন্ন দেশকে শক্তিশালী করতে পারলে আগামী ১৫ বছরে মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে প্রতিবেদনে আশাবাদ করা হয়। এদিকে প্রায় দেড় বছর ধরে উন্মুক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ সব দেশ, সংস্থা, সিভিল সোসাইটিসহ স্টেকহোল্ডারের প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে অনেকগুলো উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ধারন করে বাংলাদেশ নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবে, এটাই কাম্য। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে টেকসই উন্নয়নে অর্থ্যাত্ সকলের নায্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নে অঙ্গিকারাবদ্ধ। এক্ষেত্রে কল্প ২০২১ (Vision 2021) দ্রষ্টব্য। আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক টেকসই একটি সমাজ গঠনে দৃপ্ত পদক্ষেপে দেশ এগিয়ে চলবে, এটাই প্রত্যাশা। তবে এই পথ প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এই অস্থিতিশীলতা দূর করার বিষয়ে যথাযথ দৃষ্টি দেয়া জরুরি।
টেকসই ধারার উন্নয়ন সাধনে সরকারের পাশাপাশি দেশের সকল নাগরিককে যার যার অবস্থান থেকে অবদান রাখতে হবে। সরকারের মূল কাজ হচ্ছে এই পথে এগিয়ে চলার সামষ্টিক এবং জনকেন্দ্রিক আবহ ও পারাির্শ্বিকতা তৈরি করা, জোরদার করা; প্রয়োজনে ক্ষেত্রবিশেষে সরাসরি পদক্ষেপ নেয়া। আর সকল নাগরিক ও নাগরিক গোষ্ঠিকে তাদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে নিজেদের জন্য, দেশের জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠা সহিংসতা (যেমন বর্তমানে ঘটছে) এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতামুক্ত একটি সুস্থ, ন্যায়ানুগ পরিবেশ তৈরী করা গেলে সরকারি-বেসরকারি সকলের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে গতিময় হবে।

লেখক : অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

********** টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র অনুমোদন **********

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি,পরিবেশগত সুরক্ষা ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রণীত জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (এনএসডিএস) প্রকাশ করা হয়েছে। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে দলিলটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ নিরাপত্তা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ১০ বছর মেয়াদি জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (এনএসডিএস) নামে একটি উন্নয়ন দলিল অনুমোদন দিয়েছে সরকার। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে সব ধরনের কৌশলের পাশাপাশি চ্যালেঞ্জের কথাও রয়েছে এ দলিলে। দলিলটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা দেখভাল করতে পরিকল্পনামন্ত্রী এ কে খন্দকারকে চেয়ারপার্সন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া এ কমিটিকে সাহায্য করতে একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবকে এ বোর্ডের চেয়ারপার্সন করা হয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, অপ্রতুল পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং শিল্প দূষণের প্রভাব কমানোকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এনএসডিএস দলিলে।

দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে পরিবেশের স্থিতিশীলতা, ভূমি ব্যবহারে পরিকল্পনা প্রণয়ন, অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রশিক্ষণ উন্নয়ন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। এনএসডিএস দলিলে বাপেক্সেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেওয়ার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। উপকূলবর্তী প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য আন্তর্জাতিক কম্পানিকে আকৃষ্ট করতে বলা হয়েছে।

পাঁচটি কৌশলগত খাত হচ্ছে- টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, পরিবহন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং নগর পরিবেশ। তিনটি অগ্রাধিকার খাত হচ্ছে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু, সুশাসন এবং লিঙ্গ সমতা।

পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, এনএসডিএস-এ প্রস্তাবিত কৌশলসমূহ দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী অবদান রাখবে। তিনি বলেন, এ কৌশলপত্রের রূপকল্প হল একটি সুখী সমৃদ্ধ ও আলোকিত বাংলাদেশ অর্জন যা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও দুর্নীতিমুক্ত এবং যেখানে একটি উন্নত পরিবেশ বজায় থাকবে।

********** টেকসই উন্নয়ন ও বাংলাদেশ **********

বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর ঘটাতে টেকসই উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ লক্ষ্যে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্রের খসড়া অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি এটি উপস্থাপন করা হবে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) বৈঠকে। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে সভাপতিত্বে করবেন প্রধানমন্ত্রী ও এনইসি চেয়ারপার্সন শেখ হাসিনা।
এ বিষয়ে কৌশলপত্র প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. শামসুল আলম বৃহস্পতিবার জনকণ্ঠকে বলেন, এই দলিলে সেই কৌশলসমূহ সুপারিশ করা হয়েছে, যা কিনা দেশের প্রবৃদ্ধিশীল উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখবে এবং প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো ২০২১ সালের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য। এছাড়া কৌশলপত্রটি সরকারের রূপকল্প ২০২১, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫), বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) এবং সরকারের অন্যান্য বিদ্যমান পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশলসমূহের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে।
খসড়ায় বলা হয়েছে, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের অর্থনীতির মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মধ্যে অন্যতম হলো টেকসই উন্নয়ন। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় উৎস থেকে যথাক্রমে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ অবক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল করার চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্থিতিশীল পরিবেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য এ কৌশলপত্রে প্রয়োজনীয় কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, দুর্যোগের কারণে ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী ধরনের ঝুঁকি আসতে পারে সেটা মূল্যায়নের জন্য নগর কমিউনিটি ঝুঁকি মূল্যায়ন জরিপ পরিচালনা করা হবে। সব নগরের জন্য ঝুঁকি হ্রাসকরণ এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হবে। এই এ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও মধ্যম পর্যায়ের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য যে অবকাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তার নকশা প্রণয়নের কাজ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
নীতিমালায় রয়েছে, বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, ন্যূনতম আশ্রয়, উৎপাদনশীল নিয়োগ, গুণগত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উপযোগ সেবা, পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুষ্ঠু পরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান করা বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ। জনসংখ্যা, উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার্থে জনসংখ্যা পরিকল্পনার প্রয়োজনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়নের অন্যান্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, দারিদ্র্য ও অসমতা, অপরিকল্পিত নগরায়ন, জ্বালানি নিরাপত্তা, অদক্ষ পানি ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন।

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে স্বল্প বিনিয়োগ ও সঞ্চয় হার, অদক্ষ মানব সম্পদ, প্রান্তিক মানের মোট উপকরণের উৎপাদনশীলতা এবং ভূমির দুষ্প্রাপ্যতা বা প্রতিবন্ধকতা, অবকাঠামো কর্মসূচীতে ক্রমবর্ধমান সরকারী বিনিয়োগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন, পিপিপি, বিনিয়োগ ও বিনিয়োগ প্রণোদনা বৃদ্ধির মাধ্যমে আইটি খাত উৎসাহিতকরণ, বেসরকারী বিনিয়োগ, গবেষণা ও উন্নয়ন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, রফতানি প্রবৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যকরণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সবুজায়ন প্রবৃদ্ধিতে উন্নীতকরণ। এগুলো সমস্যা সমাধানে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। কৃষি, শিল্প, জ্বালানি ও পরিবহন হলো অগ্রাধিকার খাত যা দেশের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করে। এসব খাতের আওতায় সুপারিশকৃত কৌশলসমূহ হলো অর্থনীতিতে দিকনির্দেশনা প্রদান করা, যা হবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি এবং দেশের উন্নয়নে সহায়ক।

এছাড়া টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্রে পরিবহন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনসংখ্যা পরিকল্পনা, মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা ও পয়নিষ্কাশন, উন্নত পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা, দূষণ ব্যবস্থাপনা, নগর পরিবহন, সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ, বনজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য, ভূমি ও মৃত্তিকা, সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, উপকূল ও সামুদ্রিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন কৌশল তুলে ধরা হয়েছে।
হামিদ-উজ-জামান মামুন

প্রাসঙ্গিক চিত্রসমূহ দেখুন :

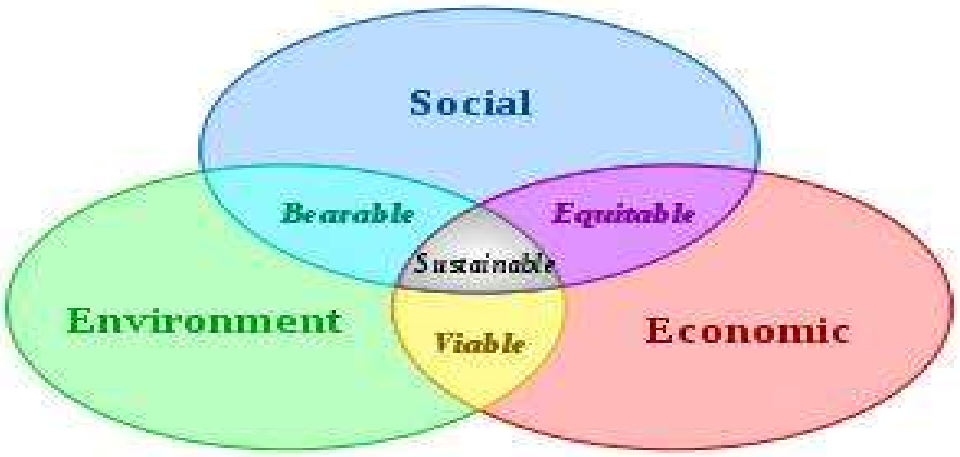

LDC

লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি + আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি
সম্ভাব্য প্রশ্ন:
১. স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) কী? স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?
২. স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) এর সামগ্রিক অবস্থা মূল্যায়ন করুন।
৩. স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উঠে আসার জন্য জাতিসংঘের নির্ণায়কগুলো কী কী?
৪. এলডিসি গ্রুপ (LDC Group) কি? এর সদস্য সংখ্যা কত?
৫. বাংলাদেশ সম্প্রতি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (WTO) স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসির সমন্বয়ক নির্বাচিত হয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ কীভাবে লাভবান হতে পারে? এলডিসির স্বার্থে বাংলাদেশ আর কী ভূমিকা পালন করতে পারে?
৬. এশিয়ার এলডিসি ও আফ্রিকার এলডিসির স্বার্থের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে? এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কীভাবে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে?
৭. বাংলাদেশের এখনও এলডিসিতে থাকার কারণ কী? বাংলাদেশের এলডিসি থেকে বের হতে কত সময় লাগবে?
৮. বাংলাদেশের এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাবার পক্ষে-বিপক্ষে কী যুক্তি রয়েছে?
৯. এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসার স্বপ্ন এবং আপনি কি মনে করেন মধ্যম আয়ের দেশ হলেই বাংলাদেশ এলডিসি থেকে

বেরিয়ে আসবে ?
১০. এলডিসিতে বাংলাদেশের অবস্থান, চ্যালেঞ্জ, করণীয় ও সুপারিশ সম্পর্কে আপনার মতামত পেশ করুন।

****
সম্পর্কিত বিষয় (Related Topics): সিলেবাসে একাধিকবার উল্লেখকৃত ।
বাংলাদেশ বিষয়াবলি:
Economy, Foreign Policy and External Relations of Bangladesh (Participation in International Organizations), International Economic Institutions, International Trade.

আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি:
Participation in International Organizations, International Economic Institutions, International Economic Relations, International trade, WTO. Bangladesh in International Affairs (Major achievements, challenges, future directions)
Section C: Problem-solving (International Trade issue)
****

কেন প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু মনে হচ্ছে ??
১. এলডিসি থেকে উত্তরণে কাজ করার জন্য গত ২২ ডিসেম্বর 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ' কমিটি গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এ ছাড়া সরকারের আরো ২৬টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সিনিয়র সচিব ও সচিবদের ওই কমিটির সদস্য রাখা হয়েছে। কমিটির কার্যপরিধি অনুযায়ী, এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ও অর্জন এবং লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অবস্থান চিহ্নিত করবে এ কমিটি। এ ছাড়া এলডিসি হতে বাংলাদেশের উত্তরণ-পরিকল্পনা ও উত্তরণ-কৌশল প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করবে এ কমিটি।

২. বাংলাদেশ সম্প্রতি পঞ্চমবারের মতো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসির সমন্বয়ক নির্বাচিত হয়েছে।
Published in Prothom Alo on Saturday, 28 February 2015.

****

******** স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি): ********

১৯৭১ সাল থেকে জাতিসংঘ বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে আলাদা তালিকায় রেখেছে। উন্নয়ন-প্রক্রিয়া কার্যত স্থবির, দারিদ্র্যহার কমানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, ঝুঁকির তীব্রতা বিবেচনায় এ তালিকা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিদেশি ঋণ ও অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা ও উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে এ ধরনের দেশকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নীতি ও সিদ্ধান্ত রয়েছে জাতিসংঘ, ডাব্লিউটিওসহ নানা আন্তর্জাতিক সংস্থায়। এসব দেশ নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান আঙ্কটাডের নেতৃত্বে ১৯৮১, ১৯৯০, ২০০১ ও ২০১১ সালে চারটি সম্মেলন হয়েছে। সর্বশেষ ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এলডিসির অভিধা থেকে বের হওয়ার জন্য কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময় পায় দেশগুলো।

বর্তমানে এলডিসিভুক্ত দেশ আছে ৪৮টি। ১৯৭১ সাল থেকে এ পর্যন্ত মাত্র চারটি দেশ এলডিসি থেকে বের হতে পেরেছে। দেশগুলো হলো বতসোয়ানা, কেপ ভারদে, মালদ্বীপ ও সামোয়া।

.....
According to the United Nations,
A least developed country (LDC) is a country that, exhibits the lowest indicators of socioeconomic development, with the lowest Human Development Index ratings of all countries in the world.
.....

"A country that is considered lacking in terms of its economy, infrastructure and industrial base. The population of a lesser-developed country often has a relatively low standard of living, due to low incomes

and abundant poverty. A lesser-developed country is usually poor, as measured by per capita gross domestic product, and un-modernized. LDCs rely primarily on agriculture as a source of income and industrial practices usually contribute to less than 10% of the nation's GDP."
(Ref: INVESTOPEDIA)
.....

The concept of LDCs originated in the late 1960s and the first group of LDCs was listed by the UN in its resolution 2768 (XXVI) of 18 November 1971. A country is classified as a Least Developed Country if it meets three criteria:

Poverty adjustable criterion: three-year average GNI per capita of less than US $992, which must exceed $1,190 to leave the list as of 2012.

Human resource weakness: based on indicators of nutrition, health, education and adult literacy.

Economic vulnerability: based on instability of agricultural production, instability of exports of goods and services, economic importance of non-traditional activities, merchandise export concentration, handicap of economic smallness, and the percentage of population displaced by natural disasters.
.....

****** স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) কীভাবে নির্ধারণ করা হয়? ******

তিনটি সূচকের ওপর ভিত্তি করেই স্বল্পোন্নত দেশ নির্ধারণ করা হয়:

১. মাথাপিছু আয়
২. মানবসম্পদ উন্নয়ন
৩. অর্থনীতির ভঙ্গুরতা

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে এই দেশগুলোর মাথাপিছু আয় এক হাজার ১৯০ ডলার, মানবসম্পদ সূচক ৬৬ এবং অর্থনীতির ভঙ্গুরতা সূচক ৩২ হতে হবে।

****** স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) এর সামগ্রিক অবস্থা মূল্যায়ন *****
বিশ্বব্যাংকের এক হিসাব অনুযায়ী, ৪৮টি এলডিসির মধ্যে বিশ্বের ৮৫ কোটি মানুষের বসবাস। এর মধ্যে অর্ধেকেরই অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নিচে। বৈশ্বিক মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২ শতাংশ, পণ্য বাণিজ্যের ১ শতাংশ এবং সেবা বাণিজ্যের মাত্র দশমিক ৫ শতাংশের ভাগীদার এলডিসিভুক্ত দেশগুলো। ডব্লিউটিওর অধীনে বাণিজ্য স্বার্থসম্পর্কিত বাংলাদেশসহ যে ৩৪টি এলডিসি রয়েছে, এদের অবস্থা আরও খারাপ।

****** LDC থেকে উন্নয়নশীল দেশে উঠে আসার জন্য নির্ণায়কগুলো কী ******

এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উঠে আসার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ৩ টি শর্ত রয়েছে:

১ম শর্ত:
তিন বছরের গড় মোট দেশজ আয়ের (জিএনআই) ভিত্তিতে মাথাপিছু আয় কমপক্ষে ১১৯০ ডলার হতে হবে। তবে সর্বনিম্ন মাথাপিছু আয়ের এ অঙ্ক প্রতিবছরই বাড়ে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব অনুযায়ী, বর্তমান মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ১০৪৪ ডলার।

২য় শর্ত:
হলো–মানবসম্পদের উন্নয়ন। এ ক্ষেত্রে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নকে মূল্যায়ন করে জাতিসংঘ।

৩য় শর্ত:
ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা দূর করা। এটি কৃষি উৎপাদন, পণ্য ও সেবা রপ্তানি, প্রচলিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও জিডিপিতে সম্পূর্ণ পণ্য উৎপাদন ও আধুনিক সেবার অংশীদারিত্ব এবং ছোট অর্থনীতির প্রতিবন্ধকতা দূর করার ওপর নির্ভর করবে।

অর্থাৎ এলডিসি দেশগুলো মূলত তিন ভাবে এখান থেকে বের হয় :
প্রথমত, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করে, যেমন করেছে মালদ্বীপসহ দ্বীপরাষ্ট্রগুলো।

দ্বিতীয়ত, অর্থনীতিকে বহুমুখীকরণ করা (যেমন বিভিন্ন ধরনের শিল্প খাতকে সহায়তা দেওয়া, যেন তারাও ভূমিকা রাখতে পারে)।

তৃতীয়ত, অর্থনীতিকে বিশেষায়িত করা (যেমন কোনো ক্ষেত্রে একটি বিশেষ খাতকে ধরে এগিয়ে যাওয়া)।

****** এলডিসি গ্রুপ (LDC Group) কি? এর সদস্য সংখ্যা কত? ******

বর্তমানে ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে ৩৪টি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) এর সদস্য। আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিওতে) এই ৩৪টি দেশের দল বা গ্রুপটিকেই "এলডিসি গ্রুপ" বলে।

বাংলাদেশের বিশ্ব বাণিজ্যে নিজেদের হিস্যা আদায়ের কৌশল নির্ধারণে ১৯৯৫ সালে ডব্লিউটিওর যাত্রা শুরুর পরপরই গঠিত হয় এ দল। ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে ডব্লিউটিওর সদস্য ৩৪টি দেশই হলো এলডিসি গ্রুপের সদস্য। উল্লেখ্য যে, আরও ৮টি দেশ ডব্লিউটিওর সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।

****** বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসির সমন্বয়ক বাংলাদেশ ******

বাংলাদেশ পঞ্চমবারের মতো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসির সমন্বয়ক মনোনীত হয়েছে। সম্প্রতি এলডিসি গ্রুপের এক সভায় বাংলাদেশকে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে পরবর্তী ছয় মাস বাংলাদেশ এ দায়িত্ব পালন করবে। তবে মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়তে পারে। এর আগে বাংলাদেশ ১৯৯৬, ২০০৩, ২০০৬ এবং ২০১০ সালেও এলডিসির সমন্বয়ক ছিল। সমন্বয়ক ছাড়াও এলডিসিগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সব সময়ই নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালন করে আসছে।
ডব্লিউটিওতে এলডিসির সমন্বয়ক নির্বাচিত হয় যদিও দেশের নামের আদ্যক্ষরের ক্রম অনুযায়ী (অ্যালফাবেটিক্যালি), তবে সব এলডিসিরই ৩৪টি দেশের সমন্বয়ক হওয়ার সক্ষমতা নেই। ডব্লিউটিওতে ১২টি স্বল্পোন্নত দেশের কোনো অফিসই নেই। জেনেভাতে বাংলাদেশের যেমন একটি স্থায়ী মিশন রয়েছে, দেশেও রয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি ডব্লিউটিও সেল। মোটকথা, এলডিসির মধ্যে বাংলাদেশের একটা শক্ত অবস্থান রয়েছে। তা ছাড়া শুরু থেকেই বাংলাদেশ ডব্লিউটিওকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ১৯৯৫ সালে ১২২টি সদস্য নিয়ে সংস্থাটি যখন গঠিত হয়, তখন থেকেই বাংলাদেশ সদস্য। বহুপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যবস্থার মধ্যে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সীমিত সাধ্যের মধ্যেও চেষ্টা করছে বাংলাদেশ।

****** বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) এলডিসির সমন্বয়ক হিসেবে বাংলাদেশ কীভাবে লাভবান হতে পারে? ******

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) এলডিসি গ্রুপের সমন্বয়ক হওয়ার বড় লাভ হচ্ছে উন্নত দেশগুলোর কাছে এলডিসির দাবি ও অধিকার আদায়ে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত ৪৮ দেশের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করার সুযোগ তৈরি হলো বাংলাদেশর ।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন,
'উন্নত দেশগুলোতে এলডিসির শুল্ক ও কোটামুক্ত পণ্য রপ্তানির দাবিতে বাংলাদেশ সব সময়ই উচ্চকণ্ঠ। আবারও সময়ন্বক হওয়ায় এ দায়িত্ব আরও বাড়ল।'
এলডিসির উন্নয়নে ডব্লিউটিওতে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক (গ্রিনরুম মিটিং) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেগুলোতে শুধু সমন্বয়ক দেশের প্রতিনিধিই উপস্থিত থাকতে পারে। বাংলাদেশের স্বার্থের বাইরে চলে যেতে পারে—এ রকম কোনো বিষয় কোনো বৈঠকে উপস্থাপিত হলে, বাংলাদেশ তখন তা নিয়ে কথা বলতে পারবে। শুধু শুল্ক ও কোটামুক্ত পণ্য রপ্তানি নয়, সেবা খাতে বাজার পেতেও নিজেদের অধিকার, সুযোগ ও স্বার্থের বিষয়ে জোরালো ভূমিকা রাখবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান ও সক্ষমতার কারণে এলডিসির অনেক সদস্যই আমাদের ঈর্ষার চোখে দেখে।

****** এলডিসির স্বার্থে বাংলাদেশ আর কী ভূমিকা পালন করতে পারে? ******

উন্নত দেশগুলো তাদের জাতীয় আয়ের শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ সহায়তা (এইড) হিসেবে দরিদ্র দেশগুলোকে দেওয়ার কথা। জাতিসংঘের কাছে তাদের স্বীকারোক্তি ছিল। অনেক দিন থেকেই আমরা বলছি, এ থেকে শূন্য দশমিক ২ শতাংশ যাতে এলডিসিগুলো পায়। নরওয়েসহ কোনো কোনো দেশ অবশ্য তা মানছে। এই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ তার কণ্ঠস্বর আরও জোরালো করতে পারে।

****** এশিয়ার এলডিসি ও আফ্রিকার এলডিসির স্বার্থের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে? ******

সমন্বিত অধিকার আদায়ের ব্যাপারে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে দর-কষাকষি চললেও এশিয়ার এলডিসি ও আফ্রিকার এলডিসিগুলোর মধ্যে সব সময়ই একটা প্রতিযোগিতা বা মতবিরোধ থাকে। মহাদেশভেদে স্বার্থের বিষয়গুলো ভিন্ন বলেই এ প্রতিযোগিতা। এশিয়ার এলডিসির প্রধান স্বার্থের জায়গা হলো যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারসহ তৈরি পোশাকের রপ্তানি বৃদ্ধি। আর আফ্রিকার এলডিসির প্রধান স্বার্থ হলো কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানিতে নিরঙ্কুশ ও শর্তমুক্ত প্রবেশাধিকার।

****** এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কীভাবে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে? ******

বাংলাদেশের ওপর সব এলডিসির একধরনের আস্থা রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে—আমাদের রপ্তানি আয়, প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বাণিজ্যের অংশ। বাংলাদেশকে এসব দিক থেকে অন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলো যথেষ্টই সমীহ করে। উন্নত দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশের প্রধান চাওয়া হচ্ছে পণ্য বাণিজ্যে বিশেষ করে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার। আর আফ্রিকার এলডিসির অন্যতম চাওয়া হচ্ছে কৃষি। বাংলাদেশের প্রতি সবার এ রকম একটি আস্থা রয়েছে যে বাংলাদেশ দুইয়ের মধ্যে একটি সুষম ভাব নিয়ে আসতে সক্ষম। আর আফ্রিকার এলডিসিদের আমরা বলতে পারি যে আমাদের শিল্পে তোমরা সমর্থন দাও, তোমাদের কৃষিতেও আমরা তা দেব।

এলডিসির জন্য একটা বড় সম্ভাবনা হচ্ছে সেবা খাতের বাণিজ্যে ছাড় (সার্ভিস ওয়েভার)। অর্থাৎ এলডিসি থেকে উন্নত দেশগুলোতে বেশি হারে ও শিথিল শর্তে সেবা খাতের বাজার উন্মুক্ত হওয়া। আগামী জুলাইয়ের মধ্যে উন্নত দেশগুলো এ বিষয়ে তাদের প্রতিবন্ধকতার কথা ডব্লিউটিওকে জানাবে। একটা হিসাবে এসেছে, উন্নত দেশগুলো তাদের ৩ শতাংশ শ্রমবাজার উন্মুক্ত করলে এলডিসির জন্য ১৫ হাজার কোটি ডলারের বাজারের সুযোগ তৈরি হয়।

সেবা খাতের বাণিজ্যে ছাড় উন্নত দেশগুলো ১, ২ বা ৫ বছর পরেও যদি দেয়, সেই সুযোগটি কাজে লাগানোর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। বাজার উন্মুক্ত হলেই যাতে সুযোগটি নেওয়া যায়। এ ব্যাপারে গবেষণারও দরকার রয়েছে। কয়েকটি খাতকে অবশ্য এর মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে আমাদের সবার আগে নজর দিতে হবে নার্সিং ও দক্ষ জনশক্তি—এ দুই খাতে। এর মধ্যে সনদটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেল, একজন নার্সিং পাস করলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সনদ উন্নত দেশগুলো গ্রহণ করল না। সে জন্য এখন থেকেই সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে এগোতে হবে, যাতে শিক্ষার মানটা ভালো হয়, উন্নত দেশের কাছাকাছি হয়।

****** বাংলাদেশের এখনও এলডিসিতে থাকার কারণ কী? ******

বাংলাদেশের এখনও এলডিসিতে থাকার বড় একটি কারণ হলো বিপুল জনসংখ্যা। ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে মাথাপিছু আয় এখন ১০৪৪ ডলার। আয়তন বিবেচনায় জনসংখ্যা পাঁচ কোটি হলে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণও দুই হাজার ডলার ছাড়িয়ে যেত। একই সঙ্গে মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও অনেক অগ্রগতি হতো। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য কাজ করছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এলডিসি অভিধা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

****** বাংলাদেশের এলডিসি থেকে বের হতে কত সময় লাগবে? ******

এলডিসি থেকে বের হয়ে আসতে হলে তিনটি সূচকেই উন্নয়ন করতে হয়। এর মধ্যে টানা তিন বছরের মাথাপিছু গড় আয়ের পরিমাণ হতে হবে ৯৯২ মার্কিন ডলার। উচ্চ পর্যায়ে তা হতে হবে ১ হাজার ২৪২ ডলার। এভাবে পরপর দুই মেয়াদে অর্থাৎ ৬ বছর পর্যন্ত এই সক্ষমতা অর্জন করতে হয়। এরপর এক মেয়াদ অর্থাৎ ৩ বছর গ্রেস পিরিয়ড ধরা হয়। সবমিলিয়ে সক্ষমতা অর্জনের ৯ বছর পর কোনো দেশকে এলডিসি থেকে বাদ দেয়া হয়। কিন্তু ২০১৪ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১১৯০ ডলার। মানবসম্পদ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৪ দশমিক ৭ এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে ৩২ দশমিক ৪। খুব দ্রুতগতিতে আগালেও ২০২৫ সালের আগে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না। খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া ২৬ বছরে এলডিসি থেকে বের হয়ে এসেছে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) :
বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) সংস্থাটির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে আগামী এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশের বের হওয়া সম্ভব নয়। আগামীকালও যদি বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হওয়ার শর্ত পূরণ করে, তাহলেও ছয় বছরের আগে এখান থেকে বের হতে পারবে না। কারণ তিন বছর করে ছয় বছর বাংলাদেশকে পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে। এলডিসি দেশগুলোর অবস্থা তিন বছর পর পর মূল্যায়ন করা হয়। পরবর্তী মূল্যায়ন হবে ২০১৫ সালে। ওই বছরের তালিকায় বাংলাদেশ বিবেচনায় নেই। এর পরের তালিকায় (২০১৮ সাল) যদি থাকে, তাহলেও অন্তত এক দশকের আগে এলডিসি থেকে বের হতে পারছে না বাংলাদেশ।“

আংকটাডের প্রতিবেদন অনুযায়ী,
২০১৪ সালের হিসাবে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১১৯০ডলার, মানবসম্পদ সূচক ৫৪ দশমিক ৭ এবং অর্থনীতির ভঙ্গুরতা সূচক ৩২ দশমিক ৪। প্রসঙ্গত, অন্য দুই সূচক বাড়লে তা ভালো। অন্যদিকে অর্থনীতির ভঙ্গুরতা সূচক কমলে তা ওই দেশের জন্য ভালো। আবার ২০১৫ সালে যে মূল্যায়ন হবে, তাতে এলডিসি থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গোলা ও কিরিবাতিকে সম্ভাব্য দেশ মনে করা হচ্ছে।

আংকটাডের এলডিসি প্রতিবেদনটি বলছে,
বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১৭ দশমিক ২ শতাংশ আসে কৃষি খাত থেকে। উৎপাদনশীল খাত থেকে ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ এবং সেবা খাত থেকে আসে ৩২ শতাংশ। অথচ দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৫৪ দশমিক ৪ শতাংশই হয়েছে কৃষি খাতে। আর শিল্পে কর্মসংস্থান হয়েছে ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ। কৃষি খাতে নিয়োজিতদের আয় যেমন কম, তেমনি উৎপাদনশীলতাও কম। এ খাত থেকে যত বেশি লোককে উৎপাদনশীল খাতে নেওয়া যাবে, তাদের উৎপাদন ও আয় তত বাড়বে।

****** বাংলাদেশের এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাবার বিপক্ষে যুক্তি ******

এলডিসি থেকে বেরিয়ে গেলে বাংলাদেশ যেসব সুবিধা হারাবে তা হলো :

১. জিএসপি সুবিধা হারানোর আশঙ্কা :
বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডাব্লিউটিও) নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা–জিএসপি পেয়ে থাকে। এলডিসি পরিচয় ঘুচে গেলে জিএসপি সুবিধাসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনেক সুযোগই হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বাংলাদেশের সামনে।

২. শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার-সুবিধা হারানোর আশঙ্কা :
ডব্লিউটিওর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে শতভাগ শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার-সুবিধা দিচ্ছে উন্নত দেশগুলো। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশসহ কয়েকটি এলডিসিকে শতভাগ শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়নি। এলডিসি থেকে বেরিয়ে গেলে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার-সুবিধা হারাবে।

৩. বাংলাদেশের রপ্তানি কমবে :
ডব্লিউটিওর আওতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ কোনো রকম শুল্ক ছাড়াই নিজেদের পণ্য রপ্তানি করতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, জাপানসহ বিভিন্ন উন্নত দেশে বাংলাদেশও এ ধরনের সুবিধা ভোগ করছে। উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর হলে এসব সুবিধা হারাবে বাংলাদেশ। এতে ওই সব দেশের আমদানিকারকদের বাড়তি শুল্ক দিয়ে বাংলাদেশের পণ্য কিনতে হবে। ফলে দেশগুলোর বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের দাম বাড়বে। এতে ওই সব দেশে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা কমবে। ফলে বাংলাদেশের রপ্তানিও কমবে।

৪. ঋণের সুদের হার বাড়বে :
এলডিসির সদস্যগুলো উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে কম সুদে ঋণও পায়। এলডিসি থেকে বেরিয়ে গেলে বাণিজ্যিক সুদের হারে ঋণ নিতে হবে। কিন্তু এখনই অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক হারে ঋণ নেওয়া হচ্ছে। আর কম সুদের ঋণ এলডিসি হিসেবে দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে। এখন আমরা যদি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হই, তাহলেও কিন্তু সুদের হার বেড়ে যাবে।

তাই অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত না করে উন্নয়নশীল দেশের পরিচিতি অর্জন করলে বাংলাদেশের লোকসান অনেক। তবে উন্নয়নের মাধ্যমে অগ্রগতি সাধন করার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর হলে তখন এসব সুবিধা না থাকলেও কোনো সমস্যা হবে না। তবে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা এখনো সে অবস্থায় যায়নি।

****** বাংলাদেশের এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাবার পক্ষে যুক্তি ******

এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা পায়। তবে বিশ্বব্যাপী এখন শুল্ক কমছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মাধ্যমে যেমন শুল্ক কমানো হয়, তেমনি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যকার শুল্কহার কমে যাচ্ছে। তাই অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা এমনিতেই দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। সামনের দিনগুলোতে আরও কমে যাবে। কিন্তু বাজারসুবিধা হারানোর ভয়ে এলডিসি হয়েই থাকা সুবিবেচিত নয়।

এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে হয়তো বাংলাদেশের কিছু সুযোগ-সুবিধা থাকবে না। তবে সুযোগ-সুবিধার আশায় চিরদিন তো আর গরিব হয়ে থাকা যায় না। এলডিসি অভিধা থেকে উত্তরণ ঘটলেই যে জিএসপি সুবিধা থাকবে না, এমনটি নয়। কারণ, অনেক উন্নয়নশীল দেশও রপ্তানির ক্ষেত্রে এ সুবিধা ভোগ করছে।

এলডিসি হওয়ার কারণে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সুনামহানি হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর হলে সুনামের পাশাপাশি বিনিয়োগ, বাণিজ্যে নতুন কিছু সুবিধাও পাওয়া যাবে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে বিদেশিদের আস্থা বাড়বে। তাই যত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসবে, ততই মঙ্গল। কারণ, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন আগে থেকেই আমাদের সামনে রয়েছে।

****** মধ্যম আয়ের দেশ হলেই কী এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসবে বাংলাদেশ ******

দুনিয়ার কাছে গরিব বা স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) পরিচয়ে আর থাকতে চায় না বাংলাদেশ। গরিব দেশগুলো নিয়ে করা জাতিসংঘের এলডিসি তালিকা থেকে বের হয়ে 'উন্নয়নশীল দেশ'-এর খেতাব পেতে তৎপর ঢাকা। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠে এসেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসব দেশের অনেক পেছনে বাংলাদেশ। তা সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। তবে আর্থ-সামাজিক খাতে উন্নতি করে শর্ত পূরণের মধ্য দিয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পৌঁছতে পারলে তা বড় সফলতা হবে।

মধ্যম আয়ের দেশ হলে এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসবে বাংলাদেশ এই ধারণাটি সঠিক নয়। মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে যাওয়ার মধ্য দিয়ে শুধু একটি দেশের আয় বাড়ে, কিন্তু অন্যান্য সূচকে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। এ অবস্থায় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া যদি আয় বাড়ানোর দিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহলে হয়তো মানুষের আয় বাড়বে, কিন্তু অর্থনীতির বড় সমস্যাগুলো কাটবে না।

সাম্প্রতিক সময়ে মাথাপিছু আয় কিছু বাড়লেও জিডিপি বাড়েনি। কারণ হল রেমিটেন্সের কারণে জাতীয় আয় বেড়েছে। এছাড়া মাথাপিছু আয় হিসাব করা হয় ডলারে। কিন্তু গত কয়েক বছরে ডলারের মূল্য স্থিতিশীল। আর ডলারের মূল্য বাড়লে মাথাপিছু আয় কমবে।

বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে এলডিসি থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব নয়। কারণ বিশাল জনসংখ্যা। ফলে গড় আয় বাড়লেও সবার আয় বাড়ে না। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা এবং মানবসম্পদ সূচকে আগাতে হবে।

****** এলডিসিতে বাংলাদেশের অবস্থান ও চ্যালেঞ্জ ******

জাতিসংঘের মাপকাঠি অনুযায়ী, বিশ্বের অন্য ৪৮টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশও রয়েছে এলডিসির তালিকায়। আপাতত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থা কিছুটা ভালো। শীর্ষ কয়েকটি দেশের মধ্যে রয়েছে দেশটি। এমডিজি অর্জনে এগিয়ে বাংলাদেশ। এছাড়া রফতানি এবং রেমিটেন্সে আয়ের অগ্রগতি হয়েছে। তবে দুষ্টচক্রে এখনও রয়েছে বাংলাদেশ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা দৃশ্যমান। বিশেষ করে কর্মসংস্থান এবং আয় সৃষ্টিতে পিছিয়েছে বাংলাদেশ।

প্রথমত, বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কর্মসংস্থান। যতটুকু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, তা অপ্রাতিষ্ঠানিক। উন্নত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। প্রতি বছর ২৫ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে আসছে। ২০১২ সালে মোট জনসংখ্যার ৫৪ দশমিক ৪ শতাংশ কৃষি খাতে, ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ শিল্পে এবং ৩২ শতাংশ ছিল সেবা খাতে। কিন্তু জিডিপিতে অবদানের দিক থেকে একেবারে উল্টো। মোট জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান ৫১ শতাংশ, শিল্পের ৩১ এবং কৃষি খাতে ১৭ শতাংশের কিছুটা বেশি। এর অর্থ হল প্রবৃদ্ধি বাড়লেও ওই অনুপাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, দেশের রফতানি আয় বাড়লেও তা গার্মেন্ট খাতের ওপর নির্ভরশীল। ফলে বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে কোনো ধরনের ভঙ্গুরতা নেমে এলে এ খাতে বিপর্যয় হতে পারে।

তৃতীয়ত, আমাদের মজুরি এবং উৎপাদনশীলতা কম। ফলে সামষ্টিকভাবে আয় বাড়লেও তার বণ্টন সঠিকভাবে হয় না। এছাড়াও পুঁজির জোগানে বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে ঋণখেলাপি এবং বিভিন্ন স্ক্যামের কারণে পুঁজি সহজলভ্য নেই। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে বিশ্বের কিছু দেশের আয় বেড়েছে। কিন্তু তাদেরও আর্থিক কাঠামোতে পরিবর্তন আসেনি।

****** আমাদের করণীয় কী? ******

শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, আমদানি-রপ্তানি, রাজস্ব সংগ্রহ—সবদিক থেকেই বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব বাণিজ্যে নিজেদের অংশগ্রহণ ও হিস্যা বাড়াতে বাণিজ্যবিষয়ক জ্ঞান আহরণে এখন পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই। অথচ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রমে (কারিকুলাম) বাণিজ্য, বাণিজ্য আইন ততটা গুরুত্বের সঙ্গে পড়ানো হয় না। বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) নামে একটি সংস্থা রয়েছে, সেটিও অবহেলিত। বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে বাণিজ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার দরকার।

জনসংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে এলডিসি থেকে বের হওয়া বাংলাদেশের জন্য বেশ কঠিন। সে ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনীতির ভঙ্গুরতা সূচকে ভালো করা সহজ।

দেশের অর্থনীতিকে ভালো করতে না পারলে মানুষের সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যাবে না। আবার সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা না গেলে অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না। এটা একধরনের দুষ্টচক্র। সে কারণে অর্থনীতির স্বার্থেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

****** সুপারিশ ******

অর্থনৈতিক কাঠামোতে গুণগত পরিবর্তন করা ছাড়া প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর টেকসই উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যের সঙ্গে নীতির সমন্বয় জরুরি। এক্ষেত্রে কার্যকর শিল্প, বাণিজ্য, রাজস্ব এবং মুদ্রানীতি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। যে কোনোভাবে হোক উদ্যোক্তাদের মূলধনের জোগান দিতে হবে। সরকারি ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া অবকাঠামো উন্নয়নসহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি উন্নত দেশগুলোর দেয়া প্রতিশ্র“তি রক্ষা, আর্থিক খাতের সংস্কার, সুশাসন নিশ্চিত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
.....
.....

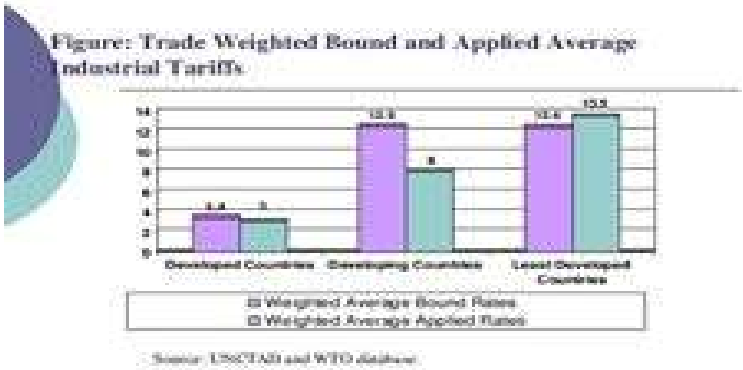

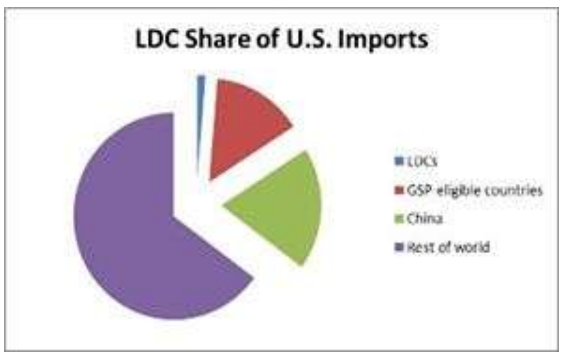

The Liberation War and its Background

(মুক্তিযোদ্বা মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইট হতে গৃহীত সঠিক, নির্ভুল তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস)

লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি
Topic :::: The Liberation War and its Background:
মুক্তিযোদ্বা মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইট হতে গৃহীত সঠিক, নির্ভুল তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস যা লিখিত ও ভাইভা এর জন্য জানা আবশ্যক।

**********সংক্ষিপ্ত ইতিহাস**********

১. পটভূমিঃ
আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পাকিস্তান নামের রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ১২ আগস্ট প্রকাশিত র‍্যাডক্লিপ রোয়েদাদে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সীমানা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। পূর্ব বাংলা হয় পাকিস্তানের অংশ-পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব থেকে জনগণ আশা করেছিলেন, এবার তাঁদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ হবে। তাঁদের প্রত্যাশিত স্বাধীনতা নতুন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হবে। উন্নত জীবনের অধিকারী হবেন। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনুভব করলেন, তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হওয়ার নয়। পাকিস্তানের শাসকবর্গ বহুবাচনিক সমাজে পূর্ব পরিকল্পিত ঐক্যবদ্ধ একক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব

পাকিস্তানের জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র সংকুচিত করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এভাবে পূব পাকিস্তান স্বাধীনতা সংগ্রামরে পটভূমি তৈরি হয়। ১৯৫২ সালে নিজস্ব ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য জীবন দান করতে হয় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র জনতার। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করে। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালীর স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে ছয় দফা দাবি পেশ করেন। ছয় দফা ম্যান্ডেট নিয়ে পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে তার উত্তরণ ঘটে। জনগণ প্রত্যাশা করেছিল নির্বাচিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ইতিহাসের গতি পাল্টাবেন। পাকিস্তানের শাসকবর্গ-কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কিছু সামরিক কর্মকর্তা-ষড়যন্ত্রের গ্রন্থিগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যেন শাসন ক্ষমতা কোনক্রমে বাঙ্গালীর হস্তগত না হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তা সঠিকভাবে অনুধাবন করেন।

২. ভাষা আন্দোলনঃ
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে আসছলি। পাকিস্তান সরকার এ যৌক্তিক দাবির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে ১৯৪৮ সালেই উর্দুকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ চলতে থাকে যা পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। এ আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় ১৯৫২ সালে এবং সেই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ঢাকা বিশববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছাত্ররা একত্রিত হয়। পুলিশ এ জনসমাবেশের উপর গুলি চালানোর ফলে রফিক, সালাম, বরকত, জববারসহ আরো অনেকে শহীদ হয়। এই ঘটনা আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দান করে এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। ১৯৫৬ সালে চূড়ান্তভাবে সংবিধানে বাংলাকে উর্দূর পাশাপাশি অন্যতম প্রধান জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ভাষা আন্দোলনকে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৩. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সাধারণ নির্বাচন ও ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনঃ
১৯৫৪ সালে ১০ই র্মাচ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে র্পূববঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। কিন্তু পাকিস্তান শাষকগোষ্ঠী বাঙালির এই আধিপত্য মেনে নিতে পারেনি। মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে ৩০শে মে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। ১৯৫৯ সালে সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্ধারিত হলে বাঙালিদের মধ্যে বিপুল সাড়া দেখা দেয়। জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ বাঙালি, অতএব এই নির্বাচনের ফলাফল চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। একই সময়ে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের কৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টি করে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। ১৯৬২ সালে সামরিক শাসন তুলে নেয়া হ'লে ছাত্র সমাজ অধিকারের দাবিতে পুনরায় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়।

৪. ১৯৬২ সালের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনঃ
আন্দোলন নতুন করে গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশের গুলিতে ১৭ই সেপ্টেম্বর নিহত হন যার মধ্যে ওয়াজিউল্ল-া, মোস্তফা ও বাবুল অন্যতম। ছাত্র সমাজের ২২ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে ১৭ই সেপ্টেম্বর '৬৩ 'শিক্ষা দিবস' পালন উপলক্ষে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক দলসমূহ ও বুদ্ধিজীবী সমাজ ছাত্রদের এই আন্দোলনের সবরকম সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসে।

৫. ছাত্র সমাজের সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতিঃ
পাকিস্তানের কাঠামোয় বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ঘটা অসম্ভব বিবেচনা করে তৎকালীন ছাত্র সমাজের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ১৯৬২ সালে গোপনে ছাত্রদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ এই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব দেন জনাব সিরাজুল আলম খান, জনাব আবদুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদ। এই সংগঠন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্ল-বী পরিষদ' নামে পরিচিত ছিল।

৬. '৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলনঃ
১৯৬৫ সালে পাকভারত যুদ্ধের সময়কালে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত ছিল। স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের ধারাবাহিকতায় পূর্ববাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ন্যূনতম

উন্নতি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি। বাঙালিদের প্রতি জাতিগত এই বৈষম্যের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে আহুত 'সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলন' শেখ মুজিবর রহমান ৬ দফা দাবী উপস্থাপন করেন। ভাষণে তিনি বলেন, 'গত দুই যুগ ধরে পূর্ব বাংলাকে যেভাবে শোষণ করা হয়েছে তার প্রতিকারকল্পে এবং পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক দূরত্বের কথা বিবেচনা করে আমি ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করছি।' পরবর্তীতে এই ৬ দফা দাবি বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ হিসাবে বিবেচিত হয়।

৭. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাঃ
বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের এক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। সংগঠনের কোন এক সদস্যের অসতর্কতার ফলে পাকিস্তান সরকারের কাছে এই পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার সামরিক বেসামরিক ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ১৯শে জুন '৬৮ পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবর রহমানসহ ৩৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এক রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করে। এই মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত।
১৯শে জুন ১৯৬৮, ঢাকা সেনানিবাসে এই মামলার বিচার শুরু হয়। বিচার কার্য চলার সময় থেকে শ্লোগান ওঠে- 'জেলের তালা ভাঙব- শেখ মুজিবকে আনব।' এই গণ-আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বলা যায়, এই সময় সমস্ত দেশব্যাপী সরকার বিরোধী আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করে।

৮. '৬৯ এর গণ-আন্দোলনঃ
পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক শ্লোগান পরিবর্তিত হয়। 'তোমার আমার ঠিকানা- পদ্মা মেঘনা যমুনা।' পিন্ডি না ঢাকা- ঢাকা ঢাকা। 'জাগো জাগো-বাঙালি জাগো'। এই ধারাবাহিকতায় স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে উন্মুক্ত করে। অহিংস আন্দোলন সহিংসতার দিকে ধাবিত হতে থাকে। এই সময় রাজনৈতিক দলের ৬ দফা দাবি গণদাবিতে পরিণত হয়। বাঙালি একক জাতিসত্তার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আইয়ুব খান দেশে সামরিক শাসন জারি করে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এই গণ-আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে ২০শে জানুয়ারী' ৬৯ ছাত্র আসাদুজ্জামান এবং ২৪শে জানুয়ারী'৬৯ স্কুল ছাত্র মতিউর রহমান মৃত্যুবরণ করে। ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকায় শহীদ আসাদ-মতিউর দুটি উল্লেখযোগ্য নাম। শেরে বাংলা নগর ও মোহাম্মদপুরের সংযোগ স্থলের আইয়ুব গেটের নাম পরিবর্তন করে 'আসাদ গেট' এবং বঙ্গভবনের সামনের উদ্যানের নাম 'মতিউর রহমান শিশু উদ্যান' করা হয়। জানুয়ারী '৬৯ এ গৃহিত ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনকে আরও বেগবান করে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি' ৬৯ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত অবস্থায় বন্দী আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক মৃত্যুবরণ করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি' ৬৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ শামসুজ্জোহা পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এই মৃত্যু সংবাদ গণ-আন্দোলনে আরেকটি নতুন মাত্রা যুক্ত করে। প্রচন্ড-আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারি' ৬৯ এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। ২২শে ফেব্রুয়ারি' ৬৯, শেখ মুজিবর রহমানসহ অভিযুক্ত সকলেই ঢাকা সেনানিবাস থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির একক এবং অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি' ৬৯ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল গণ-সম্বর্ধনায় শেখ মুজিবর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এই মামলায় অভিযুক্ত ও বন্দী অবস্থায় সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ডঃ শামসুজ্জোহাকে জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। উভয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক হিসাবে চিহ্নিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সার্জেন্ট জহুরুল হক হল' ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শামসুজ্জোহা হল' তাদের স্মরণে নামকরণ করা হয়েছে।

'৬৯ এর এই ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ, আবদুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, তোফায়েল আহমেদ, আসম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, সামসুদ্দোহা, মোস্তফা জামাল হায়দর, রাশেদ খান মেনন, বেগম মতিয়া চৌধুরী, দীপা দত্ত, হায়দর আকবর খান রণোসহ অনেকে।
রাজনৈতিক দলীয় প্রধান যাদের নিরলস পরিশ্রম ও নির্দেশনায় বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের এই আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করেছিল তাদের মধ্যে জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, কমরেড মনি সিং, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, শ্রীমনোরঞ্জন ধর অন্যতম।

৯. '৭০ এর সাধারণ নির্বাচনঃ
২৫শে মার্চ ৬৯ সারা দেশে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর হলেও সামরিক সরকার গণ-দাবিকে উপেক্ষা করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। তাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সারা দেশে এক ব্যক্তি এক ভোটের নীতিতে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। ৭ই ডিসেম্বর '৭০ থেকে ১৯শে ডিসেম্বর' ৭০ এর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তফসিল ঘোষণা করা হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে দেশব্যাপী এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ৬ দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে রায় প্রদান করে। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ৩১০ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ম্যান্ডেট লাভ করে।
'বাঙালির শাসন মেনে নেওয়া যায় না' এই নীতিতে পাকিস্তানি সামরিক শাসকগণ নির্বাচিত এই জন প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার জাতীয় নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায়। শুরু হয় অধিকারের সংঘাত। ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ৭০ এ বঙ্গবন্ধু এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে পূর্ব বাংলার ম্যাপ অংকিত একটি পতাকা প্রদান করেন। এই পতাকাই পরবর্তীতে বাংলাদেশের পতাকা হিসাবে গৃহীত হয়। ছাত্রদের এই সংগঠন প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে প্রতিটি জেলা ও মহকুমা শহরে শুরু হয় সামরিক প্রশিক্ষণের মহড়া। জাতীয়তাবাদী এই আন্দোলনে ছাত্র ও যুব সমাজের অংশগ্রহণ জন সমাজকে আরো উৎসাহিত করে তোলে।

১০. '৭১ এর অসহযোগ আন্দোলনঃ
নির্বাচনে জয়লাভের পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনে মত দিতে অস্বীকার করেন। একটি রাজনৈতিক দল জনগণের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের ম্যান্ডেট পেয়েছে। তারা সরকার গঠন করবে, এটাই ছিল বাস্তবতা। কিন্তু সামরিক শাসকগণ সরকার গঠন বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে এক আলোচনা শুরু করে। কিসের জন্য আলোচনা, এটা বুঝতে বাঙালি নেতৃবৃন্দের খুব একটা সময় লাগেনি। জাতীয় সংসদের নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চ ১৯৭১ দেশব্যাপী অসহযোগের আহবান জানান। সর্বস্তরের জনগণ একবাক্যে বঙ্গবন্ধুর এই আহবানে সাড়া দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অচল করে তোলে। ২রা মার্চ ৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা প্রদর্শিত হয়। ৩রা মার্চ '৭১ এ রমনা রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এর পক্ষ থেকে 'স্বাধীনতার ইসতেহার' পাঠ করা হয়। এই ইসতেহারে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পরিচালিত সরকার জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে কোন সমাধান না দেওয়ায়, ৭ই মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক দিকনির্দেশনী ভাষণে সর্বপ্রকার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে আহবান জানান। এই ভাষণে তিনি বলেন, "আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। ..... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের ভাষণগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হিসাবে বিবেচিত।

৭ই মার্চের এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ কোন দলীয় নেতার নির্দেশ ছিল না। ছিল একজন জাতীয় নেতার নির্দেশ। এই নির্দেশ দেশের সর্বস্তরের ছাত্র, জনতা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে বাঙালি সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলকেই সচেতন করে তোলে। ২রা মার্চ ৭১ থেকে পূর্ব বাংলার সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম চলতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে।
২৩শে মার্চ ৭১ সকালে পল্টন ময়দানে জয় বাংলা বাহিনীর এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ মিছিল সহকারে বাংলাদেশের পতাকাসহ বঙ্গবন্ধু ভবনে প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বাড়িতে এই পতাকা উত্তোলন করেন। একই সাথে বঙ্গবন্ধুর গাড়িতে এই পতাকা লাগান হয়। ২৩শে মার্চ পূর্ব বাংলার প্রতিটি শহরে পাকিস্তান দিবসের অনুষ্ঠান বর্জিত হয় এবং পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখা যায়।

অন্যদিকে ক্ষমতার হস্তান্তরের নামে এই আলোচনা চলা অবস্থায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সৃষ্ট সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে নতুন করে সংকটের সৃষ্টি করে। অযৌক্তিক দাবি উপস্থাপনের ফলে সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের পথ এক সময় রুদ্ধ হয়ে পড়ে। পাকিস্তান সামরিক শাসকগণ স্বার্থান্বেষী মহলের সাথে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ডের জন্য রাজনৈতিক আলোচনার আড়ালে সামরিক বাহিনী মাত্র ২২ দিনে দুই

ডিভিশন অবাঙালি সৈন্য পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় স্থানান্তরে সক্ষম হয়। বাস্তবতায় এটিই ছিল তাদের আলোচনার নামে কালক্ষেপণের মূল উদ্দেশ্য। ২৪শে মার্চ ৭১ সামরিক শাসকগণ হেলিকপ্টার যোগে সমস্ত সেনানিবাসে এই আক্রমণের পরিকল্পনা হস্তান্তর করে। বাঙালি জাতির উপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এই কুখ্যাত হত্যাযজ্ঞের নির্দেশ নামা "অপারেশন সার্চ লাইট" নামে পরিচিতি।

২৫শে মার্চ ৭১ রাত্র ১১টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে সেনানিবাস অথবা আক্রমণ প্রস্তুতিস্থানগুলি ত্যাগ করে। একই সাথে ঢাকাসহ দেশের সমস্ত বড় শহর ও সেনানিবাসের বাঙালি রেজিমেন্টসমূহ আক্রান্ত হয়। সেনাবাহিনীর হাতে বঙ্গবন্ধু রাত ১২টা ৩০ মিনিটে ধানমন্ডি বাসভবন থেকে বন্দী হবার পূর্বে তিনি দলীয় নেতৃবন্দেকে করণীয় বিষয়ে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে অবস্থান পরিবর্তনের কথা বলেন। একই সাথে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

১১. অপারেশন সার্চলাইট ও ২৫ মার্চের গণহত্যাঃ
২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের বড় শহরগুলোতে গণহত্যা শুরু করে। তাদের পূর্বপরিকল্পিত এই গণহত্যাটি "অপারেশন সার্চলাইট" নামে পরিচিত। এ গণহত্যার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগে থেকেই পাকিস্তান আর্মিতে কর্মরত সকল বাঙালি অফিসারদের হত্যা কিংবা গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হয়। ঢাকার পিলখানায়, ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের ই বি আর সিসহ সারাদেশের সামরিক আধাসামরিক সৈন্যদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকান্ডের কথা যেন বহির্বিশব না জানতে পারে সে জন্য আগেই সকল বিদেশি সাংবাদিকদের গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং অনেককে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়। তবে ওয়াশিংটন পোস্টের বিখ্যাত সাংবাদিক সাইমন ড্রিং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব এই গণহত্যা সম্পর্কে অবগত হয়। আলোচনার নামে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কালক্ষেপণও এই গণহত্যা পরিকল্পনারই অংশ ছিল।

২৫ মার্চ রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। পাকিস্তানিদের অপারেশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ঢাকা বিশববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এবং জগন্নাথ হলের ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশববিদ্যালয় ও আশেপাশের বহু সংখ্যক শিক্ষক ও সাধারণ কর্মচারিদেরও হত্যা করা হয়। পুরোনো ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাগুলোতেও চালানো হয় ব্যাপক গণহত্যা। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ করে হত্যা করা হয় পুলিশ বাহিনীর বহু সদস্যকে। পিলখানার ইপিআর-এর কেন্দ্রে আচমকা আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করা হয় নিরস্ত্র সদস্যদের। কয়েকটি পত্রিকা অফিস ভস্মীভূত করা হয়। দেশময় ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্বিচারে হত্যা করা হয় বিভিন্ন এলাকায় ঘুমন্ত নর-নারীকে। হত্যা করা হয় শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদেরও। ধারণা করা হয়, সেই রাত্রিতে একমাত্র ঢাকা ও তার আশে পাশের এলাকাতে প্রায় এক লক্ষ নিরীহ নর-নারীর জীবনাবসান ঘটে।
১২. স্বাধীনতার ঘোষণাঃ

তিনি পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য বাংলার জনগণকে আহবান জানান। চট্রগ্রামে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচারের জন্য পাঠানো হয়। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু ঘোষণাকে অবলম্বন করে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। ২৭ মার্চ অপরাহ্নে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ৮ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার আরেকটি ঘোষণা পাঠ করেন। এই ঘোষণাটিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, নবগঠিত এই রাষ্ট্রের সরকার জোটবদ্ধ না হয়ে বিশেবর অপর রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে আগ্রহী। এছাড়াও এ ঘোষণায় সারা বিশেবর সরকারগুলোকে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলারও আহ্বান জানানো হয়। (বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র: মুজিবনগর প্রশাসন, তৃতীয় খন্ড, প্রকাশকাল: নভেম্বর ১৯৮২)

১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনঃ
১০ই এপ্রিল ৭১ নির্বাচিত সাংসদগণ আগরতলায় একত্রিত হয়ে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সরকার গঠন করেন। এই সরকার স্বাধীন সার্বভৌম "গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার"। স্বাধীনতার সনদ (Charter of Independence) বলে এই সরকারের কার্যকারিতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয়। ১৭ই এপ্রিল ৭১ মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামে বৈদ্যনাথ তলায় "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার" আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির এই সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সদস্যদের শপথ পাঠ করান জাতীয় সংসদের স্পীকার অধ্যাপক ইউসুফ আলী। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় তাঁরা হলেনঃ
১। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তানে বন্দী)
২। উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)

৩। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)
৪। অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)
৫। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ (আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)
৬। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান (ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত)

এই অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসাবে (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে) এবং কর্নেল এম এ জি ওসমানী মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশ বিদেশের শতাধিক সাংবাদিক ও হাজার হাজার দেশবাসীর উপস্থিতিতে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংসদ জনাব আবদুল মান্নান। নবগঠিত সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গার্ড অব অনার দেয়া হয়। বাঙালির প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এই স্থানটির নামকরণ করা হয় "মুজিব নগর"।

মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। রাজনৈতিকভাবে এই যুদ্ধকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সর্বসম্মতিক্রমে একটি "সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ" গঠন করেন। এই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেনঃ
ক) জনাব আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি ন্যাপ ভাসানী
খ) শ্রী মনি সিং সভাপতি বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি
গ) অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ সভাপতি ন্যাপ মোজাফ্ফর
ঘ) শ্রী মনোরঞ্জন ধর সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস
ঙ) জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী পদাধিকারবলে
চ) খন্দকার মোশতাক আহমেদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদাধিকারবলে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ৯ মাসব্যাপী সশস্ত্র এই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। মুক্তিবাহিনীর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, অস্ত্র গোলাবারুদ সরবরাহ, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সরকার প্রায় এক কোটি শরণার্থীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কূটনৈতিক দক্ষতার মাধ্যমে বিশ্বের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতায় উপস্থাপনসহ এবং একটি সময় উপযোগী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকারদের অত্যাচারে প্রায় এক কোটি বাঙালি দেশ ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ দেশত্যাগী এই জনগোষ্ঠীর সার্বিক সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা দান করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোয় কর্মরত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গঃ
১। যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রশাসনিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেনঃ
ক) রাষ্ট্রপতির পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, এম এন এ
খ) প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, এম এন এ
গ) তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত জনাব আবদুল মান্নান, এম এন এ
ঘ) জয় বাংলা পত্রিকার উপদেষ্টা জনাব জিল্লুর রহমান, এম এন এ
ঙ) যুব শিবির নিয়ন্ত্রণ পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ আলী, এম এন এ

২। বেসামরিক প্রশাসনঃ
ক) ক্যাবিনেট সচিব জনাব হোসেন তৌফিক ইমাম (এইচ টি ইমাম)
খ) মুখ্য সচিব জনাব রুহুল কুদ্দুস
গ) সংস্থাপন সচিব জনাব নূরুল কাদের খান

ঘ) অর্থ সচিব জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান
ঙ) পররাষ্ট্র সচিব জনাব মাহাবুবুল আলম চাষী এবং জনাব আবুল ফতেহ
চ) প্রতিরক্ষা সচিব জনাব এম এ সামাদ
ছ) স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব এ খালেক
জ) স্বাস্থ্য সচিব জনাব এস টি হোসেন
ঝ) তথ্য সচিব জনাব আনোয়ারুল হক খান
ঞ) কৃষি সচিব জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ
ট) আইন সচিব জনাব এ হান্নান চৌধুরী

৩। কুটনৈতিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্ববাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেনঃ
ক) মিশন প্রধান যুক্তরাজ্য, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (বহিঃর্বিশ্বে সরকারের বিশেষ দূত)
খ) মিশন প্রধান কলিকাতা, জনাব হোসেন আলী
গ) মিশন প্রধান নতুন দিল্লী, জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
ঘ) মিশন প্রধান যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জনাব এম আর সিদ্দিকী
ঙ) মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত ইরাক, জনাব আবু ফতেহ
চ) মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত সুইজারল্যান্ড, জনাব অলিউর রহমান
ছ) মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিলিপাইন, জনাব কে কে পন্নী
জ) মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেপাল, জনাব মোস্তাফিজুর রহমান
ঝ) মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত হংকং, জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ
ঞ) মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত জাপান, জনাব এ রহিম
ট) মিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত লাগোস, জনাব এম এ জায়গীরদার

৪। স্বাধীন বাংলাদেশের গণমুখী প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো কি হবে সেই লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে পরিকল্পনা কমিশন একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে। যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এই পরিকল্পনায় জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেনঃ
(ক) ডঃ মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী
(খ) ডঃ মোশারাফ হোসেন
(গ) ডঃ খান সরওয়ার মুরশিদ
(ঘ) ডঃ এম আনিসুজ্জামান
(ঙ) ডঃ স্বদেশ বোস।

৫। মুক্ত এলাকায় সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা এবং ভারতে অবস্থান গ্রহণকারী শরণার্থীদের দেখাশুনা ও যুব শিবির পরিচালনার জন্য সরকার সমস্ত বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। প্রতিটি প্রশাসনিক এলাকায় চেয়ারম্যান ও প্রশাসক নিয়োগ করেন।

১৪. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রঃ
মুক্তিযুদ্ধ সময়কালে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং অবরুদ্ধ এলাকার জনগণের মনোবল অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের নীতি নির্ধারণী ভাষণসহ জনগণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্দেশাবলী প্রচারিত হয়। প্রতিদিনের সংবাদসহ যে সমস্ত অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার মধ্যে চরমপত্র ও জল্লাদের দরবার অন্যতম। যে সমস্ত ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তাঁরা হলেনঃ
সর্বজনাব এম এ মান্নান এম এন এ, জিল্লুর রহমান এম এন এ, শওকত ওসমান, ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ মযহারুল ইসলাম, ডঃ আনিসুজ্জামান, সিকান্দার আবু জাফর, কল্যাণ মিত্র, ফয়েজ আহমদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, এম আর আখতার মুকুল, তোয়াব খান, আসাদ চৌধুরী, কামাল লোহানী, আলমগীর কবীর, মহাদেব সাহা, আলী যাকের, সৈয়দ হাসান ইমাম, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, বেলাল মোহাম্মদ, আবদুল জববার, আপেল মাহমুদ, রথীন্দ্রনাথ রায়, কাদেরী কিবরিয়া, ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী, রফিকুল

ইসলাম, সমর দাস, অজিত রায়, রাজু আহামেদ, মামুনুর রশীদ, বেগম মুশতারী শফি, শাহীন মাহমুদ, কল্যাণী ঘোষ, ডালিয়া নওশীন, মিতালী মুখার্জী, বুলবুল মহলানবীশ, শামসুল হুদা চৌধুরী, আশফাকুর রহমান খান, সৈয়দ আবদুস সাকেরসহ অনেকে।

১৫. বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীঃ
যে জনযুদ্ধ এনেছে পতাকা, সেই জনযুদ্ধের দাবিদার এদেশের সাত কোটি বাঙালি। একটি সশস্ত্র যুদ্ধ দেশকে শত্রুমুক্ত করে। এই সশস্ত্র যুদ্ধ একটি নির্বাচিত সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। পরিকল্পিত এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ই এপ্রিল '৭১ বাংলাদেশ সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি যুদ্ধঅঞ্চলে বিভক্ত করেন। এই ৪টি অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক ছিলেনঃ
ক) চট্টগ্রাম অঞ্চল - মেজর জিয়াউর রহমান
খ) কুমিল্লা অঞ্চল - মেজর খালেদ মোশাররফ
গ) সিলেট অঞ্চল - মেজর কে এম সফিউল্লাহ
ঘ) দক্ষিণ পশ্চিম - অঞ্চল মেজর আবু ওসমান চৌধুরী

পরবর্তীতে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে বিভক্ত করে রাজশাহী অঞ্চলে মেজর নাজমুল হক, দিনাজপুর অঞ্চলে মেজর নওয়াজেস উদ্দিন এবং খুলনা অঞ্চলে মেজর জলিলকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ৭ই জুলাই ৭১ যুদ্ধের কৌশলগত কারণে সরকার নিয়মিত পদাতিক ব্রিগেড গঠনের পরিকল্পনায় 'জেড ফোর্স' ব্রিগেড গঠন করেন। এই জেড ফোর্সের অধিনায়ক হলেন লেঃ কর্নেল জিয়া?

লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি
সম্ভাব্য প্রশ্ন: বড় প্রশ্ন বা টীকা লিখুন- "বাঙালি জাতীয়তাবাদ" ।
সম্পর্কিত বিষয় (Related Topics):
বাংলাদেশ বিষয়াবলি: The Liberation War and its Background, The Constitution of Bangladesh.

****
জাতীয়তাবাদ বাঙালী, না বাংলাদেশি ????

********** দেখি সংবিধানে কি বলা এই ইস্যুতে **********

আপনারা জানেন যে, বাংলাদেশ সংবিধান এর ১ম ভাগ বা অধ্যায় এর ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ এ বলা হয়েছে:
৬(১) "বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।"
৬(২) "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

সংবিধানের ৯ নং অনুচ্ছেদে "জাতীয়তাবাদ" নিয়ে বলা হয়েছে:
(৯) "ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।"

********** বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বিশ্লেষণ **********
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হবার পর ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ (স্বদেশ প্রত্যাবর্তন) বলেছিলেন, " আমি বাঙালী, আমি মুসলমান, একবার মরে, বার বার মরে না।"
এছাড়াও ৭ ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বহুবার "বাঙালী" শব্দটি উচ্চারণ করেন।

********** ঐতিহাসিক দলিল **********
১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালী জাতিগত পরিচয়ে প্রথম যে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়, তাকেই বলে "বাঙালী জাতীয়তাবাদ"। (বোর্ড বই)
তাই আমাদের জাতীয়তাবাদ = বাঙালী।

****
এই বিষয়ে ২ টি article শেয়ার করলাম:
****

********* বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা **********

কুড়ি শতকে বহু জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দীর্ঘ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। ওই সব জাতি পরাধীনতা ও শোষণ-নিপীড়ন-বঞ্চনা থেকে মুক্তি চেয়েছে। সব দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের চরিত্র ও স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়া এক রকম নয়। কোনো জাতিরাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তি যদি দুর্বল হয়, সেই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্থবহ হয় না এবং জনগণ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে না। স্বাধীনতার সুস্বাদু ফলটি ভোগ করে গুটিকয় মানুষ।
স্বাধীনতার জন্য সব জাতিকেই মূল্য দিতে হয়—রক্ত দিতে হয়। স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। সেটা স্বাধীনতাসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে। স্বাধীনতাসংগ্রামের রয়েছে অনেকগুলো পর্যায়। আমাদের পত্রপত্রিকা পড়ে এবং টিভিতে নেতাদের বক্তৃতা শুনে মনে হবে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস শুধু নয় মাসের পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা এবং দলীয় নেতা ও মুক্তিসেনাদের বীরত্বের ইতিহাস। বস্তুত তা মোটেই নয়। বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস অনেক বিস্তৃত এবং সময়ের অনেক গভীরে তার শিকড়। তা শুধু ঘটনানির্ভর নয়—চেতনানির্ভর। তার সঙ্গে এই ভূখণ্ডের মানুষের সংস্কৃতি অর্থাৎ ভাষা, সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম—জীবনের যাবতীয় বিষয় যুক্ত।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফসল বাংলাদেশ। সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল পাকিস্তানবাদী সাম্প্রদায়িক মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রতিবাদ। পাকিস্তানের শাসকদের অধিকাংশই ছিল সামন্তপ্রভু ও জমিদার-জোতদার শ্রেণির মানুষ। তাদেরই প্রজাদের অনেকে বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা পান '৭২-এ। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা নেতারা পাকিস্তানকে শক্ত গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে ব্যর্থ হন। একইভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে '৭২-এ যাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা পান, তাঁরাও নিজেদের শ্রেণির স্বার্থে বাংলাদেশকে টেকসই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বানানোর উদ্যোগ নেননি। গণতন্ত্রহীন পাকিস্তান ২৪ বছরের মধ্যেই ভেঙে যায়, চার বছরের মধ্যে বাংলাদেশ গণতন্ত্রহীন প্রায়-অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়।
বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা বাঙালি জাতীয়তাবাদের সব দেশের ক্ষমতাপ্রত্যাশী বিত্তবান শ্রেণিটি জাতীয়তাবাদী স্লোগানে উৎসাহিত হয়। জাতীয়তাবাদের ধ্বনি প্রথমে তোলেন কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। একসময় তার সমর্থনে এগিয়ে আসে জনগণ। জনগণের সুপ্ত-চেতনা জাগিয়ে তোলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। কঠিন সত্য হলো, জনগণের আপসহীন মনোভাব সব সময় দেশের কল্যাণ বয়ে আনে না। ক্যারিশম্যাটিক নেতাদের দিয়ে আন্দোলন সফল করা গেলেও সব ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতি অর্জিত হয় না। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সমস্যার সমাধান করতে পারবে, তার নিশ্চয়তা নেই। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সফল হলেই, তার মাধ্যমে স্বাধিকার অর্জিত হলেই, দেশের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হবে, তা নয়। কী কারণে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ, কেন তা স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়, তার নির্মোহ বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন জনগণের উপকারে না এসে নেতাদের ক্ষমতা দখলের মধ্যে গিয়ে আটকে যায়। সবচেয়ে বড় অর্জনের দুর্বলতাগুলোকে যদি গোপন রাখা হয়, সেই অর্জনের পরিণতি শুভ হয় না।

রাষ্ট্রক্ষমতায় বাঙালি মুসলমানের অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা অতি অল্প দিনের। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে মুসলমানদের কেউ কেউ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পর্যন্ত হয়েছিলেন। মেম্বারও ছিলেন বহু। ইউনিয়ন বোর্ডের (বর্তমানের ইউনিয়ন পরিষদ) চেয়ারম্যান ছিলেন অনেকে। বিভিন্ন সময় অবিভক্ত বাংলা ও পূর্ব বাংলার (বাংলাদেশ) যাঁরা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তাঁদের হাতেখড়ি হয়েছিল লোকাল বোর্ড বা স্থানীয় সরকারের নেতা হিসেবে। ফজলুল হক কলকাতা করপোরেশনের মেয়র ছিলেন, স্যার নাজিমউদ্দিন ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতা করপোরেশনের ডেপুটি মেয়র ছিলেন, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন ময়মনসিংহ পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। স্বাধীনতার পরে যাঁরা বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তাঁদের অধিকাংশের ইউনিয়ন পরিষদ চালানোরও অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই হঠাৎ ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর তাঁদের প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য দায়ী তাঁরা নন, দায়ী তাঁদের অভিজ্ঞতার অভাব।
স্বাধীনতার ৪৩ বছর হয়ে গেল। এই সময় সামরিক-বেসামরিক, সাংবিধানিক-অসাংবিধানিক নানা কিসিমের সরকার দেশ শাসন করেছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নও যথেষ্ট হয়েছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য কমেছে। জাতীয় প্রবৃদ্ধি অসন্তোষজনক নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যা, তার বারো আনাই বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে। রাষ্ট্রের ভূমিকা সেখানে সামান্য। তৈরি পোশাকশিল্প বেসরকারি খাত, মধ্যপ্রাচ্য থেকে যাঁরা বৈদেশিক মুদ্রা পাঠান, তাঁরা সব গরিব শ্রমিক। কৃষিতে ষাটের দশকে উন্নতির যে ধারা সূচিত হয়, সেটাই অব্যাহত আছে ৫০ বছর ধরে।

জাতিরাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে মান যদি সন্তোষজনক না হয়, স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ের চেয়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়টি যদি স্বস্তিকর না হয়, তাহলে স্বাধীনতা পূর্ণতা পায় না। ৪৩ বছরে সবগুলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান প্রায় অকার্যকর হয়ে গেছে। এমন কোনো নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি, যা নিয়ে জাতি অহংকার করতে পারে। শিক্ষা যদি কোনো জাতির মেরুদণ্ড হয়ে থাকে, তাহলে সেই মেরুদণ্ডটি সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। মাদ্রাসায় মধ্যযুগ ও মধ্যপ্রাচ্যপন্থী শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যমে আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া-কানাডাপন্থী শিক্ষার মাঝখানা ভুলে ভরা সাধারণ শিক্ষা। শিক্ষা বলতে কিছু নেই, যা আছে তা হলো ও-লেভেল, এ-লেভেল, দাখিল-ফাজিল আর জিপিএ ফাইভ। নৈতিক অধঃপতনের প্রশ্ন তুলব না। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানে কতটা উন্নতি হয়েছে? জগদীশ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কুদরাত-এ-খুদার দেশ-বিজ্ঞানে অগ্রগতি কোথায়? আলাউদ্দিন খাঁর জন্মভূমি, উচ্চাঙ্গসংগীতে আমাদের অর্জন কী? যেসব ক্ষেত্রে কঠোর সাধনা ও অবিচল নিষ্ঠা প্রয়োজন, সেসব বিষয়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রজন্ম আগ্রহ হারিয়েছে।

সৈয়দ আবুল মকসুদ: গবেষক, প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক।

********** বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধ **********

বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধবাঙালি জাতীয়তাবাদ ঠিকই অক্ষুণ্ন রয়েছে আর বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বলে যে কোনো জাতীয়তাবাদ নেই, ওটা নাগরিকত্ব তা বুঝতে কারোর বাকি নেই।

বাংলার প্রতিটি মানুষ আজ হৃদয় দিয়ে অনুভব করছে বাঙালি ছিলাম বলেই বাংলাদেশ স্বাধীন করে আমরা বাংলাদেশি হতে পেরেছি। তাই নাগরিকত্বে আমরা বাংলাদেশি, জাতীয়তাবাদে অবশ্যই বাঙালি। আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে পারে এমন কোনো শক্তি দৃশ্যমান নেই। তাই বঙ্গবন্ধু সম্লোগান জয় বাংলা তাৎপর্যে আজও অক্ষুণ্ন রয়েছে।

'৭৫-এর নির্মম হত্যাকান্ডের পর বিশেষ করে জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে যারা তাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পাল্টে দিয়ে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন হঠাৎ করে তাদের মাথায় যে উদ্ভট পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল এরূপ চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। সুচিন্তিতভাবে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সামনে রেখেই তারা ওটা করেছিলেন। এর পরামর্শদাতা ছিলেন এমন একজন সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী যিনি কোনোভাবেই বাঙালি জাতির '৭১-এর বিজয়কে মেনে নিতে পারেননি। অবশ্য তিনি একাই এ কাজটা করেছিলেন এরূপ চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। তার সঙ্গে ছিলেন ওইসব রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব যারা বাংলাদেশে বসবাস করেও বাঙালি হতে চাননি। মাত্র ২৩ বছরের জন্য একটা ধর্মরাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে তারা সেই রাষ্ট্রের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করেছিলেন এবং তা রক্ষার নিমিত্ত দখলদার বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলেন। তারাই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাঙালি জাতিসত্তাকে দুর্বল করে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যেই ওই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ বাঙালি কখনই তাদের পাকিস্তানি বলে মনে করেননি। তাই পাকিস্তান হওয়ার পর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর যে আগ্রাসন শুরু হয় তার বিরুদ্ধে তারা সর্বাত্মক অবস্থান নিয়েছিলেন। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে সুসংহত করার প্রয়োজনে পাকিস্তান সরকার বার বার আহ্বান জানালেও, এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও পূর্ব বাংলার বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল। ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার যে ক্ষুদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী পাকিস্তানকে মুসলমানের একটা রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করেছিল তারাই বাঙালি সংস্কৃতিকে হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক দুটি সংস্কৃতি বলে গণ্য করত। তাদের ধারণায় ইসলামকে রক্ষা করতে হলে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা পাকিস্তান জিন্দাবাদ সম্লোগান দিত ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে জাতির জনক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। পূর্ব বাংলার ধর্মান্ধ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মুসলিম লীগ, জামায়াতসহ অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। ১৯৭১ সালে দখলদার বাহিনী যে জেনোসাইড করে তাদের সহযোগী হিসেবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, মুসলিম লীগ, জামায়াতিরা প্রত্যক্ষভাবে দখলদার বাহিনীর সম্পূরক শক্তি হিসেবে রাজাকার-আলবদর-আলশামস হতে দ্বিধাবোধ করেনি। আসলে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করেই পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী বিপুল জনগোষ্ঠী পাকিস্তান নামক ধর্মরাষ্ট্রের বাঙালিবিরোধী তৎপরতায় ক্রমাগত সচেতন হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ যখন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দিলেন তখন বাংলার দামাল ছেলেরা 'নো, নো' বলে যে হুঙ্কার করে তা-ই ছিল পাকিস্তান নামক ধর্মরাষ্ট্রের প্রথম অস্বীকৃতি। বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির ওপর আগ্রাসন চালানোর লক্ষ্যে যা করা হয়েছিল তা সঠিকভাবে অনুধাবন করেই পূর্ব বাংলার জনগণ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। শুরু হয় সংঘাতময় ভাষা আন্দোলন। সে আন্দোলনে বাঙালির বিজয় হয়। রক্তের বিনিময়ে মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে শুরু হয় বাঙালির বিজয়। বাংলা ভাষার দাবি পূরণ হওয়ার পরও বাঙালি থেমে থাকেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্মম নির্যাতন-নিপীড়নের বিপরীতে তারা স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবি তোলে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন শুরু হয়। সে আন্দোলন ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তর হয়। বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা মামলার এক নাম্বার আসামি করে বিচারে ফাঁসি দেয়ার চক্রান্ত যখন চরম পর্যায়ে তখন '৬৯-এ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান হয়। শেখ মুজিব ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত হন এবং জনগণের বন্ধু হিসেবে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন। সেই থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের জনগণের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে সংগ্রাম করে গেছেন। স্বাধীনতা শব্দটি তো একসময় ছিল তারই নিজস্ব স্বগত উক্তি। পরে তা ঐতিহাসিক আন্দোলনের দাবিতে পরিণত হয়। প্রথমে ভোটের ও পরে অস্ত্রের মাধ্যমে সে দাবি আদায় করা হয়। '৭১-এর মার্চে অসহযোগ আন্দোলন করে বঙ্গবন্ধু প্রমাণ করেন যে, বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানি শাসকদের দখলদার বাহিনী মনে করে। দখলদার বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে তারা গোটা বিশ্বকে জানিয়ে দেয় যে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটা স্বাধীন রাষ্ট্র। পূর্ব বাংলার জনগণকে শাসন করার অধিকার পাকিস্তানিদের নেই। একমাত্র ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া আর সব জায়গায় পাকিস্তানের পতাকা বাঙালিরা হয় পুড়িয়ে ফেলে, না হয় নামিয়ে দেয়। পরিবর্তে বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা উড়তে থাকে। আর ৭ মার্চের ঘোষণায় ওই সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন ঘোষণা করলেন_ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে বাংলাদেশকে দখলদার বাহিনীমুক্ত করার আহ্বান জানান। তখন কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোনো ঘোষকের জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। ঘোষক আবিষ্কারের ষড়যন্ত্র তো অনেক পরের ঘটনা। বঙ্গবন্ধু যখন স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট রচনা করেন তখন তো ওই ধরনের

কোনো ঘোষকের অস্তিত্ব কল্পনায় ছিল না। কয়েক ডজন বাঙালি সামরিক অফিসার বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। কই তাদের কেউ তো তখন স্বাধীনতার ঘোষক বলে নিজেকে দাবি করেননি। শুধু একজন ঘটনাচক্রে যাকে কালুরঘাটে উপস্থিত করা হয়েছিল তিনি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে এক মহাপ্রতারণা করলেন। ২৬ মার্চ পাকিস্তানের পক্ষে অনুগত একজন মেজরের পক্ষে বাংলাদেশের ২৩ বছরের সংগ্রামের ফসল যে মুক্তিযুদ্ধ তার ২৭ মার্চ ঘোষণা দেয়ার কোনো নৈতিক বা আইনগত রাজনৈতিক অধিকার ছিল কি? সেদিন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতারা তাকে ধরে এনে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা না দেয়ালে কে তার খোঁজ রাখত। আর সেই সুবাদে তিনি যে কাজটি করে বসলেন তা ছিল সবচেয় বড় বিশ্বাসঘাতকতা। তিনি যদি একবার সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে দেখতেন যে, '৭০-এর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যারা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অসহযোগ আন্দোলন সর্বাত্মকভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তারা দখলদার বাহিনীর আক্রমণের পর কী পদক্ষেপ নিতে পারেন। তা যদি বোঝার ক্ষমতা তার থাকত তাহলে তিনি কখনো বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের প্রাণপুরুষ হওয়ার বাসনায় ওইরূপ একটা অস্বাভাবিক ঘোষণা দিতে পারতেন না। তার ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে গেছে, তাকে হয়তো তারা মেরে ফেলেছে। আর আওয়ামী লীগের নেতারা দেশছাড়া হয়েছেন, তারা আর কখনো দেশে ফিরতে পারবেন না। সেই সুবাদে তিনি যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তাহলে জনগণ তাকেই হয়তো মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বলে মেনে নেবে! যেহেতু সংগ্রাম, আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটের কোনো পর্যায়ের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা ছিল না এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ তার জোটেনি তাই মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তার কোনো ধারণা না থাকায় তিনি ওইরূপ ঘোষণা দিয়েছিলেন। হানাদার বাহিনীর আক্রমণের পর বঙ্গবন্ধুর সহযোগী ও তার দলের নির্বাচিত প্রতিনিধির ওপর বঙ্গবন্ধু কী নির্দেশ দিতে পারেন, তা বোঝার মতো মন-মানসিকতা তার থাকার কথা নয়।

নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে পাশের রাষ্ট্র ভারতে গিয়ে একটা বিপ্লবী সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে পারেন এরূপ চিন্তা তার বোধে ছিল না। তাই মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পরই স্বাধীনতা ঘোষণার প্রসঙ্গটি না তুলে তিনি মুজিবনগর সরকারের আনুগত্য মেনে নিলেন এবং ওই সরকারের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। যিনি নিজে কখনো স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাবি করেননি তার মৃত্যুর সুদীর্ঘ সময় পর কেন তার অনুসারীরা তাকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠলেন, তা এখন আর কারো বুঝতে বাকি নেই। তাদের ধারণা ছিল, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর তার প্রতিষ্ঠিত দল আওয়ামী লীগও শেষ হবে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির কোনো অস্তিত্ব থাকবে না এবং সেই শূন্যতা তিনিই পূরণ করবেন। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেই তা করা সম্ভব হবে। আসলে '৭১-এ বাঙালি জাতি যে স্বাধীনতার চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অস্ত্র হাতে নিয়েছিল, মেজর জিয়ার ঘোষণার আগেই যে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল তা যে কোন পর্যায়ে গিয়ে পেঁৗছাতে পারে, তা বোঝার মতো ক্ষমতা জিয়ার ছিল না বললেই প্রথমবার তিনি নিজের নামে ঘোষণা দেন। কিন্তু ঘোষণা দিলে কী হবে, তার সেই ঘোষণা তিনি টিকিয়ে রাখতে পারেননি। পরক্ষণেই তাকে বলতে হয়েছে_ মহান নেতা জাতির জনকের পক্ষে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন।

জিয়াউর রহমান ভালো করেই জানতেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা যত দিন অক্ষুণ্ন থাকবে তত দিন বঙ্গবন্ধুকে বাঙালির চেতনাপট থেকে মুছে ফেলা যাবে না। তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অস্বীকৃতি জানিয়ে নতুন করে স্বাধীন বাংলাদেশ পাকিস্তানি ভাবধারায় ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলে, সম্প্রদায়গত বিভেদ আগের মতো আবার সক্রিয় করতে পারলে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে দুর্বল করা সম্ভব।

আসলে ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও মন-মানসিকতায় বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বলে ভিন্ন অস্তিত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব কি? পাকিস্তানিরা বাঙালিদের পাকিস্তানিকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে জিয়ার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের নামে মূলত সে প্রক্রিয়াই শুরু হয়। হয়তো সাম্প্রদায়িকতার মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার একটা পর্যায়ে তিনি বলে বসতেন রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের কথা। স্বাধীন বাংলাদেশকে মন ও মননশীলতায় কতটা পাকিস্তানের কাছে নেয়া যায় এটাই ছিল বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য। জাতীয় সংস্কৃতি, জাতিসত্তা সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা না থাকায় তিনি কাল্পনিক জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখতেন। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে যেসব ধর্মীয় উপাদান ঐতিহাসিক কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে বিলুপ্ত হয় তিনি সেসব উপাদান বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিছুসংখ্যক ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী ছাড়া অতিস্বাভাবিক কারণেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ক্ষমতার রদবদল হয়েছে, স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আলবদর ও আলশামসরা ক্ষমতায় এসেছে এবং মানবতাবিরোধী অপরাধীরা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিতকে পাল্টে দিতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদ; ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ভিত্তিক জাতীয়তবাদ অটুট রয়েছে। আন্দোলনে আবার নতুন গতি এসেছে। শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের যে অঙ্গীকার মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল, তা আবার শুরু হয়েছে। বঙ্গবন্ধু নেই কিন্তু তার দল

আছে। আছে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী বাংলার জনগণ। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'জয় বাংলা' সম্লোগানে আবার মুখরিত বাংলার আকাশ-বাতাস।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ঠিকই অক্ষুণ্ণ রয়েছে আর বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বলে যে কোনো জাতীয়তাবাদ নেই, ওটা নাগরিকত্ব তা বুঝতে কারোর বাকি নেই। বাংলার প্রতিটি মানুষ আজ হৃদয় দিয়ে অনুভব করছে বাঙালি ছিলাম বলেই বাংলাদেশ স্বাধীন করে আমরা বাংলাদেশি হতে পেরেছি। তাই নাগরিকত্বে আমরা বাংলাদেশি, জাতীয়তাবাদে অবশ্যই বাঙালি। আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে পারে এমন কোনো শক্তি দৃশ্যমান নেই। তাই বঙ্গবন্ধু সম্লোগান জয় বাংলা তাৎপর্যে আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

ডা. এস এ মালেক: রাজনীতিক ও কলাম লেখক

****
একটা ইস্যুতে গত ২-৩ বত্সরেও সমাধান পাই নি!
****
সুতরাং,
আমাদের জাতীয়তা = বাঙালি (জাতি অর্থে) এবং নাগরিকত্ব = বাংলাদেশি।
কিন্তু বিসিএস সহ যেকোনো সরকারী প্রয়োজনেও কেন আমরা জাতীয়তা = বাংলাদেশি উল্লেখ করি ?
এটা কি তাহলে বলব,
কাগজে কলমে জাতীয়তা = বাঙালি, আর প্রাকটিস বা বাস্তবে অনুশীলন তা হলো জাতীয়তা = বাংলাদেশি।

Organs of the Government

Iপ্রশ্ন-১ : জনপ্রশাসনকে আধুনিকীকরণ, যুগোপযোগী ও উন্নয়নমুখী করা করার প্রয়োজনীয়তা ও করণীয় সম্পর্কে আপনার মতামত উল্লেখ করুন

প্রশ্ন-২: প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও করণীয় সম্পর্কে আপনার মতামত উল্লেখ করুন I

**********এখনো গন্তব্যে পৌঁছানো বাকি**********
জনপ্রশাসনকে আধুনিকীকরণ, যুগোপযোগী ও উন্নয়নমুখী করা এবং প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জনগণের সেবক হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। একই সঙ্গে সরকারের ভাবনা বা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমলাতন্ত্রের। তাই সরকার ও আমলাতন্ত্র প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং পরস্পরের পরিপূরক। এ প্রেক্ষাপটে সরকারকে এমন প্রশাসনিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে হয়, যার মাধ্যমে সরকারের চিন্তাচেতনা, পরিকল্পনা ও নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন যেমন সম্ভব, তেমনি জনগণ যেন দ্রুত সিদ্ধান্ত ও সুবিচার পায়, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে সর্বস্তরে সরকারের উপস্থিতিকে জনগণের কাছে প্রতিভাত করতে পারলেই তার সাফল্য দৃশ্যমান হয়।
কিন্তু আমাদের মতো গণতান্ত্রিক দেশে সরকারকে একটি দলের প্রতিনিধি হিসেবে চিন্তা করে জনগণ। অথচ আমলাতন্ত্রকে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ দেখতে চায়। তাই সরকার যখন আমলাতন্ত্রকে নিজ দলীয় ভাবনার অনুসারী বা অনুগত বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তখনই জনগণ ও গণমাধ্যম সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। এ ভাবনা হচ্ছে আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত সংস্কৃতির অংশ। জনগণের প্রত্যাশা হচ্ছে, সরকার দুর্বল হতে পারে, কিন্তু প্রশাসন হতে হবে দক্ষ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছতার প্রতীক।

প্রশাসন ও রাজনীতি হচ্ছে দুটি আলাদা সত্তা। অথচ পরস্পরের পরিপূরক। এ কথাই বলেছেন উড্রো উইলসন, যিনি আধুনিক জনপ্রশাসনের পিতা ও প্রধান প্রবক্তা। জনপ্রশাসন সম্পর্কে তিনি ১৮৮৭ সালে গবেষণা করে অভিমত দেন যে, রাজনীতি ও প্রশাসন হবে পৃথক। জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বাড়াতে হবে এবং তাদের নিয়োগ হবে প্রতিভা যাচাইয়ের মাধ্যমে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। মূলত বিশ্বজোড়া এ বক্তব্যকে স্বীকৃত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং অনুসরণ করা হচ্ছে।

প্রশাসনকে কীভাবে অধিকতর গণমুখী ও অর্থবহ করা যায়, এ বিষয়ে লুথার গুলিক ও লিন্ডন আরউইক নামে দুজন গবেষক উত্তম প্রশাসকদের দায়িত্ব হিসেবে পরিচালনা, সংগঠন, সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা জনপ্রশাসনের জন্য দক্ষতাকেই অধিক মূল্য দিয়েছেন। অনেকে মনে করেন, টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আধুনিক প্রশাসনের মূল কথা। দক্ষতার আরেক নাম প্রশাসন। ন্যায় বিচার ও নিরপেক্ষতা হচ্ছে তার নির্দশন। তবে নব্বইয়ের দশকে নতুন এক জনব্যবস্থাপনার ধ্যান-ধারণা প্রভাব বিস্তার করেছে বিশ্বের অনেক দেশে।

অনেক গবেষক এবং নতুন ধারণার প্রবক্তারা আমেরিকায় বলতে শুরু করেছেন, আধুনিক জনব্যবস্থাপনার আদর্শ হবে বেসরকারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্বুদ্ধ। অর্থাত্ দক্ষ প্রশাসন দেখতে আর্থসামাজিক নিরাপত্তা পেতে হলে জনগণ বা কাস্টমারকে অর্থ ব্যয় করতে হবে, সরকারের কোষাগারে রাজস্ব দিতে হবে অনেক বেশি। সরকার কোনো দাতব্য চিকিত্সালয় খুলে বসেনি ভালো প্রশাসন উপহার দিতে। বিশ্বব্যাপী নিত্যনতুন ভাবনার উদ্ভাবন হচ্ছে, আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।
সাম্প্রতিক কালে ব্যাপক জনশ্রুতি হচ্ছে, সরকার আমলাতন্ত্রকে দলীয় ভাবনায় প্রভাবিত করছে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিজস্ব গতিতে প্রবাহিত হতে দিচ্ছে না অথবা নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধা দিচ্ছে। এমন অভিযোগ নতুন নয়। অতীতেও হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর অনেক দেশেই এমনটি কমবেশি হয়ে থাকে। তবে মাত্রা ও ক্ষেত্র এবং স্থান-কাল-পাত্র হচ্ছে বিবেচ্য। যেমন কোনো টেন্ডার বা বড় কাজের ঠিকাদারি পেতে হলে দলীয় লোককে পাইয়ে দেয়ার জন্য অন্যায়ভাবে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিকে যদি সরকার থেকে প্রভাবিত করা হয়, তখন বলতে হবে, এ হচ্ছে সরাসরি দুর্নীতি। এ নিয়ে যদি মন্ত্রী ও সচিবের বিরোধ বাধে এবং তখন যদি সচিবকে বদলি করা হয় বা ওএসডি করা হয়, তখন বলতে হবে, সরকারের শুদ্ধাচারের নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। সরকারি কর্মচারীকে তার দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা প্রমাণে বাধা দেয়া হচ্ছে। এমনটি হচ্ছে অনভিপ্রেত, তাই জনগণ উত্কণ্ঠিত।

সরকার গণপদোন্নতি দিচ্ছে অধিকসংখ্যক কর্মকর্তাকে নিজেদের দলে রাখার লক্ষ্যে, এমন অভিযোগ আসছে অহরহ। যেমন ১০৮টি অতিরিক্ত সচিবের পদের বিপরীতে ২৮৩ জনকে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে এবং ২৫০টি যুগ্ম সচিবের পদের বিপরীতে ৯২৯ জনকে যুগ্ম সচিব করা হয়েছে এবং ৮৬০টি উপসচিবের পদের বিপরীতে ১২৯৭ জন উপসচিব আছেন। অতিরিক্ত

সচিবরা দেখা যায় যুগ্ম সচিবের কাজ করছেন এবং যুগ্ম সচিবরা উপসচিবের কাজ করছেন, যা অদৃশ্যপূর্ব ও প্রশাসনিক নীতিমালার পরিপন্থী। অনেকে মনে করেন, এ হচ্ছে উচ্চপদে নিজেদের লোক বসানোর অভিসন্ধি, যার মাধ্যমে সরকারি সিদ্ধান্তকে দলীয়করণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এমন অভিযোগের কোনো জবাব নেই।

কিন্তু এত সব করার পরও দেখা যায় জনপ্রশাসন স্থবির, প্রশাসনে গতি নেই। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ঘুরে দেখছেন এবং চেষ্টা করছেন গতিসঞ্চারের। বর্তমানে এমন অবস্থা যে, সাধারণ প্রশাসন আছে কিনা জনগণ বুঝতেই পারে না। যেমন নারায়ণগঞ্জে সাত খুন হলো। র‍্যাব-পুলিশ ছোটাছুটি করল, অভিযুক্ত হলো। নারায়ণগঞ্জে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আছে কিনা জনগণ বুঝতেই পারেনি। বুঝতে পারল যখন খবর বের হলো, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ছি! কি লজ্জা? তাহলে কি দলীয় বিবেচনায় অদক্ষ ব্যক্তিকে জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল? সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক বদলি হওয়ার পর এলাকায় মিষ্টি বিতরণ হয়েছে, এমন খবর প্রশাসনের জন্য হতাশাজনক।

বর্তমান সরকার 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র' প্রণয়ন করে জারি করেছে ২০১২ সালের অক্টোবরে। কিন্তু প্রশাসনে দুর্নীতি কি কমেছে? তাহলে বুঝতে হবে, আইনের প্রয়োগ হচ্ছে না। পক্ষান্তরে কিছু কিছু কর্মকর্তার অভিযোগ হচ্ছে, মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা প্রশাসনকে এমনভাবে প্রভাবিত করেন যে, কোনো সিদ্ধান্তই বাস্তবায়ন করা যায় না। মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত আসে একান্ত সচিবের বা সহকারী একান্ত সচিবের মাধ্যমে কিংবা তাদের ইচ্ছানুসারে অথবা প্রদত্ত তথ্যানুসারে। এমনটি না হলে কি ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিবের বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণ এবং দুর্নীতির অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা করে? এ হচ্ছে সামান্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কাণ্ড। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের কথা বলা সঠিক হবে না। কারণ সেখানে কালো বিড়ালদের অবাধ বিচরণ। আমি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব থাকা অবস্থায় দেখেছি মন্ত্রী ও সচিবের মধ্যে প্রায় আট মাস কোনো কথাবার্তা হয়নি। তাহলে বন্দর কর্তৃপক্ষ বা সমুদ্র পরিবহন অধিদফতর কিংবা বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি চলেছিল কেমন করে? হয়তো চলেছে যেমন হাল ছাড়াও জাহাজ চলে, তবে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে ব্যাপক।

বাস্তবে এমনটি কেন হয়। ১৯৯৬ সালের আগে রুলস অব বিজনেস অনুসারে একটি মন্ত্রণালয়ের প্রধান ছিলেন সচিব। ১৯৯৬ সালে রুলস অব বিজনেস সংশোধন করে সচিবের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। তবে সচিব হচ্ছে প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসার এবং বর্তমানে তিনিই হচ্ছেন হেড অব প্রকিউরমেন্ট এনটিটি। কিন্তু মূল বিষয়টি হচ্ছে, তিনি মন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া কিছুই করতে পারেন না। কার্যপ্রণালি বিধিমালায় ২০১৪ সালে পরিবর্তন আসছে, কিন্তু প্রশাসনকে শক্তিশালী করার জন্য নয়। রাজনৈতিক প্রভাবকে আরো জোরদার করার ভাবনা বিকশিত হচ্ছে প্রতি পদে।
সরকারকে অবশ্যই সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট অনুমোদন করে তার প্রয়োগ করতে হবে। ২০০৮ সালে এ কার্যক্রম শুরু হয়; কিন্তু কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। এর কারণ বিবিধ। তবে অনেকে মনে করেন, এ আইন হলে খুশিমতো নিয়োগ, পদোন্নতি বা পদায়ন দেয়া যাবে না এবং অনেক বিষয় নিয়ম-কানুনের মধ্যে আটকা পড়বে, যেখানে দলীয়করণ সহজ হবে না।
জনপ্রশাসনে অদক্ষতা ও জবাবদিহিতার দুর্ভিক্ষ দেখে অনেকে ভীষণ হতাশ। বাংলাদেশে বেশির ভাগ জনগণ প্রত্যাশা করে, জনপ্রশাসনে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী ও কর্মকর্তারা থাকবে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং একই সঙ্গে দক্ষতা ও কর্মতত্পরতার দর্শনীয় প্রতিচ্ছবি তাদের মাঝেই দেশ ও জাতি দেখতে পাবে। সুবিচার, সুশাসন, জনজীবনে নিরাপত্তা বিধান, পিছিয়ে পড়া জনগণের পাশে থাকা হবে জনপ্রশাসনের মৌলিক দায়িত্ব, জনসেবায় দক্ষতা ও জবাবদিহিতা হবে তাদের আদর্শ। তাই প্রশাসন চলবে দক্ষতার মাপকাঠিতে এবং কোনো প্রকার স্বজনপ্রীতি বা রাজনৈতিক প্রভাব থেকে তারা থাকবে মুক্ত।

জনপ্রশাসনে স্থবিরতা কাঠিয়ে দক্ষতা প্রদর্শন, প্রতি কাজে শুদ্ধাচারের নিদর্শন প্রতিষ্ঠা এবং প্রজাতন্ত্রের নির্ভীক সেবক হিসেবে প্রশাসনকে প্রতিভাত করতে হলে কী করতে হবে, এ প্রশ্ন অনেকের। উত্তর সহজ নয়, তবে অসম্ভব কিছু নয়। কয়েকটি বিষয় এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করতে হবে। প্রথমত, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সরকারের প্রচলিত নিয়ম-কানুন বা বিধিবিধান সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রকে ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে এবং তাদের কার্যক্রম নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা থাকবে। তৃতীয়ত, প্রত্যেক কর্মচারীর কর্মজীবনের পরিকল্পিত আলেখ্য থাকবে এবং সেখানে পদোন্নতি বা পদায়নে কোনো প্রকার রাজনৈতিক বা অযাচিত হস্তক্ষেপ চলবে না। চতুর্থত, প্রত্যেক কর্মচারী তার জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা পাবেন এবং কার্যসম্পাদনকালে বিধিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা পাবেন। পঞ্চমত, ক্ষমতাসীন সরকারকে ভাবতে হবে, সরকারি কর্মচারীরা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী বা রাজকর্মচারী; কোনো দলের নয় বা নিজস্ব কর্মচারী নয়।
পৃথিবীতে যেসব দেশ দ্রুত অগ্রগতি লাভ করেছে, সেসব দেশে আমলাতন্ত্র দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছে বলেই সরকারের ভাবমূর্তি

বিকশিত হয়েছে এবং জনগণ তাদের স্বাধীন চিন্তা-মনন ও মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। জনপ্রশাসনে দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই এবং দক্ষ জনপ্রশাসন ভিন্ন দেশ ও জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়।
লেখক: সাবেক সচিব, সাবেক তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা
ধীরাজ কুমার নাথ

**********সংস্কারের বিকল্প নেই**********
১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় পাকিস্তানের অংশ হিসেবে আমরা ব্রিটিশ শাসনামলে প্রবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করি। এ শাসন ব্যবস্থা ছিল মূলত ঔপনিবেশিক ধাঁচের। পাকিস্তান সরকার এ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে না, এ উপলব্ধি থেকেই শুরু হয় প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ।

কীভাবে বেসামরিক প্রশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং একটি প্রাদেশিক প্রশাসনকে কেন্দ্রীয় সরকারে পরিণত করা যায় সে ব্যাপারে সুপারিশ প্রদানের জন্য স্বাধীনতার পর পরই গঠিত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রেস্টোরেশন কমিটির সুপারিশক্রমে প্রাদেশিক সচিবালয়কে জাতীয় সচিবালয়ে রূপান্তর করা হয়। এছাড়া গঠন করা হয় প্রশাসন ও চাকরি পুনর্গঠন কমিটি। এ কমিটিকে স্থানীয় সরকারসহ কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের পুনর্গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। কমিটির সুপারিশগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রশাসনের সব পর্যায়ে গণতন্ত্রায়ণ; নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারে ক্ষমতা প্রত্যপর্ণ; জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা; থানাকে প্রশাসনের মূল ইউনিটে পরিণত এবং মহাকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তর করা। তত্কালীন আওয়ামী লীগ সরকার এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ১৯৭৬ সালে গঠিত হয় পে অ্যান্ড সার্ভিসেস কমিশন। সার্ভিস কাঠামোর ব্যাপারে এ কমিশনের সুপারিশগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সুপারিশ ছিল (ক) সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ২৯টি ক্যাডার সার্ভিস প্রবর্তন; এবং (খ) সরকারি নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে সব ক্যাডারের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিনিয়র সার্ভিস পুল (এসএসপি) গঠন। কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে সরকার ১৯৮০ সালের ১ সেপ্টেম্বর মূল ১৪টি ক্যাডারসহ ২৯টি সার্ভিস ক্যাডার সৃষ্টির আদেশ জারি করে। তার আগে সরকার ১৯৭৯ সালের ২৩ আগস্টের এক আদেশে এসএসপি গঠন করে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিস হতে এসএসপিতে সদস্য অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ থাকলেও এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগটি ছিল তা হলো, জনপ্রশাসনে এলিটিজম সৃষ্টি করা। এসএসপি ১০ বছর কার্যকর ছিল। এরশাদের জাতীয় পার্টি সরকারের আমলে ১৯৮৯ সালের ১৭ জুলাইয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এসএসপি বাতিল করা হয়।
১৯৮২ সালের মার্চে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পর পরই জেনারেল এরশাদ প্রশাসনিক সংস্কারে দুটি কমিটি গঠন করেন। এর একটি হলো মার্শাল 'ল কমিটি এবং অন্যটি প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটি। কার্যপরিধির আলোকে মার্শাল 'ল কমিটি যেসব সুপারিশ পেশ করে সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা এবং বেসামরিক কর্মচারী বিশেষ করে নিম্নপর্যায়ের কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করা; প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু বাংলাদেশ সচিবালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপগুলো কমানো; সচিবালয় ও অন্যান্য নির্বাহী সংস্থাগুলোর কাজ ঢেলে সাজানো; নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর বিধিবিধানুগ ও নিয়মিতকরণ। সচিবালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপগুলো কমানো ব্যতীত কমিটির অন্যান্য সুপারিশ সরকার গ্রহণ করে।

প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশগুলোর মধ্যে ছিল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত একজন প্রধান নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং প্রতিনিধি পরিষদ থাকবে। পরিষদের ওপর ন্যস্ত থাকবে সংশ্লিষ্ট স্তরের সব কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ ও কর্মচারীদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব; জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হবে; প্রশাসনিক স্তর হিসেবে মহাকুমা ও বিভাগকে বাতিল করা হবে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণের জন্য গঠিত হয় ন্যাশনাল ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম/ রি-অর্গানাইজেশন (নিকার)। তাদের সুপারিশে স্থানীয় পর্যায়ে সৃষ্টি হয় উপজেলা প্রশাসন। ১৯৮৮ সালে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইনের মাধ্যমে জেলা পরিষদ পুনর্গঠিত হলেও নির্বাচিত চেয়ারম্যানের স্থলে সরকার কর্তৃক চেয়ারম্যান নিয়োগের বিধান করা হয়, যা ছিল কমিটির সুপারিশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি সরকারের পতন হয়। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর উপজেলা পদ্ধতি বাতিল করে। সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অন্য দুটি বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ

সংশোধনীর মাধ্যমে বিএনপি নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি (নবম সংসদ মেয়াদে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের আমলে ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিলকৃত) প্রবর্তন করে। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপির শাসনামলে (১৯৯১-৯৬ এবং ২০০১-২০০৬) কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় সরকার প্রশাসন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য আর কোনো সংস্কার আনা হয়নি।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় এসে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ পাস করে। তাছাড়া এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৮ সালে প্রণীত স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন বাতিল করে জেলা পরিষদ আইন ২০০০ পাস করে। তবে ওই মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার আইন দুটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়নি। নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৮ সালের ৩০ জুন উপজেলা পরিষদ সংক্রান্ত সব আইন বাতিল করে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ জারি করা হয় এবং তা তাত্ক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়। এ অধ্যাদেশের অধীনে ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ রহিত করে উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন ২০০৯ পাস করে। অধ্যাদেশটির অধীনে তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় আইনগত শূন্যতা এড়াতে ২০০৯ সালের আইনটিকে ৩০ জুন ২০০৮ তারিখ থেকে কার্যকারিতা দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ১৯৯৮/২০০৯ সালে প্রণীত উপজেলা পরিষদ আইনে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা এবং তার পরামর্শ গ্রহণ পরিষদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে পরিষদের ওপর সংসদ সদস্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও চেয়ারম্যানের মধ্যে দ্বন্দ্বের খবর গণমাধ্যমে প্রায়ই প্রকাশ হয়। অন্যদিকে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মধ্যে সখ্য গড়ে ওঠার খবর পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য সূত্রে প্রায়ই পাওয়া যায়। এসবের ফলে অনেক উপজেলায় প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় শৃঙ্খলা ব্যাহত হচ্ছে।
২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে জেলা পরিষদ আইন ২০০০ মোতাবেক জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য বিধি প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ২০১১ সালের ডিসেম্বরে তিনটি পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি বাদে অন্য ৬১টি জেলা পরিষদে দলীয় ব্যক্তিদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়। ফলে জেলা পরিষদ প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় প্রশাসনে পদোন্নতি ও পদায়নে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার খবর প্রায়ই প্রকাশিত হচ্ছে। তবে এ ধরনের অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা নতুন নয়। স্বাধীনতার পর থেকে আশির দশকের শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সচিবালয়ের উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদগুলোয় নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যাপারে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হলেও বিএনপির শাসনামলে ১৯৯২ সালে এসব পদে পদোন্নতিতে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। অনেকের মতে, প্রশাসনকে দলীয়করণেরও এটি ছিল প্রথম সুপরিকল্পিত বড় পদক্ষেপ। তবে কেউ কেউ মনে করেন, স্বাধীনতার পর পরই তত্কালীন আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে বিপুলসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাকে ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য পদে চাকরি প্রদান ছিল প্রশাসনকে দলীয়করণের প্রথম পদক্ষেপ।

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এইচএম এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের এক বছর পার না হতেই প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিএনপির প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করতে এবং পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের সময় তা কাজে লাগাতে ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকার বাংলাদেশ সচিবালয়ের উপসচিব, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে সাতশর বেশি কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়। একসঙ্গে সচিবালয়ে উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে এত বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তাকে এর আগে পদোন্নতি প্রদানের নজির ছিল না। দলীয়করণের অভিযোগ ছাড়াও পত্রপত্রিকায় এ পদোন্নতিকে ‘গণপদোন্নতি’ বলে অভিহিত করা হয়। শূন্যপদ ব্যতীত পদোন্নতি দেয়া যায় না, প্রশাসনিক অঙ্গনে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত এ নিয়মটির ব্যত্যয় ঘটানো হয়।

১৯৯২ সালে বিএনপি প্রয়োজনীয় শূন্যপদ ছাড়াই অনেকটা ‘গণপদোন্নতির’ যে নজির সৃষ্টি করে, ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ তা যত্নসহকারে অনুসরণ করে। পরবর্তীতে বিএনপি বা আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় এসেছে, তখন তারা উভয়ে শূন্যপদ ছাড়া দলীয় স্বার্থে পদোন্নতি প্রদান ও প্রশাসনে দলীয়করণের গতি আরো জোরদার করেছে।
আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনী মেনিফেস্টোয় প্রশাসনকে নির্দলীয় ও গণমুখী করার অঙ্গীকার করে। মেনিফেস্টোয় বলা হয়, চাকরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতির মাপকাঠি হবে মেধা, দক্ষতা ও জ্যেষ্ঠতা। প্রশাসন ব্যবস্থায় সংস্কার আনা হবে। প্রশাসনে গতিশীলতা আনয়ন এবং জনসেবার মানোন্নয়নে একটি কার্যকর সিভিল সার্ভিসের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়নের কথা বলতে শুরু করে। দেশের শাসন

ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি কার্যকর সিভিল সার্ভিসের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে একটি শক্তিশালী সিভিল সার্ভিস গঠনের ওপর ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক (২০১১-১৫) পরিকল্পনায় জোর দেয়া হয়। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় বলেন, 'জনপ্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে। আমরা সংস্কারমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। সিভিল সার্ভিস আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। আলোচনা, ওয়ার্কশপ এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে এটি চূড়ান্ত করা হবে।' পরবর্তী তিন অর্থবছরের অর্থাত্ ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায়ও তিনি জানান, সিভিল সার্ভিস আইনের খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে এবং সরকার এটিকে আইন হিসেবে প্রণয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আইনের খসড়া একাধিকবার প্রস্তুত করা হলেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) সেটি শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি।

প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট বর্জিত ৫ জানুয়ারির একতরফা সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের পর গঠিত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার জনপ্রশাসনে শৃঙ্খলা ও গতিশীলতা আনতে সংস্কারমূলক কার্যক্রম বা সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন সম্পর্কে বক্তব্য প্রদানে বিরত রয়েছে। গত ৫ জুন ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপনকালে অর্থমন্ত্রী জনপ্রশাসনে সংস্কার আনয়ন বা সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন সম্পর্কে কোনো বক্তব্য দেননি। বাজেট বক্তৃতায় সচরাচর 'জনপ্রশাসন' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ থাকে। এবারের বাজেট বক্তৃতায় সেটিও নেই।

সংবিধানে সংসদ আইন দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণের নির্দেশনা (অনুচ্ছেদ ১৩৩) থাকলেও স্বাধীনতার ৪৩ বছরে সে আইন প্রণীত হয়নি। গত চার দশকে ক্ষমতাসীন কোনো রাজনৈতিক দল আইনটি প্রণয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। ১৯৯১-২০১৩ সময়কালে পালাক্রমে ক্ষমতায় আসীন বিএনপি ও আওয়ামী লীগ আইনটি প্রণয়নে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। আসলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কেউ চায় না মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে একটি নিরপেক্ষ ও কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে উঠুক। কারণ আইনটি প্রণীত হলে তারা ক্ষমতায় আসীন হলে ইচ্ছামতো জনপ্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম চালাতে পারবে না। তাদের উভয়ের উদ্দেশ্য হলো, দলীয়করণের মাধ্যমে প্রশাসনকে ব্যবহার করে ক্ষমতার ভিত শক্তিশালী করা। এটিই প্রশাসনে অদক্ষতা, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদির মূল কারণ।
প্রশাসনকে যুগোপযোগী করতে সংস্কারের বিকল্প নেই। স্বাধীনতার পর পরই তত্কালীন সরকার প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ নেয় এবং পরবর্তী সরকারগুলো কমবেশি সে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। ক্ষমতাসীন সরকার তাদের আগের মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) প্রশাসনিক সংস্কারের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার বাস্তবায়ন শুধু প্রশাসনিক সংস্কারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে না, বরং এর মাধ্যমে প্রশাসনকে বহুলাংশে গতিশীল ও গণমুখী করা সম্ভব হবে।
লেখক: সাবেক সচিব ও কলাম লেখক

বাংলাদেশের অর্জন

ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র দূরীকরণে তার ভূমিকা, জনবহুল দেশে নির্বাচন পরিচালনায় স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুতা আনয়ন, বৃক্ষরোপণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম নেওয়া এই বাংলাদেশকে আজকের অবস্থানে আসতে অতিক্রম করতে হয়েছে হাজারো প্রতিবন্ধকতা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত, প্রায় সর্বক্ষেত্রে অবকাঠামোবিহীন সেদিনের সেই সদ্যজাত জাতির ৪৩ বছরের অর্জনের পরিসংখ্যানও নিতান্ত অপ্রতুল নয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশুমৃত্যুহার কমানো এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের করা মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেবার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। বিশেষত শিক্ষা সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার ও জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অন্যতম।

শিক্ষাখাতে অর্জন

শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হলোশতভাগ – ঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম।ছাত্রছাত্রীর মা নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা। বর্তমান ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুন করে জাতীয়করণ করেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ছিল ৬১, বর্তমানে তা উন্নীত হয়েছে শতকরা ৯৭ভাগে। শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও ৭. মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা – নিশ্চিত করার লক্ষ্যে"শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে, গঠন করা হয়েছে শিক্ষা সহায়তা" ট্রাস্ট"।

সূত্রঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

স্বাস্থ্যসেবায় সাফল্য

শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে তার স্থান করে নিয়েছে। স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগী করতে প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা২০১১–"। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ১২ হাজার ৭৭৯টিউপজেলা (২)টি৩১২কমিউনিটি ক্লিনিক। (১) হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়। মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপতালগুলোতে ২ হাজার শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ১৯৯০ সালে নবজাতক মৃত্যুর হার ১৪৯ থেকে নেমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৫৩তেস্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যকে ।(৩) সামনে রেখে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ১২টিমেডিকেল কলেজ (৪), নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৪৭ হাজারেও বেশি জনশক্তি।

সূত্রঃ ১ , ২, ৩,৪

নারী ও শিশু উন্নয়নে অর্জন

নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা২০১১–"। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি কার্যক্রম। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে গৃহীত হয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ। প্রযুক্তি জগতে নারীদের প্রবেশকে সহজ করতে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের মতো ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যসেবায় উদ্যোক্তা হিসেবে একজন পুরুষের পাশাপাশি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে একজন নারী উদ্যোক্তাকেও। "জাতীয় শিশু নীতি২০১১–" প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকারকে। দেশের ৪০টি জেলার সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল। দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথশিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে– ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভূষিত করা হয়েছে জাতিসংঘের সাউথ–সাউথ এওয়ার্ডে।

সূত্রঃ মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন

নারীর ক্ষমতায়নে অর্জন

নারী বঞ্চনার তিক্ত অতীত পেরিয়ে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে অনেকদূর এগিয়েছে। পোশাকশিল্পে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ। আর এই শিল্পের সিংহভাগ কর্মী হচ্ছে নারী। ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। আর ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৮০এর উপর নারী। বাংলাদেশ সরকার % নানাভাবে নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় পর্যায়

থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০। দেশের সবক'টি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি ৩৭ লক্ষএবং (১) ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ৪ কোটি ৪৬ লক্ষেত হয়েছে। সেবা প্রদানউন্নী (২) প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে চালু করা হয়েছে ইপেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং।- সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। ৩জি প্রযুক্তির ম-োবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

সূত্রঃ ১, ২

কৃষিতে কৃতিত্ব এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

কৃষিখাতে অভূতপূর্ব কিছু সাফল্যের জন্য বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ বারবার আলোচিত হয়েছে।প্রায় ১৬ কোটি জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ডমাকসুদুল আলম আবিষ্কার করেছেন পাটের . জিনোম সিকুয়েন্সিং। সারা বিশ্বে আজ পর্যন্ত মাত্র ১৭ টি উদ্ভিদের জিনোম সিকুয়েন্সিং হয়েছে, তার মধ্যে ডমাকসুদ . করেছেন ৩টা। তাঁর এই অনন্য অর্জন বাংলাদেশের মানুষকে করেছে গর্বিত।

প্রবাসী শ্রমিকদের উন্নয়নে অর্জন
বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ স্থাপন করেছে অনন্য দৃষ্টান্ত। স্বল্প সুদে অভিবাসন ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করে দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে এর শাখা স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যাংকের মাধ্যমে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অভিবাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারাদেশে তৃণমূল পর্যায় থেকে বিদেশ গমনেচ্ছু জনগণকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকেও এ সেবা গ্রহণের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ছাড়াই স্বল্প ব্যয়ে মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলোতে শ্রমিকগণ যেতে পেরেছে।

জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ
১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগদানের পর এ পর্যন্ত বিশ্বের ৩৯টি দেশের ৬৪ শান্তি মিশনে খ্যাতি ও সফলতার সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ যাবৎকালে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বাগ্রে।

বিদ্যুৎখাতে সাফল্য
বিদ্যুৎখাতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে জাতীয় গ্রিডে অতিরিক্ত ৬ হাজার ৩২৩ মেগাওয়াট (১) বিদ্যুৎ সংযোজন, যার ফলে বিদ্যুতের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৭ শতাংশ থেকে ৬২ শতাংশেউন্নীত হয়েছে। একই সা (২)থে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২২০ কিলোওয়াট ঘন্টা থেকে বেড়ে ৩৪৮ কিলোওয়াটঘন্টায় দাঁড়িয়েছে। নতুন (৩) ৩৫বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে লক্ষ গ্রাহককে।নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ৬৫টি।বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৪)

সূত্রঃ ১,২, ৩,৪

শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্জন
বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের পাশাপাশি প্রসার ঘটেছে আবাসন, জাহাজ, ঔষুধ, ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্পের। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যোগ হয়েছে জাহাজ, ঔষুধ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী। বাংলাদেশের আইটি শিল্প বহির্বিশ্বে অভূতপূর্ব সুনাম কুড়িয়েছে। সম্প্রতি ২০১৩অর্থবছরে ২০১৪- বাংলাদেশের আইটি শিল্প ১০ কোটি মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় ছাড়িয়ে গেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশের অর্জন

হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি বিস্তৃত করতে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃকালীন ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৮২০০৯- সালে এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা, বর্তমানে এ কার্যক্রমে বরাদ্দের পরিমাণ ২৫ হাজার ৩৭১ কোটিব্যয় জরিপ-টাকা। খানা আয় (১), ২০১০ এর সমীক্ষায় দেখা গেছে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪সামাজিক %৫. নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতাভুক্ত হয়েছে।

সূত্রঃ ১

ভূমি ব্যবস্থাপনায় অর্জন

ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে মোট ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত হয়েছে "কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১২ এর খসড়া"।

মন্দা মোকাবেলায় সাফল্য

মন্দার প্রকোপে বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন বিপর্যস্ত ছিল বাংলাদেশ তখন বিভিন্ন উপযুক্ত প্রণোদনা প্যাকেজ ও নীতি সহায়তার মাধ্যমে মন্দা মোকাবেলায় সক্ষমই শুধু হয়নি, জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৬ শতাংশের বেশি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথ ধারার বিপরীতে আমদানিরপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি- বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে রেমিট্যান্সের পরিমাণ। ঋণ পরিশোধে সক্ষমতার মানদণ্ডে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা অর্জিত হয়েছে।

সূত্রঃ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

তথ্যসুত্রজাতীয় তথ্য বাতায়ন :

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাফল্য

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দেশ যেসব সাফল্য অর্জন করেছে তা দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশই করতে পারেনি। এটি নিঃসন্দেহে আমরা যারা দেশকে ভালোবাসি তাদের জন্য অবশ্যই গৌরবের। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগোযোগ ভৌত অবকাঠামো বিদ্যুত, জ্বালানী খনিজসম্পদ, নারীর ক্ষমতায়ন বড় বড় দুইটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার পর সদ্য সমাপ্ত অর্থবৎসরে ৬.০৩ জিডিপি অর্জনস, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ২ হাজার দুইশত কোটি ইউএস ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভসহ প্রায় প্রত্যেকটি সূচকেই যে সাফল্য অর্জন করেছে তা সত্যি প্রশংসার দাবিদার। এই প্রেক্ষিতে দেশি-বিদেশী অনেক অর্থনীতিবিদ, বিশ্বব্যাংক জাতিসংঘ, বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা মনে করছেন যে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার সম্ভবনা খুবই উজ্জল। সেই কারণেই হয়তো জাতিসংঘ এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করে বাংলাদেশকে মডেল হিসেবে তুলে ধরতে চায় জাতিসংঘ। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে সাফল্যের কারণে জাতিসংঘের কাছে বাংলাদেশের গুরুত্ব বেড়েছে। এজন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মডেল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকেই বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে চায় জাতিসংঘ। এই লক্ষ্যে এবারের জাতিসংঘ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের অধীন তিনটি সংস্থা হতে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘের স্বাস্থ্য, শান্তিরক্ষী মিশন ও জলবায়ু বিষয়ক সংস্থা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রের বরাত দিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে জাতিসংঘের কাছে বাংলাদেশের গুরুত্ব যে বেড়েছে এসব তা বিভিন্ন সংবাদপত্র ও মিডিয়ায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকেই অনুমান করা যায়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এমডিজি অর্জনেও সফল হয়েছে। এ ছাড়া চলতি বছর মানব উন্নয়ন সূচকে আরও এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। শিশুমৃত্যু হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ এমডিজি পুরস্কার পেয়েছে। এই সময়ে শিশুমৃত্যুর হার কমেছে, গড় আয়ু বেড়েছে এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে দারুণ অগ্রগতি হয়েছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ‘ই-স্বাস্থ্য’ সেবা চালু করায় সরকারের জাতিসংঘের ‘সাউথ সাউথ’ পুরস্কার পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই কারণেই জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থার অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এমডিজির সাতটি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পথে বাংলাদেশ। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, শিক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশের সাফল্য এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে রয়েছে। আগামী ২০১৫ সালের আগেই এমডিজির সব লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে চায় বর্তমান সরকার। উন্নয়ন অগ্রগতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০১০ সালে শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে সাফল্য অর্জন করায় জাতিসংঘ এমডিজি পুরস্কার পেয়েছে। ২০১১ সালে স্বাস্থ্য খাতে গুণগত মান উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করায় আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন, জাতিসংঘের আফ্রিকা-সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কমিশন যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সাউথ সাউথ পুরস্কার প্রদান করে।

বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের এখন প্রায় ৮ হাজার ৭শ’ সদস্য রয়েছেন। বিশেষ করে দক্ষিণ সুদান ও কঙ্গোতে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা খুবই সফলভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ যে কোন পরিস্থিতিতেই এখান থেকে ৬০ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে জাতিসংঘে সেনা সদস্য পাঠাতে সক্ষম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শান্তিরক্ষী মিশনে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশের ১২২ সদস্য নিহত হয়েছেন। সম্প্রতি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বিভাগের মহাসচিব হার্ভে লাডসুস বাংলাদেশ সফর করেছেন। সফরকালে তিনি গত কয়েক দশক ধরে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর অসাধারণ ভূমিকা, কর্ম দক্ষতা ও পেশাগত আচরণের গভীর প্রশংসাও করেন।

জাতিসংঘের আসন্ন সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশে গরিব মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনা, জঙ্গী ও সন্ত্রাস দমন, নারীর ক্ষমতায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও এমডিজি অর্জনে সরকারের সাফল্য তুলে ধরা হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা, আন্তর্জাতিক অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, স্বল্পোন্নত দেশের সমস্যা, বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব, ইরাক ও ফিলিস্তিন সঙ্কটের মতো আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা হবে।

জিইডি প্রতিবেদনে তথ্য মোতাবেক আমাদের প্রিয় দেশ বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ম্ভর। অচিরেই বাংলাদেশ চাল রপ্তানী দেশে পরিনত হবে। শুধু চালই নয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে মাংস ও ডিমের ক্ষেত্রেও ১৮ আগস্ট দৈনিক জনকন্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে বর্তমানে উদ্বৃত্ত চালের পরিমাণ ৭ দশমিক ৬ মিলিয়ন মেট্রিকটন। সদ্যসমাপ্ত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩ দশমিক ৯৭ মিলিয়ন মেট্রিকটন (প্রায় ৪০ লাখ টন) চাল ইচ্ছে করলেই রফতানি করা যায়। সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ হবে চাল রফতানিকারক দেশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে দেশে চালের উৎপাদন ছিল ২৬ দশমিক ৫ মিলিয়ন মেট্রিকটন। সরকার গত মেয়াদে দায়িত্ব নেয়ার পর ২০০৮-০৯ অর্থবছরে চাল উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ৩১ দশমিক ৩২ মিলিয়ন মেট্রিকটনে। ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ উভয় অর্থবছরে ৩৩ মিলিয়ন মেট্রিকটনের বেশি চাল উৎপাদন হয়, যা ছিল দেশের ইতিহাসে রেকর্ড।

অন্যদিকে শুধু চালের উৎপাদন নয়, মাংস এবং ডিমের ক্ষেত্রেও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে। দেশী চাহিদার অনেক বেশি উৎপাদন হচ্ছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পোল্ট্রি শিল্প সমন্বয় কমিটি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বিষয়ে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. শামসুল আলম জনকন্ঠকে বলেন, গত পাঁচ বছর মেয়াদকালে সরকার দক্ষতার সঙ্গে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করে। এ সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান বিষয় যেমন মোট দেশজ আয়, কর্মসংস্থান, রেমিটেন্স বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি হ্রাস, সামাজিক খাতের দারিদ্র্য নিরসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু নিরাপত্তায় অগ্রগতি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে ব্যাপক সাফল্য এসেছে। সেই ধারাবাহিকতায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। কৃষি সরকারে ভর্তুকি, কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি হস্তান্তর, কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করে তোলাসহ নানা উদ্যোগের ফলই হচ্ছে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

এ অর্জন এমনি এমনি অর্জিত হয়নি এ সাফল্য অর্জন করতে কৃষি উপকরণে বিপুল ভর্তুকি দিতে হয়েছে সরকারকে। এ সময়ে প্রায় ১ কোটি ৪৪ লাখ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খুলেছেন ৯৫ লাখেরও বেশি কৃষক। বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেনি, বর্তমানে উদ্বৃত্ত চালের পরিমাণ ৭ দশমিক ৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ হবে চাল রফতানিকারক দেশ।

শেষ করবো এই বলেই শেখ হাসিনা সরকারের অব্যাহত ভর্তুকির কারণেই এসব সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে ভর্তুকি ধরা হয়েছিল ২৮ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে কৃষি খাতে বকেয়াসহ ৯ হাজার, বিদ্যুত খাতে সাড়ে ৫ হাজার, জ্বালানি খাতে ৭ হাজার ৯৫০, খাদ্য খাতে ১ হাজার ৭৫৯, রফতানি খাতে ২ হাজার ৭৫০ ও অন্যান্য খাতে ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গত চার-পাঁচ বছরে কৃষি খাতে মোট ভর্তুকি দেয়া হয়েছে ৩২ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে শীঘ্রই আমাদের দেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে এ কথা অনেকটাই জোর দিয়ে বলা যায়।

"উদীয়মান ব্যাঘ্র, বাংলাদেশ"- ব্যাখা করুন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জন ও অর্থনীতির সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি + বাংলা ২য় পত্র
সম্ভাব্য প্রশ্ন:
১। গোল্ডম্যান স্যাকস এর Next-11 দেশ বলতে কি বুঝেন? বাংলাদেশকে উদীয়মান অর্থনৈতিক দেশের তালিকায় বিবেচনা করার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করুন।
২। "উদীয়মান ব্যাঘ্র, বাংলাদেশ"- ব্যাখা করুন। বাংলাদেশকে উদীয়মান বাজার বলার কারনসমূহ উল্লেখ করুন।
৩। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জন ও অর্থনীতির সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করুন। অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে করণীয় সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত উল্লেখ করুন।
৪। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন। রপ্তানি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিস্থিতির আলোকে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে মূল্যায়ন করুন।
৫। বাংলাদেশের অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৬। দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের/ প্রবাসী আয়ের ভূমিকা ও সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ উল্লেখ করুন।
৭। পরিকল্পনা কমিশন কী? এর গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন। অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা উল্লেখ (সমালোচনা) করুন। (৩৪ তম বিসিএস) = (Next Post)

সম্পর্কিত বিষয় (Related Topics): সিলেবাসে একাধিকবার উল্লেখকৃত ।
বাংলাদেশ বিষয়াবলি = Economy of Bangladesh particular emphasis on developments including Poverty Alleviation, Vision- 2021, Globalization and Bangladesh.
বাংলা ২য় পত্র = রচনা (৪০ নম্বর)

******** উদীয়মান অর্থনৈতিক দেশের তালিকায় বাংলাদেশ *********

একটা সময় বৈশ্বিক অর্থনীতির ৮০ শতাংশই ছিল ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও জাপানের দখলে। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতির চেহারা এখন বদলে যাচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ পেছন থেকে সামনের কাতারে উঠে এসেছে। একসময় যে বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলা হয়েছিল, সে দেশই এখন উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসাবে আত্ম প্রকাশ করতে যাচ্ছে।
স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি যতদূর এগিয়েছে তার চেয়ে বেশি অগ্রসর হবে সামনের দিনগুলোতে। সামনের দিনগুলো বাংলাদেশের জন্য যতটা চ্যালেঞ্জের ততটাই সম্ভাবনাময়। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার কিছু সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ মুহূর্তে বাংলাদেশের অর্থনীতি ইতিবাচক ধারায় রয়েছে এবং দেশটি এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশে পরিণত হচ্ছে। বিশেষ করে বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য বাংলাদেশ একটি আকর্ষণীয় বাজার হয়ে উঠছে।

জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় এর গবেষণা ও জরিপ:
জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক ‘আইএফও ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক রিসার্চ’ সম্প্রতি বিশ্বের ১২০টি দেশের সহস্রাধিক অর্থনীতিবিদের অনুসন্ধানী তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা এক জরিপে বলা হয়েছে, এশিয়ার প্রধান উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এতে বলা হয়, হংকং, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কার পথে এগিয়ে যাচ্ছে সমুদ্র তীরবর্তী বাংলাদেশের অর্থনীতি। ওই জরিপে দেখানো হয়, আইএমএফের হিসাব অনুযায়ী যদি ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পরিমাপ করা হয় তবে দেখা যায় বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্বের ৪৪তম বৃহৎ অর্থনীতি।

কোফেস এর দশ উদীয়মান দেশের তালিকায় বাংলাদেশ:
উদীয়মান অর্থনীতির ১০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে রেখেছে ফ্রান্সের আর্থিক ও বীমা প্রতিষ্ঠান ফ্রেঞ্চ ইনস্যুরেন্স কম্পানি ফর ফরেন ট্রেড বা কোফেস। মতে, ব্রিকসভুক্ত পাঁচটি দেশের অর্থনীতির গতি কমছে। আর বাংলাদেশসহ ১০টি দেশ তাদের জায়গা দখলের পথে এগোচ্ছে। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে বছরে ৬ শতাংশের বেশি মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে।

ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা- এ পাঁচটি দেশের নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে ব্রিকস প্রত্যয়টি তৈরি হয়েছে। এ দেশগুলো অর্থনীতিতে শক্তিশালী অবস্থান তৈরিতে সমর্থ হয়েছে। তবে উদীয়মান দেশের তালিকায় দুই ভাগে ১০টি দেশকে রেখে কোফেস বলেছে, ব্রিকসভুক্ত দেশগুলো নানা সমস্যায় ভুগছে। অন্যদিকে উদীয়মান ১০ দেশ তাদের উন্নতির গতিকে এগিয়ে রেখেছে। প্রতিষ্ঠানটি ব্রিকসের আদলে ওই দেশগুলোর নাম দিয়েছে ‘পিপিকস’। তাদের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, নতুন তালিকার উদীয়মান দেশগুলোর গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ২.৮ শতাংশ, যা ব্রিকসভুক্ত দেশগুলোর চেয়ে কম। তাদের রাষ্ট্রীয় ঋণও ব্রিকস দেশগুলোর চেয়ে কম। ব্রিকস দেশগুলো তাদের পণ্য রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাচ্ছে। তবে নতুন উদীয়মান দেশগুলোর জনসংখ্যা ও অর্থনীতির আকার ২০০১ সালের ব্রিকস দেশগুলোর চেয়ে কম বলেও জানিয়েছে কোফেস।

******* গোল্ডম্যান স্যাকস এর Next-11 দেশ *******
২০০৫ সালে আমেরিকার আর্থিক প্রতিষ্ঠান (বিনিয়োগ ব্যাংক) গোল্ডম্যান স্যাক্সের অর্থনীতিবিদ জিম ও'নেইল ব্রিকসের ধারণা দিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ব্রিকস ছাড়াও সম্ভাবনাময় বা ব্রিকস সদস্যভুক্ত দেশের পরে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হবে এমন ১১টি দেশকে বলা হয় 'নেক্সট ইলেভেন'। এ দেশগুলো হচ্ছে-বাংলাদেশ, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক ও ভিয়েতনাম।

********** *বিশ্বব্যাংক **********
* বৈশ্বিক অর্থনীতির মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল গতিশীল। এ কারণে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে চিহ্নিত করেছে ‘অমীমাংসিত বিস্ময়’ হিসেবে।
* বিশ্বব্যাংক মনে করে, মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হলে বাংলাদশের মোট দেশজ উত্পাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ এবং প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।
* বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন এ বলা হয় বিশ্বে যে গুটিকয়েক দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অগ্রগণ্য।

********** উদীয়মান ব্যাঘ্র, বাংলাদেশ! **********
* সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদুত ড্যান ডব্লিউ মজীনা বলেছেন, অর্থনীতিতে এক সময় বাংলাদেশ সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে আবির্ভুত হতে পারে। হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার ইমার্জিং টাইগার।
* নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের সাফল্যেও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।
* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বলছে, ২০৩০ সাল নাগাদ নেক্সট ইলেভেন সম্মিলিতভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশকে ছাড়িয়ে যাবে।
* সম্প্রতি যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বিশ্ব বিখ্যাত 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকার 'নিউ ওয়েভ ইকোনমিজ গোয়িং ফর গ্রোথ' শীর্ষক সংবাদে বলা হয়, ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতি পশ্চিমা দেশগুলোকেও ছাড়িয়ে যাবে।

********** উদীয়মান বাজার হবার কারন **********
উদীয়মান বাজার হিসেবে উঠে আসার পেছনে জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে,
১। স্বালানি সমৃদ্ধি
২। শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহন ও শ্রমের মুল্য বৃদ্ধি
৩। তুলনামূলক শ্রমমূল্যের নিম্নহার
৪। বাণিজ্য সুবিধার বিষয়। বাংলাদশের অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে তৈরি পোশাক রফতানি। বাংলাদশের তৈরি পোশাক রফতানি আয়েরপ্রায় ৮০ শতাংশ আসছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকে।
৫। বাংলাদেশীদের পাঠানো রেমিটেন্স অর্থনীতিকে শক্তিশালী অবস্থানে ধরে রেখেছে। রেমিট্যান্সই বাংলাদশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার টেকসই ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করছে।

**********বাংলাদেশের অর্থনীতির অর্জন **********
১। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অনেক। ৪০ বছরে কৃষিতে, শিল্প ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে।
২। বিশ্বমন্দার পর থেকে এ পর্যন্ত ভাল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশের মধ্যে শীর্ষ কাতারে রয়েছে বাংলাদেশ।
৩। তৈরি পোশাক রফতানি আয়ে চীনের পরেই আমরা অর্থাৎ দ্বিতীয় বৃহত্তম।
৪। বিগত সময়ে দেশে বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স এসেছে। এটা অর্থনীতির জন্য সুসংবাদ। এই অর্জন আমাদের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক।

********** বাংলাদেশের অর্থনীতির সম্ভাবনা *********
আন্তর্জাতিক সংস্থার পর্যবেক্ষণ অনুসারে অর্থনৈতিক বিবেচনায় বিশ্বের ১১টি উদীয়মান দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ কয়েকটি সূচকে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। ফলে বিশ্ব ব্যবস্থা নানা ইস্যুতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোটা দাগে ৭টি সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলো হল-

১। অভ্যন্তরীণ চাহিদা:বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার বড় কোনো প্রভাব পড়েনি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে। কারণ বাংলাদেশে বড় একটি বাজার রয়েছে। বর্তমানে দেশে জনসংখ্যা ১৫ কোটি ছাড়িয়েছে। এসব মানুষের নিত্যপণ্যসহ বেশ কিছু পণ্যের চাহিদা রয়েছে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তারা এ দেশে বিনিয়োগ করছে। গত ১০ বছর পর্যন্ত দেশের প্রবৃদ্ধি প্রায় ৬ শতাংশ। মাথা পিছু আয় ৪ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ছে। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছে দেশ।

২। কর্মক্ষম জনসংখ্যা: দেশের জনসংখ্যার বেশির ভাগই ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা বেশি। এতে কমমূল্যে শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে। এ কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সহজ হবে।

৩। কৃষি খাতের সাফল্য: কৃষি খাতের সাফল্য আমাদের আশার আলো দেখায়। কৃষকরা সচেতন। কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। ফলে জনসংখ্যার কারণে প্রতি বছর জমির পরিমাণ কমলেও প্রতি বছরই ফসল উৎপাদন বাড়ছে। বর্তমানে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি।

৪। শিল্প খাতের উন্নয়ন: শিল্প খাতে প্রতি বছরই নতুন উদ্যোক্তা আসছে। এদের বেশির ভাগ তরুণ। এরা বিদেশ থেকে লেখাপড়া করে আসছে। ফলে আগের শিল্পপতিদের তুলনায় এদের দক্ষতা বেশি।

৫। সেবা খাতের উন্নয়ন: আমাদের সেবা খাত প্রতিদিন এগিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। বিশেষ করে তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতির কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়েছে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসছে।

৬। শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। একদিকে উৎপাদন বাড়ছে। অপরদিকে সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি হচ্ছে। শ্রমবাজারে নারী এলেই তারা সচেতন হয়ে যাচ্ছে। এতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ, বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক প্রথা কমে আসাসহ একটি শৃংখলার মধ্যে চলে আসছে সমাজ।

৭। রেমিট্যান্সের ভূমিকা: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। প্রবাসীরা প্রতি বছর প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছে। এর ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল থাকছে।

********** সম্ভাবনা কাজে লাগাতে করণীয় **********
এসব অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে ৪টি বিষয় অত্যন্ত জরুরি। এগুলো হল-

১। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা: একটি দেশের অর্থনীতি দাঁড়াতে হলে সবার আগে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ দেশ অস্থির থাকলে কেউ বিনিয়োগ করতে আসবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা জরুরি। তাদের প্রতিশ্র“তি দিতে হবে মতামত ভিন্ন মত থাকুক, দেশের অর্থনীতির স্বার্থে সবাই একমত থাকবে।

২। অবকাঠামো উন্নয়ন: বিশ্বের যে দেশই অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হয়েছে, আগে অবকাঠামো উন্নত করা হয়েছে। অর্থাৎ শিল্পায়নের পূর্বশর্ত অবকাঠামো। রাস্তাঘাট, গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং নীতি-সহায়তা না পেলে কেউ বিনিয়োগ করতে আসবে না।

৩। দুর্নীতি রোধ: অর্থনীতিতে এগিয়ে গেলেও দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশের ইমেজ সংকট রয়েছে। যতটুকু উন্নতি দৃশ্যমান, দুর্নীতি কমলে তা বহুগুণ বেড়ে যেত। আর দুর্নীতি রোধ করতে হলে একদিকে প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতে হবে। অপরদিকে প্রশাসনকে রাজনীতি মুক্ত রাখতে হবে। কারণ দুর্নীতিবাজরা মনে করে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে তাদের বিচার হবে না। এ ধারণা যতদিন থাকবে, ততদিন দুর্নীতি কমবে না।

৪। কর্মমুখী শিক্ষা: আমাদের শিক্ষার হার বেড়েছে, কিন্তু মান বাড়েনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা কর্মসংস্থানে কোনো কাজে লাগছে না। ফলে দেশের বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে সিলেবাস তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বলতে হবে কী ধরনের শিক্ষা চাই।

সামগ্রিকভাবে সরকারি এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে আরও সমন্বয় জরুরি। সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য অর্থনীতিতে নতুন কিছু চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিলে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, দেশের অর্থনীতি ঝুঁকিতে। তবে রাজনীতি স্থিতিশীল হলে ৬ মাস থেকে এক বছরের মধ্যে তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

****** রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও স্বল্পমেয়াদি বিশ্লেষণ *****
রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বিদায়ী সালে দেশের অর্থনীতি একেবারে বিপর্যস্ত না হলেও ভালো কিছু দিতে পারেনি। এ সময়ে অর্থনীতির মৌলিক ৯টি সূচকের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আর আমদানিতে কিছুটা প্রবৃদ্ধি ছাড়া বাকি ৭টি সূচক ছিল নেতিবাচক। জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রফতানি, রেমিট্যান্স, সরকারের রাজস্ব আয়, বৈদেশিক সহায়তা, বিনিয়োগ, মূল্যস্ফীতি, শেয়ারবাজার এবং আর্থিক খাতসহ সবকিছুতেই নেতিবাচক অবস্থা। শেয়ারবাজার বেশ নিম্নমুখী। নতুন কিছু কোম্পানি এলেও সূচকে তার প্রভাব পড়েনি। আমদানি বাড়লেও বিভিন্ন সূত্র থেকে বলা হচ্ছে, ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে বিদেশে টাকা পাচার হচ্ছে। ইতিমধ্যে পোশাক খাতের বেশ কিছু অর্ডার ভারতে চলে গেছে। এ ছাড়া সরকারি অর্থের যে উৎস, সেখানেও সুখবর নেই। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আয়ের গতি সন্তোষজনক নয়। এ অবস্থায় তীব্র রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে নতুন বছরের পথ চলা শুরু হয়। ফলে সামগ্রিক বিবেচনায় অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়তে পারে নতুন অর্থবছরের অর্থনীতি। তাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অতীব প্রয়োজন।

********** দেশের অর্থনীতিকে মূল্যায়ন **********
বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট’ প্রতিবেদনে দেশের অর্থনীতিকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে মূল্যস্ফীতি, রাজস্ব পরিস্থিতি, রপ্তানি, বহিঃখাতের ভারসাম্য, সুদের হার, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), বাজেট ঘাটতিসহ বিভিন্ন খাতের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

* প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ছয় শতাংশের ঘরে আটকে গেছে। এর কারণ, কর্মক্ষম উচ্চ জনসংখ্যা বা জনসংখ্যা বোনাসের যথাযথ সুবিধা নিতে পারছে না বাংলাদেশ। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ৩৩ দশমিক ৭ শতাংশ। এটি জাপানের সমান হলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি দশমিক ৭ শতাংশ পয়েন্ট বাড়ত।

* আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যমূল্যের দাম কমে যাওয়ায় খাদ্য উপখাতে মূল্যস্ফীতি কমেছে। আর বিনিময় হার ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনার কারণে খাদ্যবহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে আছে।

* যে রপ্তানিকারকেরা ইউরোপের বাজারে ডলারে ব্যবসা করেন, তাঁরা দাম কম পাচ্ছেন। কারণ ডলারের বিপরীতে টাকার দাম এক বছরে সাড়ে ১৭ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এটি রপ্তানিকারকদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

* এ ছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতায় কর আদায় বিঘ্নিত হয়েছে। করপোরেট কর হার কমানো, সম্পূরক শুল্ক হার হ্রাস, তৈরি পোশাক খাত ও বেশ কিছু রপ্তানি খাতকে কর ছাড় দেওয়ায় এবার রাজস্ব আদায়ে কিছুটা শ্লথগতি রয়েছে।

* ২০১৬ সালের জুলাই মাস থেকে নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন বাস্তবায়ন করা হলে কর ও জিডিপি অনুপাত ১০ থেকে সাড়ে ১০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক। বর্তমানে কর ও জিডিপি অনুপাত মাত্র সাড়ে ৮ শতাংশ।

* আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমে যাওয়া যাওয়ায় প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) লাভের মুখ দেখেছে। এটি বাজেট ঘাটতি কমাতে সহায়তা করছে।

* বাংলাদেশে সুদের হার অস্বাভাবিক রকমের বেশি নয় বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক। বাজারে যে পরিমাণ তারল্য রয়েছে, সে অনুযায়ী সুদের হার কমেনি। এ ছাড়া পরিচালন ব্যয় বিশেষ করে গ্রামে ব্যাংকের শাখা স্থাপন করলে, তুলনামূলক কম বিনিয়োগ ফিরে আসে। এটাও সুদের হার না কমার অন্যতম কারণ। সুদের হার কমাতে বিশ্বব্যাংক তিনটি সুপারিশ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে মূল্যস্ফীতি কমানো, খেলাপি ঋণে কমাতে তদারকি বাড়ানো এবং বাজারভিত্তিক সঞ্চয়পত্রের সুদের হার নির্ধারণ করা।

বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, মধ্য আয়ের দেশ হতে বাংলাদেশ কিছুটা স্বস্তির জায়গায় আছে। তবে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বিনিয়োগের অনুপাত ৩৩-৩৪ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। এ ছাড়া শ্রমঘন উৎপাদনশীলতার দিকে বেশি মনোযোগী হতে হবে। বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থানের দিকে জোর দিতে হবে। এখনো কর্মসংস্থানের দিক থেকে পুরুষেরা অনেক এগিয়ে আছে।

********** রফতানি বাণিজ্য পরিস্থিতি **********
প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে বাংলাদেশের জন্য ২০৩০ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রই হবে রফতানির প্রধান বাজার। অক্সফোর্ড ইকোনমিকসের সহায়তায় সম্প্রতি এইচএসবিসি গ্লোবাল কানেকশন রিপোর্টে ১৮০ দেশের আমদানি-রফতানির তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের শীর্ষ পাঁচ রফতানি বাজার হলো যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও কানাডা। ২০৩০ সালে গিয়ে শীর্ষ তিনটি দেশের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে।

বাংলাদেশ যদি রফতানির জন্য ভারতকে নতুন বাজার হিসেবে পায়, তবে তা ইতিবাচক। স্বাভাবিকভাবে আমরা ভারতে মূল পণ্যের চেয়ে আনুষঙ্গিক পণ্য বেশি রফতানি করি। বাংলাদেশের প্রধান রফতানি পণ্য তৈরি পোশাক রফতানিও চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। যদিও নিটওয়্যারের প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমেছে। রফতানি পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত খবরটি হলো পাটের ব্যাগ ও বস্তার রফতানি বেড়েছে ১৪ শতাংশ। বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনও পর্যন্ত তৈরি পোশাক রফতানির ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ বাংলাদেশী তৈরি পোশাকের বড় দুটি আমদানিকারক। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানির যথাক্রমে ৫১ ও ২২ শতাংশ যায় ওই দুটি দেশে। এ দুটি দেশ ছাড়া তৈরি পোশাক রফতানির নতুন বাজার প্রসঙ্গে ইতোমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, চিলি, চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, রাশিয়া ও তুরস্কে তৈরি পোশাক রফতানি বেড়েছে। আগামী দিনগুলোতে তৈরি পোশাক খাত বহুদূর এগিয়ে যাবে। অন্তত শীর্ষস্থানীয় পঞ্চাশ দেশে এ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি হবে।

********** বিনিয়োগ পরিস্থিতি **********
নতুন বিনিয়োগ (গ্রীনফিল্ড ইনভেস্টমেন্ট) পরিস্থিতি ভাল করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সরকার। দেশে কর্মরত পুরনো কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগ করেছে বলে মোট বিদেশী বিনিয়োগ বেশি দেখা যাচ্ছে, যদিও সরকার এই মুহূর্তে বৈদেশিক বিনিয়োগ নিয়ে কিছুটা হতাশ। তারপরও সম্প্রতি পৃথিবী বিখ্যাত ব্রান্ডের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ১৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে সরকার। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থেই দেশে বিদেশী বিনিয়োগের প্রয়োজন আছে। তবে তারচেয়েও জরুরী দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ ধরে রাখা। বিশেষ করে দেশের অবকাঠামোগত কিছু সমস্যার সমাধান করলে দেশী উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে ফিরে আসবে।

******* অর্থনীতিতে তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ: বিশ্বব্যাংক ******
সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ মুহূর্তে দেশের অর্থনীতিতে তিনটি বৃহৎ চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো—
১। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা,
২। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা
৩। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

********** অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ ও করণীয় **********

অফুরন্ত সম্ভাবনা থাকলেও বাংলাদেশকে নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে:
১। আফ্রিকার দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাওয়ায় ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি হ্রাস পেয়েছে।
২। অন্যান্য দেশে রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই এ মুহূর্তে নতুন রফতানি বাজার অনুসন্ধান ও ব্যাপক তৈরি পোশাক ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী রফতানি বৃদ্ধি করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ।
৩। বর্তমানে বৈদিশেক রেমিট্যান্স প্রবাহে প্রবৃদ্ধি থাকলেও ক্রমেই জনশক্তি রফতানি হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রফতানি ব্যাপক হারে হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের জনশক্তির নতুন চাহিদা সৃষ্টি করতে না পারলে মেয়াদ পূর্তির পর শ্রমিকরা দেশে ফিরে আসলে রেমিট্যান্সও কমতে শুরু করবে। তাই নতুন জনশক্তি বাজার খুঁজে বের করা অতীব জরুরী।
৪। দেশে ব্যাপক কর্মহীন জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে না পারলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা আরও বেড়ে যাবে। চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে জনশক্তি রফতানি বৃদ্ধি করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ।
৫। গ্যাস, বিদ্যুত্ ও অবকাঠামোগত খাতে উন্নতি না হওয়ায় দেশে কাঙ্ক্ষিত বৈদেশিক বিনিয়োগ আসছে না। অথচ উত্পাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশে ব্যাপক হারে বিনিয়োগ খুবই প্রয়োজন।

রাজনৈতিক অস্থিরতা, কাঠামোগত দুর্বলতা ও আন্তর্জাতিক ভঙ্গুরতা সত্বেও বাংলাদেশে টেকসই প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা থাকলেও দেশটির সম্ভাবনা অফুরন্ত। ২০২১ সালে বাংলাদেশের ৫০ বছর পূর্তি হবে। সে সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়া, ২০৩০ সালের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ছাড়িয়ে যাওয়া এবং ২০৫০ সালের মধ্যে পশ্চিমা বিশ্বকে ছাড়িয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ।

******** অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে পারে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে ******
দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে প্রধান মাধ্যম হতে পারে বৈদেশিক কর্মসংস্থান। তাই অধিক অর্জন ও সরকারের প্রায় শূন্য বিনিয়োগের খাত জনশক্তিকে এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে বর্তমানে আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে নারী কর্মীদের।

বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে একসময় বসে থাকতে হতো বাংলাদেশকে। অথচ বর্তমানে দেশের জিডিপিতে বৈদেশিক সাহায্যের ৭ গুণেরও বেশি অবদান (১২ দশমিক ১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এখন জনশক্তি খাতের। ২০১১ সালে প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো রেমিটেন্স জিডিপিতে ১৩ শতাংশ অবদান রেখেছে। এতে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ বেশি থাকলে এ অর্জন হতো দ্বিগুণেরও বেশি। এসব কারণ বিবেচনা করে সরকার জনশক্তি খাতের নারী কর্মীদের বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই কর্মী সংগ্রহকারী ও সম্ভাবনাময় দেশগুলোতে সফর করেছেন। শ্রমবাজার সম্প্রসারিত করতে উচ্চ পর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধি দল কূটনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি ও সম্পর্ক জোরদার করতে ঘুরেছেন বিভিন্ন দেশ। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী বিদেশে নারী কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

* প্রবাসী কর্মী পরিস্থিতি: সরকারি হিসেব অনুযায়ী বিশ্বের ১৪৩টি দেশে প্রায় ৮০ লাখ বাংলাদেশি কর্মী রয়েছেন। যদিও কর্মী সংখ্যা এর চেয়ে বেশি। তবে এ কর্মীর মধ্যে খুব সামান্য অংশই নারী কর্মী। এসব কর্মীদের কাছ থেকে ২০১১ সালে ১২ দশমিক ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। এই রেমিট্যান্স বৈদেশিক সাহায্যের ৭ গুণেরও বেশি।

* নারী কর্মীদের মূল্যায়ণ:জনশক্তি খাতের সবচেয়ে বেশি সঞ্চয় করেন প্রবাসী নারী কর্মীরা। তাদের সঞ্চয়ের বেশিরভাগ অর্থই দেশে আসে। আর তাদের এ অর্থ পরিবার ও দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অধিক বিনিয়োগ হিসেবে কাজ করে। এ কারণে প্রবাসী নারী কর্মীদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

* প্রবাসী কর্মীদের অর্থ পাঠাতে সরকারি উদ্যোগ: সরকার প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক খুলে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অভিবাসন ব্যয় মেটাতে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া ও দেশে সহজে রেমিটেন্স পাঠাতে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়া বিদেশে ব্যাংকের শাখা খোলা, একচেঞ্জ হাউজ স্থাপন, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠানো, অবৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠানোর ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এনজিওর মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীর রেমিটেন্স পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অর্থ পাঠাতে উৎসাহ দিতে প্রবাসীদের 'সিআইপি' ও 'বিশেষ নাগরিক সুবিধা কার্ড' প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

* অনলাইনে তথ্য যাচাই: মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, সৌদি আরব, বাহারাইন ও সিঙ্গাপুরের ভিসা অনলাইনে যাচাই করার ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। এর ফলে এসব দেশে জাল ভিসায় বিদেশ গমন রোধ করা সম্ভব হচ্ছে।

* প্রতারণা ঠেকাতে ব্যবস্থা:বিদেশ গমনকারী কর্মীদের তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয়ভাবে ডাটাবেজ আকারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ডাটা ব্যাংক থেকে সরাসরি কর্মী নিয়োগের সুবিধা দেওয়া ও দালালদের প্রতারণা রোধে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে কম্পিউটার ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম জেলা প্রশাসকের দফতরে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দেশে প্রতারণা ঠেকাতে ও প্রবাসে সম্মানের সঙ্গে কর্মী হিসেবে কাজ করতে প্রত্যেক নারী কর্মীকে ফিঙ্গার প্রিন্ট ও অন্যান্য তথ্যসহ স্মার্ট কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে বৈধভাবে বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে।

* কর্মী প্রশিক্ষণ: ৩৫ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৫ টি মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট নির্মাণের কাজ চলছে। প্রতিটি জেলায়ই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে এ পর্যন্ত দুই শিফটে ৬০ হাজার প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তাদের বেশিরভাগই বিদেশে কর্মসংস্থান পেয়েছেন। নির্মাণাধীন ৩৫টি কেন্দ্র বাস্তায়িত হলে আগামী বছর থেকে লক্ষাধিক কর্মী প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

* নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান: প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে প্রচলিত শ্রমবাজারের বাইরে নতুন নতুন শ্রমবাজারের অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এ তৎপরতার অংশ হিসেবে পোল্যান্ড, সুইডেন, রাশিয়া, সুদান, গ্রীস, কঙ্গো, এসতোনিয়া, আলজেরিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, দক্ষিণ আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলা, বোতসোয়ানা ও সিয়েরালিওনে কর্মী প্রেরণ শুরু করা হয়েছে।

* সরকারের সেবা কার্যক্রম: বিভিন্ন দেশ থেকে সরকারি খরচে কর্মীর মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা, দাফন-কাফন বাবদ ৩৫ হাজার টাকা প্রদান, অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরিবার প্রতি দুই লাখ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আটকা পড়া ও অসুস্থ কর্মীদের দেশে ফেরতের জন্যও কল্যাণ তহবিল থেকে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।

* সরকারিভাবে কর্মী প্রেরণ: মালয়েশিয়ায় কর্মরত ২ লাখ ৬৭ হাজার কর্মীকে বৈধ করা ছাড়াও নতুন করে কর্মী পাঠাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আরো পাঁচ হাজার কর্মী পাঠাতে চুক্তি করা হবে শিগগিরই। সরকার টু সরকার কর্মী পাঠাতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী জানান, আগামী বছর নতুন আরো ৭ লাখ কর্মী বিদেশে পাঠানো সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রীর এ উদ্যোগে নারী কর্মীদের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। পুরুষের পাশপাশি নারী কর্মীদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়লে দেশের অর্থনীতির চিত্র পাল্টে যাবে বলে মনে করেন তিনি।

********** পরিকল্পনা কমিশন **********

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান হলো পরিকল্পনা কমিশন । দেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন রূপকল্পের আলোকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা কাঠামোর উদ্দেশ্যে লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে থাকে পরিকল্পনা কমিশন। কিভাবে ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে তার নীতি ও বাস্তবায়ন কাঠামো এবং অগ্রগতি পরিমাপের মানদন্ড নির্ধারণও কমিশনের কাজ।

সংবিধানের ১৫ ধারায় রাষ্ট্রকে উপযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ তথা উন্নততর জীবনযাত্রা নিশ্চিত করণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের এই দায়িত্ব অর্পন করে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং প্রকল্প পর্যালোচনা মূল্যায়ন অনুমোদন কাজে পরিকল্পনা কমিশন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ধর্মী যোগাযোগ রক্ষা করে।

* পরিকল্পনা কমিশনের গঠন:

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের অধীনস্থ কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (ইকনোমিক) সদস্য এবং তাদের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা বিভাগ। বিভাগীয় প্রধানগণ চীফ বা প্রধান এবং উইং-এর প্রধানগণ যুগ্ম প্রধান পর্যায়ের কর্মকর্তা। উইংসমূহ আবার অধি শাখায় বিভক্ত যেগুলো ডেপুটি চীফ বা উপ প্রধানের নেতৃত্বে। সর্বশেষ স্তর হল ডেস্ক যা সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট। অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ বা সহকারি প্রধান পর্যায়ের কর্মকর্তারা এর দেখাশুনা করে।

* পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলী:

১। দীর্ঘমেয়াদী (১৫-২০) রূপকল্পের আওতায় ৫ বছর মেয়াদী (পঞ্চবার্ষিক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

২। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ছায়া অবলম্বনে ত্রিবার্ষিক প্রবহমান বিনিয়োগ পরিকল্পনা (TYRIP) প্রণয়ন।

৩। দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (PRSP) প্রণয়ন।

৪। ত্রিবার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের ভাবদর্শনের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) প্রণয়ন।

৫। ECNEC সভা ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা সারপত্র প্রণয়ন।

৬। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে উৎকর্ষতা বিধানের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ।

(উত্স: ৭-৮ টি পত্রিকার রিপোর্ট ও আর্টিকেল থেকে সংগৃহীত ও সম্পাদিত)
শুধু 35th BCS Written Preparation (Studying is BorIng) গ্রুপ এর জন্য
অন্যের বা বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ কখনও ক্ষমা করেনা!!
(ALLAH IS ALMIGHTY)

মেড ইন বাংলাদেশ: পোশাকশিল্পের অবয়ব, স্বপ্নের পথ-নকশার বাস্তবায়ন

লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি + বাংলা ২য় পত্র
বাংলাদেশ বিষয়াবলি: Economy, Poverty Alleviation.
বাংলা ২য় পত্র: রচনা (৪০ নম্বর)
****

********** মেড ইন বাংলাদেশ: পোশাকশিল্পের অবয়ব **********

'মেড ইন বাংলাদেশ' এই একটি স্লোগান সামনে রেখে সারা দেশে পোশাকশিল্পের এত উদ্যোক্তা, শ্রমজীবী মানুষ, শত শত কারখানা-প্রতিষ্ঠান, ৩৩ বছরের পরিশ্রমের পথপরিক্রমা। এত এত সফল উদ্যোক্তা আর সাফল্যের ইতিহাস বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে শিল্পসংশ্লিষ্ট কিছু দুর্ঘটনা আর সংকটের ঘেরাটোপে। নিরন্তর যেন এই পথচলা। শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিশ্বাস, একটি সময় স্বস্তির বাতাস বইবেই। কিন্তু কেন যেন অস্থিরতার ঝড় থামছেই না।

১৯৮০ সালে যাত্রা শুরু করা খাতটিতে ৪০ লাখ শ্রমিকের সিংহভাগ গ্রামীণ নারী। বর্তমানে বিজিএমইএর সদস্য কারখানা চার হাজার ৮৮২টি। এর মধ্যে দুই হাজার ৯২টি কারখানা সরাসরি রপ্তানি করে। এ ছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির কারখানা দুই হাজার ৭৯০টি, যার মধ্যে কিছু বন্ধ বা অচল আর কিছুর অস্তিত্বই নেই। বিকেএমইএর সদস্য কারখানা এক হাজার ৮৭০টির মধ্যে সরাসরি রপ্তানি করে ৯০০টি। বাকি অর্ধেকের অবস্থা বন্ধ, অচল বা অস্তিত্বহীন। বন্ধ ও অস্তিত্বহীন কারখানাগুলো মূলত দেশের রাজনৈতিক কোলাহলের নিষ্ঠুর শিকার।
সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলো 'মেড ইন বাংলাদেশ'-এর সব অর্জন ম্লান করে দিচ্ছে। স্পেকট্রাম, তাজরীন, রানা প্লাজার ধস। এত অসহায়-নির্মম মৃত্যু! এসব দুর্ঘটনায় সাধারণ নাগরিক এবং উদ্যোক্তা হিসেবে আমরা অপরাধবোধ আর অনুতাপে ক্লান্ত। ক্ষমা চাওয়ার সাহসও হারিয়ে ফেলেছি। ফলে দেশ-সমাজ, এমনকি নিজ বাড়ির মানুষগুলোর সঙ্গেও যেন বৈরিতার দেয়াল উঠছে।

শুধু ৪০ লাখ শ্রমিক, পাঁচ হাজার উদ্যোক্তা বা ২০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি দিয়ে পোশাকশিল্পকে বোঝা যায় না, মূল্যায়ন তো নয়ই। এই খাতকে বুঝতে হলে এর শিকড় অর্থনীতির কত গভীরে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। জাতীয় অর্থনীতিতে (জিডিপি) এ খাতের সরাসরি অবদান ১০-১১ শতাংশ। সম্পূরক অন্য শিল্প মিলে ১৪-১৫ শতাংশের কম নয়। পোশাক খাতে রপ্তানি হয় আনুমানিক এক লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা। আমদানি হয় ৮০ থেকে ৮৫ হাজার কোটি টাকার মধ্যবর্তী পণ্য। নিট পোশাকে মূল্য সংযোজন প্রায় ৯০ শতাংশ আর ওভেনে ৪০ শতাংশের কাছাকাছি।
২.৭ ঃ ১ শ্রমিক মেশিন অনুপাতে (৪৫ মেশিনে লাইন ভিত্তিতে) দেশে প্রায় ৩২ হাজার লাইন পোশাক কারখানা স্থাপিত হয়েছে। বিনিয়োগ হয়েছে ২৪ হাজার কোটি টাকা। কারখানায় একজন শ্রমিকের কাজের জন্য গড়ে আদর্শ জায়গা প্রয়োজন সর্বোচ্চ ৫০ বর্গফুট। কারখানাগুলো যদি শ্রমিকপ্রতি ৩৫ বর্গফুট করেও জায়গা দেয়, তাহলে শুধু কারখানা গড়তে হয়েছে ১৪ কোটি বর্গফুট। প্রতি বর্গফুট জায়গা গড়তে গড়ে এক হাজার টাকা ব্যয় হলেও, শুধু কারখানা নির্মাণ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৪ হাজার কোটি টাকা। আর প্রতি বর্গফুটের ভাড়া গড়ে সাত টাকা ধরা হলে প্রতি মাসে জায়গার ভাড়া গুনতে হচ্ছে ৯৮ কোটি টাকা।

বিভিন্ন খাতে এ শিল্পের প্রভাবের আরেকটু গভীরে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। যেমন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে প্রতিদিন সাত হাজার ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান চলাচল করে। এর মধ্যে পাঁচ হাজার পোশাকশিল্পের পণ্য পরিবহনে নিযুক্ত। চট্টগ্রাম বন্দরে ১৩ জেটির আটটি পোশাক খাতের পণ্য ওঠা-নামায় ব্যস্ত থাকে। চট্টগ্রাম বন্দরে ২০১২ সালে মোট কনটেইনারবাহী জাহাজ ভিড়েছে এক হাজার ২০৫টি। এর মধ্যে পোশাকশিল্পের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ৮৪৫টি। আর ১৩ লাখ ৪৩ হাজার কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে। ২০০০-০১ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের আয় ছিল ৪৭৭ কোটি টাকা। ২০১১-১২ সালে সেই আয় এক হাজার ৫০৮ কোটি টাকা। এর প্রধান অংশ এ শিল্পের বদৌলতে। যদি একজন শ্রমিক মাসে গড়ে ওভারটাইমসহ (ওভেন, নিট, সোয়েটার) ন্যূনতম পাঁচ হাজার টাকা আয় করেন, তাহলে উদ্যোক্তাদের বেতন গুনতে হয় মাসে দুই হাজার কোটি টাকা, বছরে ২৪ হাজার কোটি টাকা। পোশাকশিল্পকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার ছোট-বড় কারখানা। যেমন কম মূল্যের কসমেটিকস, জামাকাপড়, লুঙ্গি, টয়লেট্রিজ, স্যান্ডেল, ফিতা-চুড়ি, লিপস্টিক, টিফিন ক্যারিয়ার, ছাতা, নারকেল তেল, আয়না, হোটেল, দোকানপাট ইত্যাদি।

কারখানার শ্রমিক বোনেরা পায়ের স্যান্ডেল, লিপস্টিক, পাউডার, তেল, সাবান ইত্যাদিতে বছরে যদি মাত্র ৪০০ টাকা খরচ করেন, তাহলে বছরে ১৬০ কোটি টাকা এই খাতে যায়। ৩০ লাখ নারী শ্রমিক যদি বছরে ২৫০ টাকা করে চারটি শাড়ি বা কামিজ কেনেন, ঈদ-পার্বণ বা আত্মীয়স্বজনসহ, তাহলে বছরে ৩০০ কোটি টাকা খরচ হয় শুধু এই বাবদ। ১০ লাখ পুরুষ শ্রমিক যদি বছরে দুটি করে লুঙ্গি, শার্ট কেনেন, তাহলে বছরে ৭০ কোটি টাকা যায় এগুলো কিনতে। কত কারখানা গড়ে উঠেছে ছাতা-টিফিন ক্যারিয়ার বানাতে।

সম্পূরক শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে টেক্সটাইল, উইভিং, ডায়িং, ফিনিশিং, এমব্রয়ডারি, প্লাস্টিক, প্যাকেজিং, এক্সেসরিজসহ অনেক শিল্প। ১৯৮৫-৯০ সালে প্রায় হাতে গোনা কয়েকটি কারখানা থেকে আজ স্থাপিত হয়েছে ৭১১টি টেক্সটাইল (৩০ হাজার ৭৫০ লুম), ৩৮৫টি স্পিনিং (৮৭ দশমিক ৮ লাখ স্পিন্ডেল), ২৩৩টি ডায়িং ফিনিশিং কারখানা। বিনিয়োগ হয়েছে ৪০ হাজার কোটি টাকা। কারখানা গড়া হয়েছে পাঁচ কোটি ১০ লাখ বর্গফুটের মতো। নির্মাণ করতে লেগেছে পাঁচ হাজার কোটি টাকা। এক্সেসরিজ শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছে আট হাজার কোটি টাকা।

পোশাকশিল্পের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পোশাক টেক্সটাইল, উইভিং এক্সেসরিজ কারখানা স্থাপনে ঋণ নেওয়া হয় এক লাখ কোটি টাকার ওপর। ব্যাংক ইন্টারেস্ট ১২-১৮ শতাংশ, পাঁচ থেকে সাত বছর মেয়াদি। তারপর প্রতিদিনের আমদানি-রপ্তানি। শুধু পোশাক ও সহযোগী শিল্পের আমদানি-রপ্তানি বছরে তিন লাখ কোটি টাকার বেশি। এই টার্নওভারের ওপর নানা চার্জ, কমিশন আয় করে ব্যাংক-বিমা কোম্পানিগুলো। জোর দিয়ে বলতে পারি, দেশের বেশ কটি বড় ব্যাংক এবং বিমার অস্তিত্ব দাঁড়িয়ে আছে পোশাকশিল্পের ওপর। পোশাকশিল্প সরাসরি অবদান রাখছে অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রে। দুই দিন হরতাল থাকলে হোটেলগুলোতে ক্রেতা বা অতিথির সংখ্যা অর্ধেকে দাঁড়িয়ে যায়। ছোট-বড় আরও অনেক খাত আছে, যা নিয়ে আলোচনা করা যায়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, দারিদ্র্যবিমোচন এই দুটি সূচকে পোশাক খাতের অবদান গবেষণার দাবি রাখে। গ্রামীণ নারী অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতায়, জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং দারিদ্র্যবিমোচনকে সমানভাবে উতরাতে পেরেছে। পোশাক খাত না থাকলে জনসংখ্যা সবশেষ শুমারির তুলনায় কমপক্ষে আরও দুই কোটি বেশি থাকত বলে বিশেষজ্ঞরা বলেন।
পোশাকশিল্প যেমন অর্থনীতির চেহারা বদলে দিয়েছে, তেমনি গড়ে তুলেছে একটি নতুন উদ্যোক্তা গোষ্ঠী, যারা পোশাক দিয়ে শুরু করেছিল, এখন অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগ করছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে পোশাক ও এর আনুষঙ্গিক শিল্প ছাড়া অন্য কোনো বৃহৎ খাত পরিপক্কতা পায়নি। বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য এটা দুঃখজনক। পোশাকশিল্পের বদৌলতেই বিশ্ব আজ বাংলাদেশকে 'নেক্সট চায়না' বলে আখ্যা দিচ্ছে।

একই সঙ্গে এ-ও বলতে হবে যে এই ৪০ লাখ শ্রমিক ছাড়া আমাদের কারোরই অস্তিত্ব থাকত না। তাঁদের ন্যূনতম বেতন বাড়ানো, নিরাপত্তা নিয়ে যেমনি অনেক কিছু করার আছে, তেমনি বেশি উৎপাদনের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। কম্বোডিয়ায় সর্বমোট ৩০৯টি পোশাক কারখানায় কর্মরত তিন লাখ ৩৫ হাজার ৪৩২ জন শ্রমিক ২০১১ সালে রপ্তানি করেছে ৪ দশমিক শূন্য ৪৭ বিলিয়ন ডলার, যাতে করে মাথাপিছু শ্রমিকের রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ১২ হাজার ৭০ ডলারে। (উৎস: কম্বোডিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কেন লু, সেক্রেটারি জেনারেল, গার্মেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, কম্বোডিয়া) অন্যদিকে বাংলাদেশে ৪০ লাখ শ্রমিক রপ্তানি করে ২০ বিলিয়ন ডলার, যা কিনা মাথাপিছু পাঁচ হাজার ডলার হয়। কম্বোডিয়ার শ্রমিকের সর্বনিম্ন বেতন ৭৪ ডলার। আমাদের শ্রমিক ন্যূনতম তিন হাজার টাকা হিসাবে মাসে পান চার হাজার ৫০০ টাকার কাছাকাছি। মোট শ্রমিকের শতকরা ১৫-১৮ ভাগ ন্যূনতম বেতনে চাকরি করেন। দুই দেশের উৎপাদন ক্ষমতায় আকাশ-পাতাল তফাত। এদিকটায় নজর দেওয়ার সময় এসেছে।

তাজরীন ও সাভার দুর্ঘটনা সমগ্র পোশাকশিল্পকে বিশাল নাড়া দিয়েছে। সারা জাতি, বিশ্বের ক্রেতা-ভোক্তারা শঙ্কিত। এই দুর্ঘটনাগুলো আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। অর্থনীতি ও সমাজজীবনের শিরা-উপশিরায় যে শিল্প বহমান, তাকে আরও মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। এর অতিক্রমে প্রয়োজন সবার সঙ্গে আন্তরিকভাবে কাজ করা।
আনিসুল হক: সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ, এফবিসিসিআই ও সার্ক চেম্বার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও কানাডা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রচলিত বা মূল বাজার। তবে পরিমাণে এখনো কম হলেও নতুন বাজারে ভালো করছে দেশের পোশাক খাত। গত তিন অর্থবছরে এই বাজারের রপ্তানি ২৩০ থেকে বেড়ে ৩৬১ কোটি মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মোট পোশাক রপ্তানিতে নতুন বাজারের অংশীদার বেড়ে ১৪ দশমিক ৭৫ শতাংশে পৌঁছেছে।

সর্বশেষ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দুই হাজার ৪৪৯ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ। এর মধ্যে ইইউ এক হাজার ৪৭৪, যুক্তরাষ্ট্রে ৫১৪ ও কানাডায় ১০০ কোটি ডলার রপ্তানি হয়। আলোচ্য সময়ে এসব দেশে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১৪ দশমিক ৭৫, ২ দশমিক ৮৪ ও ২ শতাংশ।

অন্যদিকে, একই সময়ে নতুন বাজারে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩৬১ কোটি ডলার। এই আয় আগের ২০১২-১৩ অর্থবছরের ২৯৫ কোটি ডলারের চেয়ে ২২ দশমিক ৩১ শতাংশ বেশি। তার মানে প্রচলিত বাজারের চেয়ে নতুন বাজারে প্রবৃদ্ধি বেশি। আর এই নতুন বাজারের মধ্যে তুরস্ক, জাপান, চীন, রাশিয়া, ভারতে ভালো করছে বাংলাদেশ। প্রতিবছরই রপ্তানি বাড়ছে। এমন তথ্যই দিচ্ছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যান।

পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা বলছেন, আগামী দিনে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি বাড়ানো কিছুটা কঠিন। কারণ এসব দেশে অনেক প্রতিযোগী। দিন দিন সেটি আরও বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে বড় উদাহরণ যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) পোশাক রপ্তানি কমে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ঋণাত্মক। যদিও রানা প্লাজা ধস ও গত বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতাই আমেরিকার বাজার নিম্নমুখী হওয়ার বড় কারণ। শিগগিরই এই বাজারে রপ্তানি বাড়বে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা। তবে একই সঙ্গে তাঁরা বলছেন, তৈরি পোশাকের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হলে নতুন বাজারই বড় ভরসা। এ জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানি-সুবিধা চুক্তি, অন্যান্য অশুল্ক বাধা দূর, নীতি-সহায়তা ও মেলা আয়োজন করতে হবে সরকারকে।

এদিকে নতুন বাজারে পোশাক রপ্তানি বাড়াতে সরকার ইতিমধ্যে কিছু কাজ করেছে। কানাডা, জাপান, চীন ও ভারত সরকারের সঙ্গে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানি চুক্তি করেছে। এ ছাড়া উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে নতুন বাজারে ৩ শতাংশ হারে প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার। অন্যান্য দেশের সঙ্গে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানি চুক্তির চেষ্টা চলছে বলেও সম্প্রতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জানান বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ।

ইপিবির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তুরস্কে গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৬২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়, যা তার আগের অর্থবছরের ৪২ কোটি ডলারের চেয়ে ৩২ শতাংশ বেশি। দেশটিতে তিন অর্থবছরের ব্যবধানে তুরস্কে ২৬ কোটি ডলার রপ্তানি বেড়েছে। আলোচ্য সময়ে জাপানে ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪, তিন অর্থবছরে রপ্তানি হয় যথাক্রমে ৪০, ৪৭ ও ৫৭ কোটি ডলার। অন্যদিকে গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে চীনে ২৪, রাশিয়ায় ২০, ব্রাজিলে ১৭, দক্ষিণ কোরিয়ায় সাড়ে ১৩ কোটি, ভারতে নয় কোটি ও দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌনে পাঁচ কোটি ডলার আয় হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে চীনে। ৪২ শতাংশ।

পোশাকশিল্পের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর নেতারা জানান, প্রবৃদ্ধি ভালো হলেও নতুন বাজারে রপ্তানির পরিমাণ এখনো কম। তবে এই বাজারে রপ্তানি আরও বাড়ানোর অনেক সুযোগ আছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে উচ্চ শুল্ক, ব্যাংকিং ও কাস্টমসের কিছু জটিলতা আছে অনেক দেশে। যেমন রাশিয়ায় এখন মাত্র ২০ কোটি ডলার রপ্তানি হলেও সেখানকার বাজার প্রায় এক হাজার ২০০ কোটি ডলারের। দেশটিতে ৪২ শতাংশ শুল্ক ও কর দিয়ে রপ্তানি করতে হয়। অন্যদিকে ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যথাক্রমে ৩৫ ও ৪৫ শতাংশ শুল্ক ও কর দিতে হয়। জানতে চাইলে বিকেএমইএর সাবেক সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, রাশিয়া, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বড় বাজারে শুল্ক হ্রাসে সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উদ্যোগ নিতে হবে। এগুলো করা গেলে আগামী ১০ বছরে পোশাকের মোট রপ্তানিতে নতুন বাজারের হিস্যা হবে ৬০-৭০ শতাংশ।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি আবদুস সালাম মুর্শেদী বলেন, একক দেশ হিসেবে আমেরিকায় আমাদের রপ্তানি সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে দেশটির জনসংখ্যা ৩১ কোটি। আর চীনের জনসংখ্যা ১৩৬ কোটি। তার মানে চীনের বাজার বড়। সে দেশের ব্যবসায়ীরাও পোশাক ব্যবসা থেকে সরে আসছে। এই বাজারটি দখল করার সুযোগ আছে বাংলাদেশের। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের দিকেই আমাদের তাকিয়ে থাকলে হবে না।

********** স্বপ্নের পথনকশার বাস্তবায়ন অজানা! **********
(৫০ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানির চ্যালেঞ্জ)

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজ ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে শেষ করার কথা ছিল। তবে এখন পর্যন্ত অর্ধেক কাজ হয়েছে। এ জন্য দেশের রপ্তানিকারকদের পণ্য পরিবহনে কয়েক গুণ বেশি সময় ব্যয় হচ্ছে। নানা ধরনের জটিলতায় পড়ছেন ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশের অবকাঠামো নির্মাণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ধীরগতির জন্য এই একটি উদাহরণই যথেষ্ট। আর এমন প্রেক্ষাপটেই পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ বলছে, ২০২১ সালে বাংলাদেশের পোশাকের রপ্তানি হবে ৫০ বিলিয়ন বা পাঁচ হাজার কোটি ডলার। স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশবাসীকে এই উপহার দিতে চায় বিজিএমইএ। এই স্বপ্নের দোরগোড়ায় পৌঁছার পথনকশা খুঁজতে গত সপ্তাহে সাড়ে ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা অ্যাপারেল সামিটের আয়োজন করে সংগঠনটি।

দেশের পোশাক রপ্তানির আয় গত অর্থবছরে ছিল দুই হাজার ৪৪৯ কোটি ডলার। ৫০ বিলিয়নে পৌঁছাতে হলে এটি দ্বিগুণ করতে হবে। হাতে সময় মাত্র ছয় বছর। বিজিএমইএর নেতাদের ভাষ্য, বর্তমান বিশ্বে পোশাকশিল্পের বাজার ৪৫ হাজার কোটি ডলারের। এখানে বাংলাদেশের হিস্যা মাত্র ৫ শতাংশ। আর মাত্র ৩ শতাংশ বাড়াতে পারলেই লক্ষ্য অর্জনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানো যাবে।

অবশ্য এই রপ্তানি আয়ে পৌঁছাতে বাংলাদেশকে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। অ্যাপারেল সামিটের আলোচনা-বিতর্কে এ বিষয়গুলো ভালোভাবেই উঠে এসেছে। বলা হয়েছে, রপ্তানির পাশাপাশি আমদানিও সমান হারে বাড়বে। তখন চার লেন বদলে আট লেনের মহাসড়কের প্রয়োজন পড়বে। সমুদ্রবন্দরের সক্ষমতা বর্তমানের চেয়ে কয়েক গুণ বাড়াতে হবে। গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ এ ক্ষেত্রে ভালো সমাধান। গ্যাস ও বিদ্যুতের প্রাপ্ততা নিশ্চিত করতে হবে। তবে উদ্যোক্তারা এখনই চাহিদামতো গ্যাস-বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না।

অন্যদিকে ক্রেতাদের দুই জোট অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের পরিদর্শনে অনেক কারখানা সংস্কার ও স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু কারখানার মালিকেরা স্বল্প সুদে ঋণ পাচ্ছেন না। কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নত করতে আগামী পাঁচ বছরে তিন থেকে চার বিলিয়ন ডলার লাগবে।

সামিটে অংশ নেওয়া দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও শিল্পের উদ্যোক্তারা ছয় বছরে পোশাক খাতের রপ্তানি ৫০ বিলিয়নে নিয়ে যেতে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি জোর দিয়েছেন কারখানার কর্মপরিবেশের উন্নতিসহ শ্রমিকদের জীবনমান ও অধিকার নিশ্চিত করতে উদ্যোক্তাদের মানসিকতা পরিবর্তনের ওপর। বলেছেন, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, পণ্যের মানোন্নয়ন, উচ্চমূল্যের পণ্য তৈরিতে মনোযোগ বাড়ানো দরকার।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৭ থেকে ৯ ডিসেম্বর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বিষয়ে নয়টি সেমিনার হয়। বিজিএমইএর তিনজন সাবেক ও বর্তমান নেতা এই প্রতিবেদকের কাছে স্বীকার করেন, পোশাকের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রার এই ধারণাটি নতুন। তা ছাড়া সম্মেলনে উঠে আসা আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ এবং কী করণীয়, সেগুলোর অধিকাংশই পুরোনো। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ তা আগে থেকেই কম-বেশি জানে। এবার কেবল তা বড় একটি প্ল্যাটফর্মে একসঙ্গে উঠে এসেছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে শ্রমিকনেত্রী নাজমা আক্তার বলেন, 'আমরা আলাপ করি বেশি, কাজ করি কম। এখন কাজ বেশি করতে হবে, আলাপ কম করতে হবে। আর আমাদের অবশ্য অবশ্যই স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে এগোতে হবে।' তিনি বলেন, পোশাক রপ্তানি ৫০ বা ১০০ বিলিয়ন ডলার হলে শ্রমিকেরা লাভবান হবেন। তাই আমাদের সাধ্যমত যা করার আছে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তা করব।'

সম্মেলন গত মঙ্গলবার শেষ হওয়ার পর পোশাকশিল্পের একাধিক উদ্যোক্তা ও শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে কথা হয়। তাঁরা একবাক্যে বলেন, 'সব দিক বিচারে এখন বাস্তবায়নই হচ্ছে মূল সমস্যা।' অবশ্য এ কথাটি সম্মেলনে একাধিকবার উঠে আসে। সামিটের এক সেমিনারে অংশ নিয়ে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, 'অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগের জন্য অর্থায়ন কোনো সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে বাস্তবায়নে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নীতি স্থির নয়।' অবকাঠামো উন্নয়নে আগামী ১০ বছরে সাত হাজার ৪০০ থেকে ১০ হাজার কোটি ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে হবে বলে জানান তিনি।

বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি আবদুস সালাম মুর্শেদী বলেন, ‘অবকাঠামো উন্নয়নের বিরাট কাজটি সরকারকে করতে হবে। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আনতে হবে। কারণ, সময়মতো কাজ শেষ না হলে উল্টো সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন আগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ছয় ঘন্টায় যাওয়া যেত, এখন লাগে ১৬ ঘন্টা।’

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সহসভাপতি শহিদউল্লাহ আজিম বলেন, ‘সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা একটা পথনকশা তৈরি করতে চেয়েছি। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা সফল। এবার পুরো পরিকল্পনাটি গুছিয়ে আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দেব। একই সঙ্গে সরকারকে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানাব।’ তিনি বলেন, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বাড়ানোর জন্য এটি চাইছেন এমনটা ভাবলে ভুল হবে। তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ ধরনের বড় লক্ষ্য অর্জনে একটি কৌশল দরকার। শ্রমিক ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে বিজিএমইএর উচিত একটি প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পণ্য কাঠামোর পরিবর্তন, মজুরি বৃদ্ধি, বিনিয়োগ, বিশ্ববাজার পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করে সেই তথ্য-উপাত্ত বিবেচনায় নিতে হবে। তারপর পরিকল্পনাটি নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বা দর-কষাকষিতে যাওয়া উচিত।’

সিপিডির এই গবেষক আরও বলেন, পরিকল্পনা পাওয়ার পর সরকারের উচিত পোশাকশিল্পের গুরুত্ব বিবেচনা করে কীভাবে এটি গ্রহণ করবে সেটি নির্ধারণ করা। একই সঙ্গে প্রতিশ্রুতিশীল অন্যান্য রপ্তানি খাত যাতে চাপে না পড়ে, সেদিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। সব মিলিয়ে একটি সামগ্রিক শিল্পায়ন পরিকল্পনা করতে হবে সরকারকে। তারপর সব পক্ষকে নিয়ে বাস্তবায়নে নামতে হবে।

অবকাঠামো :
ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেন মহাসড়ক
গ্যাস ও বিদ্যুতের পর্যাপ্ততা
চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ

কর্মপরিবেশের উন্নতি :
উদ্যোক্তাদের মানসিকতা পরিবর্তন
শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ
সরকাির নিয়ন্ত্রক সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি

অর্থায়ন :
কারখানা সংস্কার ও স্থানান্তর এবং নতুন কারখানা স্থাপনে স্বল্প সুদে ঋণ সহায়তা

অন্যান্য :
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
কারখানার জন্য জমি
নতুন বাজার খোঁজা
বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন
গবেষণা

মধ্যম আয়ের পথরেখা

লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি
Topic:::: Economy...developments...Poverty Alleviation, Vision- 2021.

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবার সম্ভবনা কতটুকু ? মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে করনীয় সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত উল্লেখ করুন।

**********মধ্যম আয়ের দেশের পথরেখা ও আমাদের করনীয় *******
বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিশেষ করে সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি এখন অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ। একসময়ের 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশের পথে। আমরা যেমন মধ্যম আয়ের দেশ হতে চাই, আকাঙ্ক্ষা উন্নয়নশীল দেশ হওয়ারও। তবে কেবল প্রবৃদ্ধিনির্ভর মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার পাশাপাশি আমাদের আকাঙ্ক্ষা হবে সামগ্রিক উন্নয়নের। লক্ষ্য ২০২১ মধ্যম আয়ের দেশ হতে চায় বাংলাদেশ। সরকারের একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ রয়েছে। সেখানে রয়েছে ২০২১ সাল নাগাদ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা। বলা আছে, ২০২১ সালে বাংলাদেশের লক্ষ্য মাথাপিছু আয় ২০০০ ডলার করা, সে সময় প্রবৃদ্ধির হার হবে ১০ শতাংশ।
আবার দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৪ এর জন্য তৈরি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও বলা আছে, 'আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ। শুরু হয়েছে দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের ঐতিহাসিক কালপর্ব।' এরও আগে ২০০৬ সালে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) রূপকল্প তৈরি করে স্বাধীনতার ৫০ বছরে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার কথা বলেছিল।

কোথায় আছি, কোথায় যেতে চাই:
প্রবৃদ্ধি ৬.১% আর মাথাপিছু আয় ছিল ৮৪৩ ডলার, তবে মূল্যস্ফীতি ৭.৫% থাকায় জীবন যাত্রার ব্যয় ছিল বেশি

কেন ২০২১:
২০২১ সাল হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর। বছরটি বাংলাদেশ উদ্যাপন করতে চায় মধ্যম আয়ের দেশ হয়ে। সবার আকাঙ্ক্ষা, ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে এমন একটি দেশ, যে দেশটিকে সবাই মিলে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

পরিমাপের পদ্ধতি:
বিশ্বব্যাংক মাথাপিছু জাতীয় আয় পরিমাপ করে থাকে যে পদ্ধতিতে, তাকে বলা হয় এটলাস মেথড। একটি দেশের স্থানীয় মুদ্রার মোট জাতীয় আয়কে (জিএনআই) মার্কিন ডলারে রূপান্তর করা হয়। এই রূপান্তর হয় এটলাস পদ্ধতিতে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তিন বছরের গড় বিনিময় হারকে সমন্বয় করা হয়। যাতে করে আন্তর্জাতিক মূল্যস্ফীতি ও বিনিময় হারের ওঠানামা সমন্বয় হয়। এ কারণে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব আর বিশ্বব্যাংকের হিসাব এক হয় না।

মধ্যম আয়ের দেশ কী:
মধ্যম আয়ের দেশ—এই শ্রেণীকরণটি মূলত বিশ্বব্যাংকের। কোন দেশকে কী পরিমাণ ঋণ দেওয়া হবে, সেটি নির্ধারণ করতেই তারা দেশগুলোকে চার ভাগে ভাগ করে। মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিএনআই) মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে দেশের

বিভাজন:

নিম্ন আয়: কমপক্ষে ১০৪৫ ডলার
নিম্ন মধ্যম আয় :১০৪৬ ডলার–৪১২৫ ডলার
উচ্চ মধ্যম আয়: ৪১২৬ ডলার–১২৭৪৫ ডলার
উচ্চ আয়: ১২৭৪৬ ডলারের বেশি
প্রতিবছরের ১ জুলাই বিশ্বব্যাংক এই শ্রেণীকরণের তালিকা প্রকাশ করে।

যা করতে হবে:
এখন অর্থনীতি যেভাবে এগোচ্ছে, সেই ধারায় এগোলে ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হবে না। বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিকে আরও বাড়াতে হবে।
জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার এখনকার ৬ দশমিক ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭ দশমিক ৫-৮ শতাংশ করতে হবে। প্রবাসী-আয়ে প্রবৃদ্ধি রাখতে হবে ৮ শতাংশ। বিনিয়োগ বাড়াতে হবে জিডিপির আরও ৫ শতাংশ হারে।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি: এখন (২০১৪–১৫)
মাথাপিছু আয়: ১৩১৪ ডলার
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার: ৬.৫১%
মোট দেশজ সঞ্চয় জিডিপির: ২৩.৪৫%(২০১৩-১৪)
জাতীয় সঞ্চয় জিডিপির: ৩০.৫৪%(২০১৩-১৪)
মোট বিনিয়োগ জিডিপির: ২৮.৬৯%(২০১৩-১৪)
দারিদ্র্য হার: ৩১.৫০%(২০১৩-১৪)

এলডিসি থেকে উত্তরণ:
মধ্যম আয়ের দেশ ও স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে পার্থক্য আছে। মধ্যম আয়ের দেশ হলেই কোনো দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশ হবে না।
জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকের ভিত্তিতে বিশ্বের দেশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে। যেমন, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি), উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ।
বাংলাদেশ একটি এলডিসি। এলডিসি ধারণাটি প্রথম আলোচনা হয় ১৯৬০ সালে। তবে প্রথম এলডিসির তালিকা করা হয় ১৯৭১ সালের ১৮ নভেম্বর। আর বাংলাদেশ এলডিসিতে অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৭৫ সালে।
জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসোক) উন্নয়ন নীতিমালাবিষয়ক কমিটি বা কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) তিনটি সূচকের ভিত্তিতে তিন বছর পর পর এলডিসির তালিকা করে। শেষটি করা হয় ২০১২ সালে। বর্তমানে এলডিসি ৪৮টি দেশ।

উত্তরণের তিন সূচক:
1.মাথাপিছু আয়
তিন বছরের গড় মাথাপিছু আয় (জিএনআই)। ২০১২ সালের তালিকা অনুযায়ী ৯৯২ ডলারের কম মাথাপিছু আয় যাদের। বাংলাদেশকে ২০১৫ সালে এলডিসি থেকে বের হতে প্রয়োজন হবে ১২৪২ ডলার।
2.মানবসম্পদ
পুষ্টি, স্বাস্থ্য, স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার হারের সমন্বয়ে তৈরি।
3.অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা
প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আঘাত, জনসংখ্যার পরিমাণ এবং বিশ্ববাজার থেকে দূরত্ব।
এই তিন সূচকের যেকোনো দুটি অর্জিত হলে একটি দেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের আবেদন করতে পারে। আবার কেবল মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতেও একটি দেশ এলডিসি থেকে বের হতে পারে, তবে এ জন্য মূল্যায়নের বছরে মাথাপিছু আয় নির্ধারিত প্রয়োজনীয় আয়ের দ্বিগুণ হতে হবে।

এলডিসি বনাম মধ্যম আয়ের দেশ:
মধ্যম আয়ের দেশ হওয়া একটি মর্যাদা। বিশ্বব্যাংক সাহায্য দেওয়ার সুবিধার জন্য এই শ্রেণীকরণটি করেছে। সুতরাং এর সঙ্গে জড়িত মূলত সাহায্য। এলডিসি জাতিসংঘের তালিকায় আছে। এর ফলে এই দেশগুলো উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ থেকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাজার-সুবিধা পেয়ে থাকে। সুতরাং এর সঙ্গে জড়িত বাজার-সুবিধা।

বিশেষজ্ঞ মন্তব্য : (দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য)
অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক বিকাশকে যদি ত্বরান্বিত করতে হয়, তাহলে অর্থনীতির কাঠামোগত যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলোকে চিহ্নিত করে তার সমাধান করতে হবে। সে জন্য আমরা মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার চেয়ে স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব

দিয়ে বলেছি। সে কারণেই আয় বাড়ানোর পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার দিকেও মনোযোগী হওয়ার কথা বলছি।

দ্বিতীয়ত, মধ্যম আয়ের দেশের এই ধারণা এমন একটা আত্মতৃপ্তির সৃষ্টি করে যে মধ্যম আয় হলেই কিংবা ১০০০-১২০০ ডলার আয় হয়ে গেলেই আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পৃথিবীতে এখন গড়ে ৫৫-৫৬ বছরের চেয়ে কম কোনো মধ্যম আয়ের দেশ নেই। সবচেয়ে ত্বরান্বিতভাবে যে দেশ মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চ আয়ের দেশের দিকে গেছে, তার লেগেছে ২৬ বছর। ছোট দেশ হিসেবে আগে গেছে মালটা, তারপর গেছে জাপান, তারপর গেছে দক্ষিণ কোরিয়া। সেটা গেছে আশির দশকে।

পুরো লাতিন আমেরিকা, ব্রাজিল, ইকুয়েডর থেকে শুরু করে সবাই ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে মধ্যম আয়ের দেশে রয়েছে। তারা একটা ফাঁদে (ট্র্যাপ) আছে। ফাঁদটা হলো, তাদের কাঠামোগত সমস্যাগুলোর সমাধান হচ্ছে না। প্রথম যে জিনিসটার সমাধান হয় না, সেটা হলো অবকাঠামো। দ্বিতীয়ত আছে পাবলিক সার্ভিস। এরপর স্যানিটেশন। এরপর অপরিকল্পিত নগরায়ণ। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যারও সমাধান হয় না। এর সঙ্গে আছে সুশাসনের সমস্যা। এখন যে একটা কথা বলা হয়, মধ্যম আয়ের দেশ হলে আমরা বিরাট হব। মধ্যম আয়ের দেশ হলে ঢাকার এই যানজট আমাদের সঙ্গেই থাকবে। এর সঙ্গে পুষ্টিহীনতাও থাকবে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুও থাকবে এবং এর সঙ্গে দুর্নীতিও থাকবে। আমার দৃষ্টিতে আরেকটু সামগ্রিকতার নিরিখে লক্ষ্য ঠিক করা উচিত।

আয় বৃদ্ধিই উন্নয়ন নয়

প্রবৃদ্ধির সুফল গড়িয়ে নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে যাওয়ার যে তত্ত্ব, তা মোটামুটিভাবে বাতিল হয়ে গেছে সেই ষাটের দশকেই। কারণ, অনেক দেশই প্রবৃদ্ধি বাড়ালেও তাতে দারিদ্র্য তেমন কমাতে পারেনি, বরং বৈষম্য বেড়ে যায়। সত্তরের দশকে এ নিয়ে অর্থনীতিবিদেরা গবেষণা করে দেখান, অনেক দেশে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও এর সুফল দরিদ্র মানুষেরা পাননি। অনেক দেশে বৈষম্য বেড়েছে, অপূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থান বেড়েছে কৃষি খাতে এবং সাধারণ মানুষের জীবনমানেরও অবনতি ঘটেছে।

সত্তরের দশকেই অর্থনীতিবিদেরা এটা মেনে নেন যে কেবল মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি একটি দেশের উন্নয়নের সঠিক বা যথাযথ নির্দেশক নয়। এরপরই উন্নয়ন তত্ত্বে পুনর্বণ্টন এবং সামাজিক সূচক বিষয়টি গুরুত্ব পায়। অথচ মধ্যম আয়ের দেশ হতে হলে এখনো কেবল মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকেই সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়।

মধ্যম আয়ের ফাঁদ

কেবল আয় বাড়িয়ে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার পর ‘মধ্যম আয়ের ফাঁদ’-এ পড়ে আছে অসংখ্য দেশ। এর মধ্যে এমন অনেক দেশও আছে, যারা দ্রুত আয় বাড়িয়ে দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশ হতে পেরেছে। কিন্তু কয়েক দশক চলে যাওয়ার পরও দেশগুলো আর উচ্চ আয়ের দেশ হতে পারেনি। এর মধ্যে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো আটকে আছে বহুদিন ধরে। সবচেয়ে বড় উদাহরণ ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা। এমনকি চীন ও রাশিয়াও আটকে আছে মধ্যম আয়ের ফাঁদে। মূলত যারা কেবল আয় বাড়াতেই মনোযোগ দিয়েছে বেশি, অবকাঠামো, শিক্ষাসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন, রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামুখী থাকার দিকে নজর দেয়নি, তারাই আটকে আছে এই ফাঁদে। ফাঁদে না পড়ার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ দক্ষিণ কোরিয়া।

বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ

মধ্যম আয়ের দেশ হতে বাংলাদেশের দুর্বলতা আছে। তাই যা দূর করতে হবে—

১. দুর্বল অবকাঠামো
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
৩. উৎপাদন খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সীমিত সাফল্য
৪. দুর্বল অর্থনৈতিক শাসন পরিচালনা
৫. দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং
৬. বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের অভিঘাত

Vision-2021(রূপকল্প-২০২১)

লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি
Topics :::: Vision-2021(রূপকল্প-২০২১), ICT (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)

********* রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে সবার অংশগ্রহণের আহ্বান রাষ্ট্রপতির *********

প্রকাশ : ১৩ জানুয়ারি ২০১৫
রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ অর্জন এবং ‘রূপকল্প-২০২১’ বাস্তবায়নে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৫' উপলক্ষে মঙ্গলবার এক বাণীতে তিনি এ আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।'

তিনি বলেন, "সভ্যতার বিকাশে টেকসই উন্নয়নের বিশ্বজনীন অগ্রযাত্রায় সহযাত্রী হতে সরকার তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ‘রূপকল্প-২০২১’ ঘোষণা করেছে। এ রূপকল্প বাস্তবায়নে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তির একান্ত প্রয়োজন।"

রাষ্ট্রপতি বলেন, 'একটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তিনির্ভর জাতি বিনির্মাণে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ লক্ষ্যে সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত ও নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।'

তিনি বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা হলো পরবর্তী শিক্ষার ভিত্তি। সরকার দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি, বছরের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান, শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগসহ নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।'

********** রূপকল্প-২০২১ : কী, কেন, এবং কি আছে এতে ? **********
জাতির জনক ও বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন ছিল অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তি-মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন দর্শন, যা বিনির্মাণে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সমবায়কে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেয়ার কথা ভাবছিলেন। আর সে কারণেই দেশকে ২০২১ সালে একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দেয়ার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে রূপকল্প-২০২১।

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের সমবায়কে কাজে লাগিয়ে ২২টি লক্ষ্য অর্জনে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছে বর্তমান সরকার। ২২টি লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে- বিকাশমান অর্থনীতি, দারিদ্র্য মুক্তি, অংশীদারিত্বমূলক সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীর সমঅধিকার, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন ও দূষণমুক্ত পরিবেশ।

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে যে ২২টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে-

১) প্রতি গ্রামে সমবায় সমিতি গড়ে সমিতির সদস্যদের সন্তান কিংবা পোষ্যদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। এভাবে ২০১০ সালের মধ্যে প্রথিমিক স্তরে ভর্তির হার ১০০ ভাগ নিশ্চিত করা।

২) ২০১০ সালের মধ্যে দেশের সব মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থ্যা করা।

৩) ২০১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।

৪) ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা।

৫) ২০১৩ সালে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হবে ৮ শতাংশ। ২০১৭ সালে এই হার ১০ শতাংশে উন্নীত করে অব্যাহত রাখা।

৬) ২০১৩ সালে বিদ্যুতের সরবরাহ হবে ৭ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০১৫ সালে ৮ হাজার মেগাওয়াট। ২০২১ সাল নাগাদ দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা ২০ হাজার মেগাওয়াট ধরে নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৭) ২০১৩ সালে পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৮) ২০১৪ সালে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৯) ২০১৫ সালের মধ্যে সকল মানুষের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা।

১০) ২০১৫ সালে জাতীয় আয়ের বর্তমান হিস্যা কৃষিতে ২২ শিল্পে ২৮ ও সেবাতে ৫০ শতাংশের পরিবর্তে হবে যথাক্রমে ১৫, ৪০ এবং ৪৫ শতাংশ করা।

১১) ২০২১ সালে বেকারত্বের হার বর্তমান ৪০ থেকে ১৫ শতাংশে নেমে আসবে।

১২) ২০২১ সালে কৃষি খাতে শ্রমশক্তি ৪৮ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়াবে ৩০ শতাংশে।

১৩) ২০১১ সালে শিল্পে শ্রমশক্তি ১৬ থেকে ২৫ শতাংশে এবং সেবা খাতে ৩৬ থেকে ৪৫ শতাংশে উন্নীত হবে।

১৪) ২০২১ সাল নাগাদ বর্তমান দারিদ্র্যের হার ৪৫ থেকে ১৫ শতাংশে নামবে।

১৫) ২০২১ সালে তথ্য প্রযুক্তিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি লাভ করবে।

১৬) ২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৮৫ শতাংশ নগরিকের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিশ্চিত হবে।

১৭) ২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন নূন্যতম ২১২২ কিলোক্যালরির উপর খাদ্য নিশ্চিত করা হবে।

১৮) ২০২১ সালের মধ্যে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূল করা।

১৯) ২০২১ সালে গড় আয়ুষ্কাল ৭০ এর কোঠায় উন্নীত করা।

২০) ২০২১ সালে শিশু মৃত্যুর হার বর্তমান হাজারে ৫৪ থেকে কমিয়ে ১৫ করা।

২১) ২০২১ সালে মাতৃমৃত্যুর হার ৩.৮ থেকে কমে ১.৫ শতাংশ হবে।

২২) ২০২১ সালে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা।

এই ২২টি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সত্যিকার অর্থে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

********** রূপকল্প ২০২১ : দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা প্রণয়ন করছে সরকার **********

এ এন এম ফায়েজ
বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা (রোডম্যাপ) প্রণয়ন করা হয়েছে। এর নাম হবে 'দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১'। এ রোডম্যাপে সাতটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, রোডম্যাপ অনুযায়ী নির্ধারিত সাতটি উন্নয়ন অগ্রাধিকার হচ্ছে, জনগণের অংশীদারিত্বভিত্তিক প্রবৃদ্ধি এবং দরিদ্রতা হ্রাস, কার্যকরী সরকার ব্যবস্থা ও উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিশ্চিত করা, বিশ্বায়ন এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ, উন্নয়ন এবং নাগরিক কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জন, সুদৃঢ় অবকাঠামো নির্মাণসহ নগর সমস্যা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ উপশম এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিত্যনতুন উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে বেগবান করা।

নতুন এ রোডম্যাপে সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ এবং ২০২১ সালের মধ্যে ১০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ডলারে উন্নীত করা, জাতীয় সঞ্চয়ে মোট জিডিপির ৩৯ শতাংশ অর্জন করা, অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৩৮ শতাংশ অর্জন এবং ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের সংখ্যা ১৩ দশমিক ৫ শতাংশে কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তি, গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে সব ধরনের প্রয়াস নেওয়া হবে বলে রোডম্যাপে উল্লেখ করা হয়।

সূত্র জানায়, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের সীমানায় উন্নীত হতে বাংলাদেশে বানিজ্যিক উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন উদীয়মান বাজার অর্থনীতির উপযোগী করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের গড় শুল্ক হার হচ্ছে ২২ দশমিক ১ শতাংশ, চীনের ৮ দশমিক ৬ শতাংশ, মালয়েশিয়ার ৫ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ভিয়েতনামের ১১ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০১৫ সালের মধ্যেই দেশের এই গড় শুল্কহার কমিয়ে ভিয়েতনাম, মালেয়শিয়া ও চীনের শুল্ক স্তরে নামিয়ে আনা হবে। উচ্চ শুল্ক হার প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে দুর্বল করছে এবং নতুন রফতানিকে নিরুৎসাহিত করছে বলে রোডম্যাপে বলা হয়।

আর দারিদ্র্য নির্মূলের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বলা হয়, বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অনেক অগ্রগতি সত্ত্বেও বর্তমানে ৪ কোটি ৭০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। ২০১০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে দারিদ্র্যের হার ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ। সমন্বিত প্রচেষ্টায় ২০১৫ সালের মধ্যে তা ২২ দশমিক ৫ শতাংশে এবং কাঙ্ক্ষিত বছরে তা ১৩ দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।

দারিদ্র্যনিরসনের প্রধান কৌশলে বলা হয়েছে, উচ্চতর প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচারিং ও শিল্প খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দরিদ্রদের উৎপাদন উপকরণে খাসজমি, সার, সেচ ও বিদ্যুতে মালিকানা দেওয়া, সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি, পশ্চাৎপদ অঞ্চলসমূহে অবকাঠামো সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও এর বলয় বৃদ্ধি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং মাইক্রো ফাইন্যান্সের বিস্তৃতি করা হবে।

রোডম্যাপে জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বলা হয়, কয়লাভিত্তিক বিদুৎ উৎপাদনে তাগিদ দেওয়া হবে। কয়লা থেকে জ্বালানি শক্তি মাত্র ৩ দশমিক ৭ শতাংশ, যা ২০২১ সালের মধ্যে ৫৩ শতাংশে উন্নীত করা হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বর্তমানে গ্যাসের ব্যবহার ৮৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। আর এলপিজির ব্যবহার জনপ্রিয় করা হবে। এছাড়া ২০১৩ সালের মধ্যে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৮ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এ উৎপাদন ক্রমপর্যায়ে ২০১৫ সালের মধ্যে ১৫ হাজার ৩৫৭ মেগাওয়াট এবং ২০২১ সালের মধ্যে ২০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। পাশাপাশি ২০২১ সালের মধ্যে সব মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বলা হয়, বাংলাদেশকে বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত করতে হবে। এফডিআই বাড়িয়ে উচ্চ প্রযুক্তি হস্তান্তর বাড়ানো হবে। অবকাঠামো, রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক এবং নীতি পরিবেশে বিদ্যমান বাধাসমূহ অপসারণ করা হবে। শাসন ব্যবস্থা ও তদসংলগ্ন উচ্চ লেনদেন ব্যয় দূর করে সম্ভাবনাময় ও উচ্চ আয়ের খাতসমূহে আঞ্চলিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা (ভারত থেকে সফটওয়্যার তৈরি এবং চীন থেকে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী) হবে। চীন ও ভিয়েতনামের মতো আন্তঃদেশীয় বিনিয়োগ বাণিজ্য উৎসাহিত করার জন্য আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর বিশেষ অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা করা হবে। এবং প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিদেশি অংশীদারদের যৌথ বিনিয়োগে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হবে।

খাদ্য নিরাপত্তার কৌশল বিষয়ে রোডম্যাপে বলা হয়, ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে টেকসই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে ভূমির গুণাগুণ রক্ষা ও কৃষির বহুমুখীকরণ করা হবে। উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সমবায় প্রতিষ্ঠা উৎসাহিতকরণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন প্রাধান্য পাবে।

এছাড়া রোডম্যাপে প্রতিযোগিতার বিশ্ব পরিম-লে শিল্প উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাত পণ্য রফতানি, বিশ্বায়নের সুযোগ, বহুপাক্ষিকতা, আঞ্চলিক সহযোগিতা, ভবিষ্যতের পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন, শহরভিত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

এ বিষয়ে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সদস্য ড. শামসুল আলম বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের গত দুদশকে অর্জিত সাফল্যের ন্যায় বাংলাদেশও যেন ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে তার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে এ রোডম্যাপে।

********** তথ্যপ্রযুক্তি: রূপকল্প ২০২১ এবং তথ্যপ্রযুক্তি জনবল **********

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে ২০২১ সালে। অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা ও লাখ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ কেমন হবে ২০২১ সালে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন কি স্বপ্নই থাকবে? তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্য আয়ের দেশে এবং আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্য স্থির করেছে বাংলাদেশ সরকার। মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য আমাদের জিডিপি বর্তমান ছয়শত ডলার থেকে অন্তত দ্বিগুণ হতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার তৈরি করেছে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯। এ নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে ‘রূপকল্প ২০২১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ’।

এই রূপকল্পে রয়েছে ১০টি উদ্দেশ্য, ৫৬টি কৌশলগত বিষয়বস্তু এবং ৩০৬টি করণীয় বিষয়। করণীয় বিষয়সমূহ নিম্নলিখিত তিনটি মেয়াদে ভাগ করা হয়েছে :

- স্বল্পমেয়াদী (আঠারো মাস বা কম)
- মধ্যমেয়াদী (পাঁচ বছর বা কম)
- দীর্ঘমেয়াদী (দশ বছর বা কম)

বর্তমান সভ্যতা ডিজিটাল প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। কমপিউটার, মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, প্রিন্টার, ইন্টারনেট ইত্যাদি ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্র ও ব্যবস্থার উদাহরণ। ডিজিটাল প্রযুক্তি, ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ও তাদের সঠিক ব্যবহার দ্রুত উন্নয়নের চালিকাশক্তি। রূপকল্প ২০২১-এর সাথে রয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তির গভীর সম্পর্ক। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেয়া রূপকল্প ২০২১-এর উদ্দেশ্য। ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, সুশিক্ষিত, সুদক্ষ এবং সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ।

রূপকল্পে উল্লিখিত কৌশলগত ও করণীয় বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন ছাড়া স্বপ্নের সোনার বাংলা সম্ভব হবে না। এজন্য তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট অনেক কিছু করার আছে। প্রকৃতপক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল। এ লেখায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি জনবল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ এবং তথ্যপ্রযুক্তি সেবা :
বর্তমানে দৈনন্দিন ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার এজন্য অনেক রকম কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে এবং অনেক রকম কার্যক্রম চলছে। আগামী দিনের বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় হলো : ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, ই-এডুকেশন, ই-মেডিসিন, ই-অ্যাগ্রিকালচার, অর্থাৎ তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার ছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে না।

রূপকল্পের বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বা অন্যান্য সেবা পাওয়ার জন্য জনসাধারণকে অফিস-আদালতে দৌড়াতে হবে না। বাড়িতে বসে ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে জনসাধারণ অনেক ধরনের কাজ করতে পারবেন এবং অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এ ধরনের কয়েকটি উদাহরণ হতে পারে : ট্যাক্স বা কর পরিশোধ, বিভিন্ন ধরনের বিল পরিশোধ, বাস বা ট্রেনের টিকেট সংগ্রহ, সংবাদপত্র পঠন, বিভিন্ন ধরনের আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেয়া, কৃষির জন্য বালাই দমন, বাজারদর, সার ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষার ফল সংগ্রহ এবং আরও অনেক কিছু।

সরকারি এবং অন্যান্য সেবা জনসাধারণের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অফিস ও প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত জনবল ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত তথ্যকেন্দ্র থাকবে। মোবাইল ফোন, এসএমএস, ই-মেইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে এসব কেন্দ্র থেকে দ্রুত রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য সেবা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন কৃষক মোবাইল ফোনে কথা বলে, এসএমএস করে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে আবহাওয়া, বাজারদর, ফসলের বালাই দমন ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারেন। এভাবে সেবা দেয়ার জন্য থাকবে নির্ভরযোগ্য কৃষি তথ্যকেন্দ্র, চিকিৎসা তথ্যকেন্দ্র, কর তথ্যকেন্দ্র, শিক্ষা তথ্যকেন্দ্র, আবহাওয়া তথ্যকেন্দ্র, পরিবহন তথ্যকেন্দ্র এবং এ ধরনের অনেক অনেক তথ্যকেন্দ্র। উল্লেখ্য যে, রূপকল্প ২০২১-এর স্বল্পমেয়াদী অনেক করণীয় বিষয়ের অগ্রগতি সমেন্তাষজনক। প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়ানো ও গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সরকার তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক অনেক কার্যক্রম শুরু করেছে।

তথ্যপ্রযুক্তি জনবল :
ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। এদের এক ভাগ ই-সেবা দেবে এবং অপর ভাগ ই-সেবা নেবে। স্বয়ংক্রিয় উপায়ে জনসাধারণকে দ্রুত ই-সেবা বা ই-সার্ভিস দেয়ার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত তথ্য অবকাঠামো। কমপিউটারপ্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, টেলিযোগাযোগপ্রযুক্তি, ইন্টারনেট এবং সংশ্লিষ্ট হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার ইত্যাদি এই অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো স্থাপন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ জনবল থাকতে হবে। সব ধরনের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের জনবল প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। ডিজিটাল বাংলাদেশে এই বিপুল জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে গড়তে হবে ডিজিটাল গ্রাম। এ জন্য গ্রামে তথ্যপ্রযুক্তি সাক্ষরতা সম্প্রসারণ এবং তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

তথ্যপ্রযুক্তি জনবল সৃষ্টির কৌশল :
বাংলাদেশের সব মানুষ হবে শিক্ষিত এবং তাদের থাকবে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে জানা-শোনা। এ ধরনের সমাজকে বলা হয় জ্ঞানভিত্তিক সমাজ। ডিজিটাল বাংলাদেশের জ্ঞানভিত্তিক সমাজের জন্য প্রয়োজন হবে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল। ডিজিটাল অবকাঠামো

স্থাপন, পরিচালনা এবং তথ্যসেবা দেয়ার জন্য প্রয়োজন দক্ষ তথ্যপ্রযুক্তিবিদ এবং তথ্যসেবা নেয়ার উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা নেয়ার উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সব স্তরে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে সহজ উপায়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ রাখতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তর সম্পন্ন করার পর অনেক শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা স্তরে প্রবেশ করে না। তাই সব ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। আশার কথা, এ যে এসব বিষয়ে বর্তমান সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।

তথ্যসমাজের প্রতিটি স্নাতক সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবশ্যই তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবেন। এজন্য সব বিষয়ের স্নাতক পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে অন্তত একটি কোর্স থাকতে হবে। এছাড়া পঠন-পাঠনের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব প্রচেষ্টা শুরু হলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজসমূহে এ সুযোগ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের সব বয়স্ক জনগণকে তথ্যসমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে ও অফিস-আদালতে এ ধরনের প্রশিক্ষণের প্রসার ঘটান প্রয়োজন।

ডিজিটাল গ্রাম গড়তে না পারলে ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্ভব নয়। ডিজিটাল বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরের মধ্যে তথ্যসেবা এবং তথ্য সুযোগ-সুবিধার কোনো পার্থক্য থাকবে না। এজন্য গ্রামে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। উপজেলা ও ইউনিয়ন প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতিটি গ্রামে তথ্যসেল বা তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। এই সেলের মাধ্যমে গ্রামবাসী ডিজিটাল বাংলাদেশ সরকারের সব ধরনের কর্মকান্ড সম্পর্কে সরাসরি অবহিত হবেন। এ সেলের মাধ্যমে মোবাইল ফোন, এসএমএস, ই-মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে জনসাধারণ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবহাওয়া, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে দ্রুত টাটকা খবর সংগ্রহ করবেন। বিনোদন ও প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার হবে এই সেল বা কেন্দ্র।

তথ্যপ্রযুক্তি সেবা পরিকাঠামো :
ডিজিটাল বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সরকার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দেশব্যাপী বিস্তৃত তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো। বিশাল এ অবকাঠামো স্থাপন, সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণসহ জনগণের দোরগোড়ায় তথ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ বিশাল কর্মীবাহিনী। কমপিউটার অপারেটর থেকে শুরু করে প্রোগ্রামার, অ্যানালিস্ট, প্রকৌশলী, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপকসহ বিভিন্ন সেবক ও পরিসেবক এ কর্মীবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে একটি সমৃদ্ধশালী, স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা রূপকল্প ২০২১-এর উদ্দেশ্য। তথ্যপ্রযুক্তির অপরিসীম সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা অনুযায়ী বিশাল তথ্যপ্রযুক্তি জনবল প্রয়োজন। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে এ জনবল সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে সাক্ষরতা দানের ব্যবস্থা নেয়া। এছাড়া দেশব্যাপী বিস্তৃত বিশাল তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামোনির্ভর প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার

জন্য প্রয়োজন বিশেষ তথ্যপ্রযুক্তি সেবা পরিকাঠামো।
লেখক : অধ্যাপক, সিএসই বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান সেভাবে আলোচনায় আসে নি। স্বাধীনতার ইতিহাসে নারী নির্যাতন ও ধর্ষনের কথা যতটা উঠে এসেছে , নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনের কথা সেভাবে উঠে আসে নি। কিছু গবেষণা ও সাহিত্যকর্মে, বিশেষ করে গল্প-উপন্যাসে তাদের কথা উঠে এসেছে। কিন্তু ফলাও করে তাদের অবদানের কথা সেভাবে লিখেন নি কেউ। এ ব্যর্থতা আমাদের। এ ব্যর্থতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ব্যবসায়িক মনোভাবাপন্ন লেখক গোষ্ঠীর, ইতিহাসবেত্তাদের। ব্যর্থতা আমাদের গণমানুষের। নারী উন্নয়ন নীতিকে পাশ কাটিয়ে আমরা নানাবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ণ করেছি। স্বাধীনতার ৪২ বছরে নারী উন্নয়নের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,ঠিক যেভাবে রুপরেখা প্রণীত হয়েছে ,তার সিকিভাগও বাস্তবায়ন হয়নি। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে নারী উন্নয়ন। রাজনৈতিক ইস্যু বিতর্কের সৃষ্টি বৈ কিছু করতে পারে নি।

বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। বহুল আলোচিত এ প্রত্যয়টিকে এখন সামাজিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেবলমাত্র মানবেতর অবস্থা থেকে নারীর মুক্তি বা নারী উন্নয়নের জন্যই নয়, পৃথিবী মুখোমুখি এমন সকল সমস্যার সমাধানে প্রধান ও প্রথম ধাপ হিসাবে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। কেবল আন্তর্জাতিক পরিসরে নয়, বাংলাদেশেও স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পরিসরে যে কোনো নীতি নির্ধারনী আলোচনায় বা সমস্যা সমাধানে নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আদতে হচ্ছে টা কি ? পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ, পিতৃতন্ত্রের সপক্ষে রচিত আইন কানুন, ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি, আধুনিকায়ন উন্নয়ন কৌশলের অনুসরণ, পরিবেশ বিপর্যয় ইত্যাদি নানা কারণে বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। নারী বান্ধব আইনগুলো বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। নারীর প্রতি দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তন তো দূরে থাক, নারীকে মানুষ ভাবতেই যেন বয়ে গেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের।

একটি জরিপ দেখুন। জাতিসংঘ জনসংখ্য তহবিলের পরিচালিত এই জরিপে ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন গ্রামের ৫০২ টি পরিবারের পুরুষ সদস্যরা অংশ নিয়েছিল। এই পুরুষ সদস্যরা নারীর অধিকার নিয়ে যা ভাবে তা দেখুন-
একটি জরিপে গ্রামের সবচেয়ে প্রকট সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে মাত্র ৩পুরুষ % গ্রামবাসী নারী নির্যাতনের কথা উল্লেখ করেছেন। বাকি ৯৭পুরুষ এলাকার % বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে নারী নির্যাতনকে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য প্রসঙ্গে ৩০উত্তরদাতা % পুরুষ কোন মন্তব্য করেননি। জরিপে উত্তরদাতা পুরুষের ৫৩র মতনারীর অধিকারের পক্ষে তাদে %৬. ব্যক্ত করেছে । আর ৬০পুরুষ উত্তরদাতা মন্তব্য করেছে যে নারীদের % অধিকার সম্পর্কে কিছু জানানোর দরকার নেই। ৬৫পুরুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে % স্ত্রীকে মারধর করা সমর্থন করে, ৫১পুরুষ মনে করে সমাজে নারীর অবাধে% চলাফেরা উচিৎ নয়, ৬০চলাফেরা পুরুষ দ্বারা পুরুষ মনে করে নারীর % নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, ৭০পুরুষ মনে করে মেয়েদের অবশ্যই পর্দা করা উচিত % ,৯৭নারী নির্যাতনকে তার এলাকা % বা সমাজের একটি সমস্যা বলে মনে করে না, ৬০পুরুষ মনে ক%রে স্বামীর কথা মত স্ত্রীর চলা উচিত, ৯৭ নারীর % ধারণ মাতৃত্ব নারীর একটি প্রধান চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য , ৬০উত্তরদাতা পুরুষ মনে % করে স্বামী পরিত্যক্তা নারীর কাছ থেকে কোন রকম অর্থনৈতিক সুবিধা বা সাহায্য পাওয়া উচিত নয়। (জাতিসংঘ জনসংখ্য তহবিল জরিপ :তথ্যসূত্র)

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে সবকটি বিষয়কেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত করে দেখা দরকার। অবশ্য এটা ঠিক যে, নারীদের মধ্যকার একটা ক্ষুদ্র অংশ আজ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অংশত ক্ষমতায়িত হয়েছেন। সময়ের পরিক্রমায় বর্তমান অবস্থায়ও এ সংখ্যা আরো বাড়বে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা এ গতিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারছি না। গতি আরো বাড়াতে হবে, সেজন্য বড়ো বড় প্রতিবন্ধকতা দূর হবার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অনেক পদক্ষেপও গ্রহণ করতে হবে।
সংকট নিরসনে সমাজবিজ্ঞানীরা বেশ কিছু উপায়ও বের করেছেন। তাদের কথা শুনে যা জানা গেল. . .
নারীর ক্ষমতায়নের প্রাথমিক ধাপ
১এবং রূপান্তর করা। পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও নারীর অধঃস্তনতার অনুশীলনকে চ্যালেঞ্জ .
২কাঠামো ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান যা নারীর প্রতি বৈষম্যকে সমন্বিত ও .জোরদার করে তা পরিবর্তন করা। যেমন ঃ পরিবার, শ্রেণি, জাতি, বর্ণ, প্রথা, ও সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠান ধর্মীয়, শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রচার মাধ্যম, আইন এবং উন্নয়ন মডেল ইত্যাদিসহ সবকিছু রূপান্তর করা।
৩বস্তুগত সম্পদ জ্ঞান এবং সম্পদের উপর অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রন। .

যদি গার্হস্থ্য দায়দায়িত্বগুলো পরিবারের সবাই মিলে ভাগ করে করবার- সংস্কৃতি তৈরি করা যায়, তাহলে নারী নিজেকে বিকশিত করবার সুযোগ পাবে। গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালন সহজ করার জন্য প্রত্যেক ঘরে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য সু - ব্যবস্থাপনা পৌঁছে দিতে হবে। পর্যাপ্ত শিশু দিবা যতœ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, যাতায়াত সুগম করতে হবে। এসব করা হলে সংসার সামলে নারী অন্য কাজে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে অংশ নিতে পারবে। তাছাড়া এতে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালন করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। এর বাইরে বিয়ে করা নাকরা এবং কটি সন্তান-, কখন নেবে নানেবে ইত্যাদি- ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার স্বাধীনতা যদি নারীরা ভোগ করতে পারে, তাহলে তাদের এই ক্ষমতায়নের পথে অগ্রসর হওয়া আরও একটু সহজ হবে। আর এসব সুযোগ সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্র নারীদের দিয়েই রেখেছে, এখন দরকার আমরা যারা তাদের সেই সুযোগ ভোগে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছি প্রতিনিয়ত, তাদের এ কাজে নিরস্ত হওয়া।

নারী আজও যেমন উত্তরাধিকারে সমঅধিকার অর্জন করতে পারে নি; এমনকি একমাত্র সন্তান মেয়ে হলেও সে সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার পায় না। এই বিধান সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। নারীর ক্ষমতায়নকে এগিয়ে নিতে এবং সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য নারীকে এ অধিকার দিতে হবে। সেজন্য প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী রাজনৈতিক দলসমূহের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ৩৩ শতাংশ নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ১০০ করা ও এসব আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে এলে নারী সংসদ সদস্যদের জন সম্পৃক্ততা বাড়বে। এতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও জনগণের প্রতি জবাবদিহিতার মানসিকতা তৈরি হবে। উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের কার্যক্রমের পথে দেখা দেওয়া বাধাগুলো অপসারণেও।

দক্ষিণ এশিয়াতে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। যথা: সমন্বিত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ও সচেতনতা বৃদ্ধি।

১সমন্বিত উন্নয়ন তত্ .ত্বের মূল দর্শন হলো, পরিবার ও সামাজিক সমাজের উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো নারী উন্নয়ন।

২অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো ., যে বিষয়গুলো নারীর অধস্তনতা সৃষ্টি করে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে।

ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ উইথ উইমেন ফর নিউ ইরা নারীর (ডি এ ডব্লিউ এন)- ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা ব্যখ্যা করতে গিয়ে বলেছে -'এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে জেন্ডার বৈষম্য বিহীন এক পৃথিবী গড়ে তোলা। যে পৃথিবীতে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার নিজের জীবনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম।'

নারীর ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ হচ্ছে ক্ষমতার- উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন। নাজমা চৌধুরী 'নারীর ক্ষমতায়ন : রাজনীতি ও নারী' শীর্ষক প্রবন্ধে যে লক্ষ্যগুলির বর্ণনা করেন তাহলোনারীর সুপ্ত প্রতিভা এবং সম্ভাবনার পূর্ণ - বিকাশের সুযোগ, নারীর জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সিদ্ধান্ত সমূহে অংশগ্রহণের সুযোগ নিজের জীবন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিমন্ডল, পরিধি ও সম্ভাবনার বিস্তার।

সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ , দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহ্যকে বিবেচনায় না এনে কোন প্রক্রিয়াতেই নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। সংস্কার বা পরিবর্তন হঠাৎ করে জোর করে চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয়। আধিপত্যশীল সংস্কৃতির বিদ্যমান অবস্থার সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে নতুন করে সমস্যা বাড়াবে। তাই ধীরে ধীরে কৌশলে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হবে। যাতে কারো প্রতি সুবিচার করতে যেয়ে কারও প্রতি অবিচার না হয়ে পড়ে। নিজস্ব স্বকীয়তা, সংস্কৃতি আত্মপরিচয় হুমকির মুখে না পড়ে। গভীরে প্রোথিত শিকড়ে টান না লাগে, মানসিকভাবে নতুন করে ভাবতে, চিন্তা করতে, মনমানসকে - প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য মানসিক পরিবর্তন ও চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। যা হঠাৎ হয়ে যাবে না। সরকারী বেসরকারি কর্মকান্ডের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক মানবিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বৃহত্তর জনমানুষের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সাথে সমন্বয় করে এগিয়ে যেতে হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে চিন্তাশীল মানুষকে আরও সজাগ হতে হবে। সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। নারী সমাজের জীবনের বাস্তব দিকগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা এবং তার অবস্থান কোথায় বা কোথায় থাকা উচিত তা উপলব্ধি করতে পারাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির পরও আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন না হওয়াটা দুঃখজনক। সহিংসতা সম্বন্ধে সমাজে সচেতনতার এই অভাব পূরণে সম্মিলিত প্রয়াস চালাতে হবে।

নারীর প্রতি সহিংস আচরণ সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে রাজনৈতিক সহিংসতা ছাড়াও সামাজিক সহিংসতা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে যা মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলছে। মানব সমাজ জ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক দিয়ে যতটা সভ্যই হোক না কেন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিতান্তই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।
নারীর সহিংসতা, নির্যাতন, নিপীড়ন, বঞ্চনা বৈষম্য এগুলো মোটেই কাম্য নয়। আর অযৌক্তিক আচরণ দূর হোকএ – প্রত্যাশা আমাদের। সত্যিকারার্থে নারীকে যথার্থ মূল্যায়ন না করে সুন্দর শান্তিময় সমাজ গঠনে কার্যকর ভূমিকা আশা করাটাও ঠিক হবে না। নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্বের সাথে দেখা দরকার, এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করে যৌক্তিক পন্থায় সবাই এগিয়ে আসুক এটাই আহ্বান।

কিন্তু এসব কিছুর পরও হাটিপা করে নারীরা এগিয়েছে অনেক দূর।- পা –হাটি – নানা বাধার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বাঙালি নারীরা এখন অগ্রদূত। শত প্রতিকূলতায়ও নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে তারাই এখন রোল মডেল। যে কয়েকটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশেষভাবে সামনে এগিয়ে গেছে বলে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়েছে , যেমন সামাজিক উন্নয়ন, ধারাবাহিক অর্থনৈতিক গতিশীলতা, আন্তর্জাতিক মন্দার ধাক্কা সামলানো, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহার, তৃণমূল পর্যায়ের ক্ষমতায়ন, ভোটার হিসেবে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ, পোশাক রফতানিতে প্রথম সারিতে স্থান লাভ, ইত্যাদি সবকটির পেছনেই নারীর অবদান উল্লেখযোগ্য।
রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক থেকে দেখলে বলা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে নারীরা এক্ষেত্রে ক্রমাগত যে সাফল্য অর্জন করেছে, সরকারের বর্তমান মেয়াদে তা সর্বাপেক্ষা বেশি। ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে সরাসরি ভোটে মাত্র ৫ জন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরে ১৯৯১জন ৪এর নির্বাচনে –, ১৯৯৬এর– নির্বাচনে ১১ জন ও ২০০১এর – জন নারীর বিজয়ের রেকর্ডকে টপকিয়ে ৬নির্বাচনে ২০০৮সরি নির্বাচিত হয়ে জাতীয় জন নারী সরা ১৯এর নির্বাচনে – সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন। এদিকে সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনীতে ২০১১ সালে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০৬৯এ। সব মিলিয়ে চলতি সংসদে সর্বমোট – জন নারী সংসদ সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদে নারীসমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও সংসদ উপনেতার প্রত্যেকেই নারী। হুইপ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসেবেও কাজ করছেন তাঁরা। এছাড়া বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভায় এ মূহুর্তে পররাষ্ট্র, কৃষি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের পূর্ণমন্ত্রী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করছেন তাঁরা।
নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী ভোটারের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১২ লাখ ৩৬ হাজার, যা পুরুষ ভোটারের চেয়েও প্রায় ১৫ লাখ বেশি। সরকারিবেসরকারি তৎপরতায় তৃণমূলসহ সকল পর্যায়ে– রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ায় নারীরা ভোটার হিসেবে অংশ নিয়েছিল অন্য যেকোনো নির্বাচনের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ এই নির্বাচনে নারীরাই প্রার্থীদের জয়পরাজয়ের – গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন।

স্থানীয় সরকার, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নারীর ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ পৃথিবীর মধ্যে নজিরবিহীন। সর্বশেষ ২০০৩ সালের পর বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেশের চার হাজার ৫০৪টি ইউনিয়নে সংরক্ষিত কোটায় সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিয়ে ১৩ হাজার ৫১২ জন নারী সদস্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। এর পাশাপাশি ২৩২ জন নারী চেয়ারম্যান নির্বাচন করেছেন এবং জয়ী হয়েছেন ২২ জন। সারা দেশে ৪৮২টি উপজেলার মধ্যে ৪৮১টির নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি। এর মধ্যে সংরক্ষিত কোটায় ৪৮১ জন ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়াও সরাসরি নির্বাচনে তিনজন নারী উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। কাজ করছেন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পৌর কাউন্সিলর নারীরাও। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রভাবশালী পুরুষ প্রার্থীকে হারিয়ে মেয়র নির্বাচিত হবার গৌরবজনক স্থানটিও দখল করে নিয়েছেন একজন নারী।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে সচিবালয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কর্মরত ৮ হাজার ৬০০ জন কর্মকর্তার মধ্যে এক হাজার ২৪৬ জন নারী। সচিব ও সমমানের ৬৯ জন কর্মকর্তার মধ্যে নারী ৪ জন। ১৫৭ জন অতিরিক্ত সচিবের মধ্যে নারী ৯ জন এবং ৪২৯ জন যুগ্ম সচিবের মধ্যে নারী ২৭ জন। সব মিলিয়ে প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ ১৫ শতাংশ।
জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পদে স্থানীয় প্রশাসনের প্রধান হিসেবে নারীরা সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। মাত্র ১৪ জন সদস্য নিয়ে ১৯৭৪ যাত্রা শুরু করা বাংলাদেশ পুলিশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে এখন নারীরা অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ২০০৯ সালের হিসেবে পুলিশ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯৩৭ জন; যাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদেও একজন ডিআইজি), ৪ জন অতিরিক্ত ডিআইজি, অতিরিক্ত এসপি ১৯ জন, সিনিয়র এএসপি ১০ জন, এএসপি ৭৭ জন, ইন্সপেক্টর ৫৩ জন, এসআই ১৮৯ জন, এএসআই ও হেড ২০১১অনেকে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। (জন ২৫৩কনস্টেবল –

সাল থেকে ৩৭১ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে নতুন একটি নারী ইউনিট। একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে ১১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের এই ইউনিটটি ৭০০র- অধিক সদস্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাটালিয়ন হবার দিকে যাত্রা শুরু করেছে। ইতোমধ্যে চালু হয়েছে 'উইমেন পুলিশ নেটওয়ার্ক'। এছাড়া জাতিসংঘ শান্তি মিশন, র‍্যা পিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, স্পেশাল ব্রাঞ্চের ট্রেনিং স্কুল এবং থানার ওসি হিসেবেও সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন ও করছেন আমাদের নারীরা। নারীরা আজ সাফল্যের সাথে কাজ করে চলেছেন সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীতেও, যাঁদের অনেকে গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্বে নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী দেশের ৫ কোটি ৪১ লাখ কর্মজীবীর মধ্যে এক কোটি ৬২ লাখ নারী। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৬ শত ৯৭ জন। বিদেশে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত ৭৬ লাখ প্রবাসীর মধ্যে ৮২ হাজার ৫৫৮ জন নারী। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধানতম ক্ষেত্র গার্মেন্টস খাতের ৮০ ভাগ কর্মীই নারী। দেশের ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহারকারীও নারী। অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারাকাতের এক গবেষণায় জানা যায়, নারী বিনা পারিশ্রমিক ও কম পারিশ্রমিকে যে পরিমাণ শ্রমদান করে, তা টাকার অংকে জিডিপির শতকরা ৪৮ ভাগ। এই চিত্র নারীর অর্থনৈতিক অবদানের ব্যাপ্তিটা সামনে হাজির করে, যার মাধ্যমে জাতীয় আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে আজ আমাদের নারীসমাজ।

আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবেও নারীরা সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করছেন অনেকে।

বর্তমান সরকারের মেয়াদে গঠিত তথ্য কমিশনে কমিশনার হিসেবে কাজ করছেন একজন নারী। জেলা তথ্য বাতায়ন এবং জাতীয় ইতথ্যকোষ বর্তমান সরকারের এক- যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ইতথ্যকোষ তথ্যপ্রযুক্তির সাথে পরিচিত নারীর - হাতে তার জীবন ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় সব ধরনের তথ্য কৃষি), শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন ও মানবাধিকার, নাগরিক সেবা, পর্যটন, অকৃষি উদ্যোগ, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, শিল্প ও বাণিজ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান পৌঁছে (দিয়েছে, যা তাদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সাংবাদিকতার মতো পেশায় সাম্প্রতিক সময়ে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। এটা ঠিক যে, মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারী অংশগ্রহণ এখনো প্রায় নেই বললেই চলে। তবু নারীদের এই খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অংশগ্রহণ তাদের সমস্যা, সম্ভাবনা ও অর্জনকে গণমাধ্যমে হাজির করার ক্ষেত্রে অনুকূলতা দিয়েছে।

========নারী বান্ধব বিভিন্ন আইন========

মহান সংবিধানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার স্বীকৃত হবার পর ক্রমান্বয়েই নারী দৃঢ়ভাবে সামনে এগিয়ে গিয়েছে। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক 'নারীবর্ষ' ঘোষিত হলে সে অনুযায়ী বাংলাদেশ বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে সক্রিয় হয়। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬ বছরকে ১০মেয়াদের ১৯৮৫-'নারী দশক' হিসেবে ঘোষণার প্রেক্ষাপটে নারী অধিকারের বিষয়গুলো উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে দেশের সর্বস্তরের নারীদের সার্বিক উন্নয়ন ও অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি মহিলা সংস্থার রূপরেখা প্রণীত হয়। ১৯৯১ সালে যা জাতীয় মহিলা সংস্থা একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। এই সংস্থা সরকারের পক্ষ থেকে নিয়মিত যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে, তা অধিকার সচেতন করার পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। নারীদের কল্যাণে আলাদাভাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন, জাতীয় সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নারীর সুরক্ষা ও অগ্রগতির জন্য ক্রমশ প্রণীত হয়েছে মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইন (রেজিস্ট্রিকরণ), যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, নারী নির্যাতন আইন (নিবর্তন), প্রাথমিক শিক্ষা আইন (বাধ্যতামূলককরণ), পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, পারিবারিক আদালত বিধিমালা, এসিড অপরাধ দমন আইন, স্থানীয় সরকার আইন (পরিষদ ইউনিয়ন), স্থানীয় সরকার আইন (উপজেলা পরিষদ), স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধন), জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, পারিবারিক সহিংসতা (ধ ও সুরক্ষাপ্রতিরো) আইন প্রভৃতি। নারীর অনুকূলে আইনবিধি ও নীতিমালার মধ্যে সিডও সনদের- ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি

একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য পদক্ষেপ, ২০০৪ এ-রাজনৈতিকভাবে নেতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হলেও পরে ২০১১এ - ত হয়েছে। এই নারী উন্নয়নএসে যা পুনরায় চূড়ান্তভাবে গৃহী নীতিই স্থানীয় সরকারের সংরক্ষিত আসনে নারীদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবার সুযোগ উন্মুক্ত করে দিয়েছে; যা তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের ক্ষমতায়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এছাড়া নির্বাচন কমিশনার নিয়োগবিধির খসড়ায় একজন সিইসি ও দুজন কমিশনারের একজন নারী নিয়োগের বিধান রাখা, রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করে করা নির্বাচন কমিশনের বিধান, সন্তানের পরিচয়ে বাবার নামের পাশে মায়ের নাম বাধ্যতামূলক করা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে ৬০ শতাংশ নারী নিয়োগের বিধান প্রভৃতি সিদ্ধান্তও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নারীর ক্ষমতায়ন হলো নারীর স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সমাজেরাষ্ট্রে সিদ-পরিবারে-্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অর্জন। নারীর ক্ষমতায়নকে উপলক্ষ করে সাম্প্রতিক যে সকল ইতবাচক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তা হলো-

* সিডও সনদ বাস্তবায়নের লক্ষে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ প্রণয়ন।

* জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে নারীর জন্য সরাসরি ভোটে ভাইস চেয়ারম্যানের পদটি সংরক্ষণ করা।

* নির্বাচন কমিশনার নিয়োগবিধির খসড়াতে একজন সিইসি ও দুজন কমিশনারের একজনকে অবশ্যই নারী নিয়োগের বিধান রাখা

* নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ রাখার বিধান জারি।

১৯৭৪ সালে মুসলিম বিবাহ ও তালাক সালে যৌতুক ১৯৮০আইন এবং (রেজিস্ট্রিকরণ) নিরোধ আইন প্রবর্তন করা হয়, যা নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষভাবে সহায়ক হয়। ১৯৮৩ সালে প্রবর্তিত নারী নির্যাতন অধ্যাদেশ (নিবর্তন শাস্তি) নারীর প্রতি সহিংসতা রোধের ক্ষেত্রের ভূমিকা রাখে। নারীর প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষে ১৯৮৫ সালে জারি করা হয় পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ। ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন চালু হয়।
উন্নয়নের সঙ্গে জেন্ডারধারণাকে- যুক্ত করার বিষয়টি অবশ্য আরো গতি পায় ১৯৯৫ সালের জাতিসংঘস্ত্রণীত মানব উন্নয়ন রিপোর্টটি প্রকাশের পরে। এই রিপোর্টে মানবসমাজের অংশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য পক্ষ হিসেবে নারীকে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে ২৮অনুচ্ছেদ), ২৯, ৬৬ ও ১২২-অবশ্য আগেই নারী (পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। সরকারি কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সংসদের ১৫টি আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।
২০০০ সালে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' নির্ধারণ করে যে আটটি লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয় তার তৃতীয়টি হলো প্রমোট জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে নারীপুরুষের বৈষম্য নিরসনের- আনুষ্ঠানিক লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় নারী নীতি প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯৭-

======মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প সমূহ======

১মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক ., এন্ডোক্রিন মেটাবলিক হাসপাতাল এই প্রকল্পের - লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রিন ও মেটাবলিক হাসপাতাল স্থাপনের মাধ্যমে মহিলা ও শিশু রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান।
২নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতার উন্নয়ন ও নারীর . ক্ষমতায়ন প্রকল্প এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী ও মেয়ে শিশুরা যাতে প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, সে জন্য নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করা ও নারীপুরুষ সমতার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের- সূচনা করা।
৩. Vulnerable Group Development for Ultra-Poor Project (VGDUP) - এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে দুঃস্থ মহিলারা যাতে আত্মকর্মসংস্থানমূলক ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নিয়োজিত হতে পারে এ লক্ষ্যে তাদের প্রশিক্ষণ ছাড়াও নগদ

ভাতা প্রদান, সম্পদ সরবরাহ, ও সঞ্চয় বৃদ্বিতে সহায়তা করা) Subsistence allowance, IGA Training, Productive Asset)
৪. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ৫টি বিভাগীয় শহরে ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ - এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে ৫ টি বিভাগীয় শহরে চলমান মহিলা সহায়তা কর্মসূচীর জন্য অফিস কাম সেলটার হোম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ। আশ্রয়হীন এবং অসহায় মহিলাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার ব্যবস্থা করা এবং তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৫নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির কর্মজীবী . মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযতœ কর্মসূচী প্রকল্প এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও - উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির কর্মজীবী মহিলাদের ছোট শিশুদের (বছর বয়স ৬মাস থেকে ৬) নিরাপদ দিবাকালীন সেবা প্রদান করার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটিতে ১০টি ডেকেয়ার কেন্দ্র স্থাপন করা।-
৬জ .েলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (য় পর্যায়২) প্রকল্প এই প্রকল্পের - লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষিত বেকার মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের- মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। নারী সমাজকে মানব সম্পদে পরিনত করার লক্ষ্যে ধ্যানধারণাগত পরিবর্ত-নে উৎসাহ যোগানো এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষাদান।
৭ .'নগরভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন' প্রকল্প এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আয় বর্ধনমূলক - ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে ২৭৬০০ নিম্ন আয় সম্পন্ন গরীব ও সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ৬টি বিভাগে ৪৬টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। প্রশিক্ষিত মহিলাদের তৈরী পণ্য বাজারজাত করণের আউটলেট তৈরী করা।
৮(ইএলসিডি) শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা . প্রকল্প -০এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে -৫ বছর বয়সী শিশুদের পারস্পরিক যতœ এবং শিশু বিকাশের অনুকূল নিরাপদ পরিবেশে প্রাকশিক্ষা - কেন্দ্র, বাড়িতে ও কমিউনিটিতে প্রাকশিক্ষা - কার্যক্রমে শিশুদের অংশ গ্রহণ এবং তাদের বুদ্ধি বৃত্তি, সামাজিক, ভাষাগত ও আবেগিক বিকাশ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার উপযোগী করে গড়ে তোলা । প্রকল্পের আওতায় Early Learning Development Standards (ELDS) Ges Early Childhood Development এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। শীঘ্রই চড়ষরপু ঋৎধসব ড়িৎশ চূড়ান্ত অনুমোদন করা হবে।
৯. সিসিমপুর আউটরীচ প্রকল্প এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও - উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের প্রাকপ্রাথমিক শি-ক্ষা প্রদান এবং সিসিমপুর নাটকের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রাকবিষয়ে বিলবোর্ড প্রাথমিক শিক্ষা- প্রদর্শন। প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে - গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রেডিও, টিভিপ্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের শিশুদের বিকাশ বিষয়ে-তে প্রচারনা। প্রাক- প্রশিক্ষণ। প্রাকপ্রাথমিক শিশুর বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণ।- প্রাকর নাটক প্রদর্শন। শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিসিমপু- অভিভাবককে শিশুদের লালনপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ-।
১০টি৬বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর . জেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মান প্রকল্প এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - হচ্ছে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৬টি জেলার নিজস্ব জমিতে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক অবকাঠামো স্থাপন। শিশুর মেধা ও মনন বিকাশে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে দেশি ও আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপনে জেলার সিভিক পয়েন্ট হিসাবে সরকারিবেসরকারি- সংস্থা ও এনজিও, দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করবে। প্রশিক্ষণ, লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম স্থাপনের মাধ্যমে জেলায় শিশুর মেধামনন বিকাশের মাধ্যম হিসাবে জেলাসমূহে কার্যক্রম বিস্তৃত করা।-
১১. পলিসি লিডারশিপ এ্যান্ড এ্যাডভোকেসী ফর জেন্ডার ইকুয়্যালিটিপ্রকল্প। এই ২- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান করা। বিশেষ করে নারীর সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জেন্ডার সমতাকরণ, ক্ষমতায়ন ও সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা।
১২ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর মনিটরিং . চাইল্ড রাইটস এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশু সংক্রান্ত নীতির- বিশ্লেষণ, কার্যকরী সমন্বয়, ঈজঈ রিপোর্টিং ও ঈজঈ অনুযায়ী শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়াদি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।
১৩এমপাওয়ারম .েন্ট এ্যান্ড প্রটেকশন অব চিলড্রেন এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - (ইপিসি) হচ্ছে শিশুদের যৌন নির্যাতন, হয়রানী ও জেন্ডার বৈষম্যসহ সকল প্রকার নির্যাতন প্রতিরোধ এবং যৌন নিপীড়ন হতে নারী ও শিশুকে রক্ষা করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা । কিশোরী মেয়েদের সমসঙ্গী পদ্ধতিতে শিক্ষাদান এবং জীবন দক্ষতা ও জীবিকা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
১৪. নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রকল্প য়২) পর্বএই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস - (সেন্টার (ওসিসি('র মাধ্যমে শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন ও দগ্ধ মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা, পুলিশি সহায়তা, ডিএনএ পরীক্ষা, মানসিক কাউন্সেলিং এবং আশ্রয়সেবা।

********* তিস্তায় বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা ********
ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের মধ্যে যে কয়টি বিষয় নিয়ে খুব বেশি টানাপোড়েন চলছে, তার মধ্যে তিস্তা ইস্যু একটি। উত্তরাঞ্চলের কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন তিস্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষ করে তিস্তা অববাহিকার ৫ হাজার ৪২৭টি গ্রামের মানুষ তাদের জীবিকার জন্য এই নদীর ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই তিস্তার পানির প্রবাহ কমে যাওয়া আমাদের জীবন ও জীবিকায় আঘাতস্বরূপ। তিস্তা অববাহিকার ৮ হাজার ৫১ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে পড়েছে। আর সমতল ভূমিতে তিস্তা অববাহিকার পরিমাণ ৪ হাজার ১০৮ বর্গ কিলোমিটার, যার প্রায় অর্ধেক অংশ পড়েছে বাংলাদেশের সীমানায়। দুই দেশই তিস্তার পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সময়ে নদীর ওপর ও আশপাশে ব্যাপক অবকাঠামো তৈরি করেছে। ভারত এই মুহূর্তে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচ কার্যক্রমের জন্য তিস্তার পানি ব্যবহার করছে, অন্যদিকে বাংলাদেশ তিস্তার পানি ব্যবহার করছে শুধু পরিকল্পিত সেচ দেওয়ার কাজে।

কিন্তু গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে ভারতের একচেটিয়া পানি প্রত্যাহারের কারণে বাংলাদেশ অংশে তিস্তার পানি ক্রমাগত কমে গেছে। এর দরুন তিস্তার পানির ওপর নির্ভরশীল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১২টি উপজেলা যেমন: ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, রংপুর সদর, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, গঙ্গাচরা, পার্বতীপুর, চিরিরবন্দর ও খানসামা, যারা তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি জমিতে সেচসুবিধা পেয়ে থাকে, তাদের কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এখানে বলা প্রয়োজন, আউশ ও আমন মৌসুমে ভারতের পানি প্রত্যাহারের পরও তিস্তা নদীতে পর্যাপ্ত পানি থাকে, যার ফলে সেচ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয় না। তিস্তায় পানির প্রবাহ কমে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশ শুধু শুষ্ক মৌসুমে বোরো উৎপাদনের ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ শুষ্ক মৌসুমে অন্যান্য সময়ের তুলনায় তিস্তা নদীতে পানির প্রবাহ কম থাকে। ভারত তার ৬৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জলবিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ৫ লাখ ৪০ হাজার হেক্টর জমির সেচের চাহিদা মিটিয়ে যে পরিমাণ পানি ছাড়ে, তা দিয়ে বোরো মৌসুমে আমাদের সেচ চাহিদার অর্ধেকও পূরণ করা যায় না। ১৯৯৭ সালে বাংলদেশে শুষ্ক মৌসুমে তিস্তায় পানির প্রবাহ ছিল প্রায় ৬ হাজার ৫০০ কিউসেক, যা ২০০৬ সালে নেমে আসে ১ হাজার ৩৪৮ কিউসেকে এবং ২০১৪ সালে পানির প্রবাহ এসে দাঁড়ায় মাত্র ৭০০ কিউসেক, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
এখন আসা যাক শুষ্ক মৌসুমে পানি কম পাওয়ার কারণে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি কতটুকু হচ্ছে তার পরিমাণের ওপর। ১৯৯৩-৯৪ শস্যবছর থেকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১২টি উপজেলায় ব্যাপকভাবে আউশ ও আমন উৎপাদনের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিস্তার পানি দিয়ে সেচ কার্যক্রম শুরু হয়। পরে ২০০৬-০৭ শস্যবছর থেকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বোরো মৌসুমেও সেচ কার্যক্রম প্রসারিত করা হয়। আমন মৌসুমে মোট সেচযোগ্য ৭৯ হাজার ৩৭৯ হেক্টর এলাকার প্রায় সম্পূর্ণটাই সেচের আওতায় আনা সম্ভব হলেও বোরোর ক্ষেত্রে পানির দুষ্প্রাপ্যতায় সেচ-সাফল্যের চিত্র একেবারেই হতাশাজনক। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৬-০৭, ২০০৮-০৯ ও ২০১৩-১৪ শস্যবছরে সর্বমোট সেচযোগ্য ৭৯ হাজার ৩৭৯ হেক্টর জমির মধ্যে যথাক্রমে মাত্র ১১ হাজার ৩২৩, ২৯ হাজার ৪২৫ ও ২৭ হাজার ৪৮৬ হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়েছে, যা মোট সেচযোগ্য জমির মাত্র ১৪ শতাংশ, ৩৭ শতাংশ ও ৩৫ শতাংশ। যেহেতু তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় নদীর পানি ছাড়া অন্য কোনো সেচের ব্যবস্থা নেই, তাই প্রতিবছরই বিপুল পরিমাণ জমি চাষাবাদ করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে পানির অভাবে সেচ কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ার কারণে ধানগাছ শুকিয়ে মারা যাচ্ছে, এতে করে বীজতলা তৈরি ও উন্নতমানের বীজ ক্রয়ে কৃষকের করা বিনিয়োগ নষ্ট হচ্ছে। ফলে ওই অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষক প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে তাঁদের জীবনমানে।

আমাদের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তিস্তা নদীতে পানির সংকটের কারণে সর্বমোট ৪২ লাখ ৫৪ হাজার ২১৮ মেট্রিক টন বোরো ধান আমরা উৎপাদন করতে পারিনি। চলতি বাজারমূল্যে এর পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকার ওপরে, যা নিঃসন্দেহে আমাদের জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারত, শক্তিশালী করতে পারত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের খাদ্যনিরাপত্তা বলয় এবং একইভাবে বাড়াতে পারত অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থকা ওই অঞ্চলের কৃষকদের আয়। তিস্তায় পানির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়াও আরেক ধরেনের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি আমরা, যা সচরাচর বলা হয় না, আর হলেও যে ব্যাপকতায় বলা দরকার, সেভাবে বলা হচ্ছে না, আর তা হচ্ছে পরিবেশগত ক্ষতি।

২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই ১০ বছরের মধ্যে পাঁচ বছরই শুকনো মৌসুমে তিস্তা নদীতে কার্যত কোনো পানি ছিল না। আরেকটু পরিষ্কার করে বললে, শুকনো সময়ে যে সামান্য পরিমাণ পানি ভারতের প্রত্যাহারের পর তিস্তা নদীতে পাওয়া যায়, তার সবটুকুই সেচ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্পের মাধ্যমে কয়েক শ সেচ খালের মাধ্যমে কৃষিজমিতে সরবরাহ করা হচ্ছে। এর দরুন ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তা ব্যারাজের পর থেকে ৯৭ কিলোমিটার বিস্তৃত তিস্তা নদীতে এক কিউসেক পানিও থাকছে না। এ কারণে তিস্তা অববাহিকার বাংলাদেশ অংশের এই বিশাল পরিমাণ নদীগর্ভ পরিণত হচ্ছে বালুচরে। তিস্তা ব্যারাজ এলাকার পর শুকনো মৌসুমে

এভাবেই নদী মারা যাচ্ছে। যেহেতু তিস্তা নদী উত্তরাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তাই যমুনা নদীর পানির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তিস্তা নদী থেকেও বাহিত হয়। তিস্তা নদী যখন শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে, তখন যমুনা নদীতেও পানির প্রবাহ কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে তিস্তা নদীর যে প্রাকৃতিক কার্যাবলি আছে, শুকনো মৌসুমে নদী শুকিয়ে যাওয়ার কারণে তা বিঘ্নিত হচ্ছে, ব্যাহত হচ্ছে নদী অববাহিকায় প্রতিবেশগত ভারসাম্য এবং সর্বোপরি তিস্তা হারাচ্ছে তার অতীত পরিবেশগত সক্ষমতা।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তিস্তা নদী যখন শুকিয়ে যায়, তখন নদীকেন্দ্রিক জীববৈচিত্র্যও প্রবল হুমকির সম্মুখীন হয়। এই তিস্তা নদীতে একসময় ইলিশ মাছ পর্যন্ত অহরহ পাওয়া যেত, কিন্তু এখন ইলিশ মাছ তো নয়ই, অন্য প্রজাতির বড় মাছও দুর্লভ হয়ে গেছে। অপর দিকে নদীর পানির প্রবাহ কমে যাওয়া এবং নদী শুকিয়ে যাওয়ার কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরও ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রংপুর ও ডালিয়ার আশপাশে যেসব এলাকায় আগে মাটির ৩৫-৪০ ফুট গভীরে ভূগর্ভস্থ পানি পাওয়া যেত, তা এখন ৬০-৬৫ ফুট বা জায়গাভেদে তার চেয়েও নিচে নেমে গেছে। এর দরুন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য এলাকার কৃষক, যাঁরা সরাসরি তিস্তার পানি পান না এবং সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করেন, তাঁদের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে।

আরেকটি কথা না বললেই নয়, যেহেতু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তিস্তার মতো এত বড় নদী আর নেই, তাই ওই অঞ্চলের জলবায়ুর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তিস্তা নদীর ওপর নির্ভর করে। তাই তিস্তা নদী যদি এভাবে প্রায় প্রতিবছরই পানির অভাবে শুকিয়ে যায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জলবায়ুও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই পরিবেশগত কারণেও তিস্তা নদীর অসীম মূল্য রয়েছে, যা নিয়ে আরও বৃহৎ পরিসরে গবেষণার প্রয়োজন। তিস্তা অববাহিকায় শুষ্ক মৌসুমে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় নদীতে সব সময় ৫৫০ থেকে ৭০০ কিউসেক এবং বোরোর চাহিদা পূরণে আমাদের অন্তত চার হাজার কিউসেক পানি দরকার।
পরিশেষে যেটা বলতে চাইছি তা হলো, আমাদের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ক্ষতি প্রশমনের জন্য অবিলম্বে স্বচ্ছতা ও সমতার ভিত্তিতে তিস্তার পানি চুক্তি হওয়া প্রয়োজন। তিস্তা চুক্তি যতই প্রলম্বিত হবে, আমাদের ক্ষতির পরিমাণ ততই বাড়বে এবং বাংলাদেশের ক্ষতির বিপরীতে ভারতই লাভবান হতে থাকবে। শুষ্ক মৌসুমে তিস্তা নদীর পানির প্রবাহ কমে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোতে যতটুকু অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তার পরিমাণ নিরূপণ করে ভারতের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করা অপরিহার্য। আমরা যদি আমাদের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে ক্ষতিপূরণ না চাই, তাহলে ভারত ও তার জনগণ প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারবে না। আলোচনার টেবিলে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ার তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ তুলে ধরাটা আরও বেশি যুক্তিসংগত ও ফলপ্রসূ হবে। তিস্তায় পানির দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে আমাদের সাম্প্রতিক গবেষণাটি পরিচালিত হওয়ার আগে আমাদের হাতে তিস্তার পানির অভাবে আঞ্চলিক কৃষিতে প্রভাব কতটুকু পড়ছে, তার ক্ষতির প্রকৃত কোনো পরিসংখ্যান ছিল না। এখন আশা করা যাচ্ছে যে এই ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে জোরালো বক্তব্য রাখতে সমর্থ হবে এবং তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে সক্ষম হবে।

BCS লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি
Topic :::: Natural resources of Bangladesh

**********গভীর সমুদ্রবন্দর-----: জলপথে বাণিজ্যের সোনালি হাতছানি*******
ইংরেজিতে একটি কথা আছে, ‘ঈশ্বর নিজেই একজন নাবিক, তাই তিনি পৃথিবী এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল।’ এ বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ দুরূহ। তবে এটি সত্য যে, বিশ্ববাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশই সম্পন্ন হয় জলপথে। এ বাণিজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে ‘বন্দর’। জলপথে পণ্য পরিবহন তথা বিশ্ববাণিজ্য ব্যাপক হারে বেড়েছে বাণিজ্য বৈশ্বিকীকরণের প্রভাবে। উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। বৈশ্বিকীকরণের প্রভাবে ব্রাজিলে উৎপাদিত তুলা তুরস্কে পরিবাহিত হয়ে প্রস্তুত হয় সুতা। এ সুতা চীনে পরিবাহিত হয়ে সেখানকার কারখানায় তৈরি হয় কাপড়। এ কাপড় চীন থেকে বাংলাদেশে পরিবাহিত হয়ে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত হয়ে শার্ট, প্যান্ট, টি-শার্ট। প্রস্তুতকৃত এ পোশাক কনটেইনারযোগে ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডায় পরিবাহিত হয়ে সুপার স্টোরের মাধ্যমে পৌঁছে প্রান্তিক ভোক্তার কাছে। বিশ্ববাণিজ্যের এ পরিবর্তিত ধারা ‘জলপথ’ ও ‘বন্দর’গুলোকে বিশ্ববাণিজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে আর বিশ্ববাণিজ্যে জলপথের হিস্যা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ।

বিশ্বের তৈরি পোশাক পণ্যের চাহিদার একটি বড় অংশের জোগান দিচ্ছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মোট আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের প্রায় ৯৭ শতাংশ সম্পন্ন হয় সমুদ্রপথে। বাংলাদেশের বাণিজ্যের বন্দরগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনায় বাংলাদেশে দুটি সমুদ্রবন্দর রয়েছে— চট্টগ্রাম ও মংলা। এ দুটির মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে দেশের মোট আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ সম্পন্ন হয়। অবশিষ্ট অংশ হয় মংলার মাধ্যমে। ভূপ্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশের দুটি সমুদ্রবন্দরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর রয়েছে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে। সমুদ্রের মুখ তথা বহির্নোঙর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিগুলোর দূরত্ব গড়ে ১০ নটিক্যাল মাইল। কিন্তু মংলার ক্ষেত্রে এ দূরত্ব অনেক বেশি। চট্টগ্রাম বন্দরের চ্যানেলে মংলার তুলনায় অনেক কম পলি জমে। দূরত্ব ও পলি জমার তারতম্যের কারণে চট্টগ্রাম বন্দর বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে মংলার চেয়ে এগিয়ে এবং জাহাজ মালিকদের অধিকতর পছন্দের বন্দর হিসেবে বিবেচিত। গত কয়েক বছর চট্টগ্রাম বন্দরের কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রতি বছরই এ বন্দরে হ্যান্ডলিং বাড়ছে।
তবে এ অঞ্চলের অন্যান্য বন্দরের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে চট্টগ্রাম বন্দরের সুবিধাও অপ্রতুল। বিশ্বের বা এ অঞ্চলের অন্যান্য নামকরা সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে চট্টগ্রাম বন্দরের মূল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে এর গভীরতা ও জাহাজের দৈর্ঘ্যের সীমাবদ্ধতা। চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে সর্বোচ্চ ৯ দশমিক ৮ মিটার গভীরতা ও ১৮৬ মিটার দৈর্ঘের জাহাজ বার্থ নিতে পারে। ফলে বাংলাদেশমুখী ও বাংলাদেশ থেকে যেসব পণ্য বা কনটেইনার সমুদ্রপথে পরিবাহিত হয়, সেসব পণ্য বা কনটেইনার এ ধরনের জাহাজ ব্যবহার করতে হয়, যা চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে ভিড়তে সক্ষম। এ সীমাবদ্ধতার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে কেবল ফিডার জাহাজ (অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজ) আসে, যার ধারণক্ষমতা কনটেইনারের ক্ষেত্রে দুই হাজার টিইইউএস (প্রতিটি ২০ ফুট হিসাবে) এবং বাল্ক পণ্যের ক্ষেত্রে ৩০-৩৫ হাজার টন পর্যন্ত হতে পারে। ফলে কনটেইনার পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশমুখী ও বাংলাদেশ থেকে পরিবাহিত কনটেইনারগুলো ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডা থেকে মাদার ভেসেল পরিবাহিত হয়ে (যার গভীরতা ১৬-১৭ মিটার এবং ধারণক্ষমতা ১৮ হাজার টিইইউএস পর্যন্ত হতে পারে) প্রথমে সিঙ্গাপুর, পোর্ট কেলাং, পোর্ট তানজুং, পেলাপাস বা কলম্বো বন্দরে আসে। পরে চট্টগ্রাম বন্দরের বার্থিং উপযোগী ফিডার জাহাজযোগে ওই কনটেইনারগুলো সিঙ্গাপুর, পোর্ট কেলাং, পোর্ট তানজুং, পেলাপাস, কলম্বো— এসব বন্দর থেকে চট্টগ্রামে পরিবাহিত হয়। এতে একদিকে যেমন মধ্যবর্তী একটি বন্দরে একবার নামানো-ওঠানোর কারণে প্রতি কনটেইনারের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তেমনি মাদার ভেসেল থেকে নামিয়ে একবার মধ্যবর্তী বন্দরে সংরক্ষণ ও পুনরায় ফিডার ভেসেলে ওঠানোর জন্য অতিরিক্ত সময়ও ব্যয় হয়। এতে বাংলাদেশ অভিমুখী বা বাংলাদেশ থেকে পরিবাহিত পণ্যের লিড টাইম বেড়ে যায়, যা বাংলাদেশের মূল রফতানি পণ্য তৈরি পোশাককে বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় পিছিয়ে দেয়। কারণ তৈরি পোশাক অত্যন্ত Time Sensitive পণ্য।

কয়লা বা কয়লাজাতীয় পণ্য ছোট জাহাজ ও বড় জাহাজে পরিবাহিত হলে প্রতি টিইইউএসে যে ব্যয় হয়, তার তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপ:
বাংলাদেশের পণ্য এমন বিরূপ পরিস্থিতি থেকে রক্ষার উদ্দেশে বাংলাদেশে একটি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের সামনে চলে আসে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে জাপানভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pacific Consultant International একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। ওই Consultant তাদের যে সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করে, তাতে সম্ভাব্য স্থানগুলোর মধ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী (সোনাদিয়া) এলাকায় গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের পক্ষে মত দেয়।

বাংলাদেশের সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দরের জন্য প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। তিন ধাপে ২০৫৫ সাল নাগাদ এর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার কথা। ২০২০ সালের মধ্যে প্রথম ধাপ, ২০৩৫ সালের মধ্যে দ্বিতীয় ও ২০৫৫ সালের মধ্যে তৃতীয় ধাপে এর নির্মাণকাজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এটি নির্মাণ হলে প্রায় ১০ কোটি টন পণ্য ও ৫ মিলিয়ন টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।

গভীর সমুদ্রবন্দরের মূল সুবিধা হচ্ছে, অনেক গভীরতার জাহাজ বার্থিংয়ের সুবিধা। Deep Draft জাহাজ বার্থ নিলে একই জাহাজে ১৬-১৭ হাজার টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং সম্ভব। ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দরগুলোয় আট-নয়টি জাহাজ ব্যবহার করে যে পরিমাণ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা যায়, তা একটি জাহাজেই করা সম্ভব। এতে Economy of Scale-এর ফলে পরিবহন ব্যয় কমে যায় এবং পণ্য আমদানি খরচ কম হয় এবং রফতানি বাজারে তা অনেক Competitive হয়।

তাছাড়া এমন গভীর সমুদ্রবন্দর শুধু দেশের ও সে দেশের পণ্যই পরিবহন করে না, Transshipment বন্দর হিসেবে অন্য দেশের পণ্যও হ্যান্ডলিং করে। সিঙ্গাপুর, রটারডাম, হামবুর্গ ইত্যাদি বৃহত্তম বন্দরের মাধ্যমে যে পরিমাণ পণ্য বা কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়, তার ৯০ শতাংশই Transshipment পণ্য, যা মূলত পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো দেশের জন্য পরিবাহিত হয়। এসব Transshipment পণ্য হ্যান্ডলিং

করেই সিঙ্গাপুর বিশ্বের বৃহত্তম বন্দরের মধ্যে একটি এবং সিঙ্গাপুরের আয়ের একটি বড় অংশের জোগান দেয় এ বন্দর। স্বাভাবিকভাবেই কলম্বো যে গভীর সমুদ্রবন্দর চালু করেছে, তার উদ্দেশ্যও একই। কেবল শ্রীলংকা ও সিঙ্গাপুর নয়, এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের পণ্য হ্যান্ডলিংই এ বন্দরের মূল উদ্দেশ্য। সিঙ্গাপুর ও কলম্বোসহ মালয়েশিয়ায়ও গভীর সমুদ্রবন্দর রয়েছে।

তেমনি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও Pacific Consultant ও চট্টগ্রাম বন্দরের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা তথা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নে নিয়োজিত কনসালট্যান্টের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২২-২৩ সাল নাগাদ সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দরের এক-দুটি জেটি বাংলাদেশের পণ্য বা কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য প্রয়োজন হতে পারে। এর পর পর্যায়ক্রমে আরো জেটি ও পশ্চাৎ সুবিধাদি নির্মাণের প্রয়োজন হবে। Pacific Consultant-এর যে প্রতিবেদন, তাতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে ৯ বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন হতে পারে। তবে পর্যায়ক্রমে নির্মাণের পরিকল্পনা করা হলে এ ব্যয় কমবে, যা আমাদের জন্য বহন করা সহজ হবে। তাছাড়া সোনাদিয়া সমুদ্রবন্দর নির্মাণ হলে এর সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সুবিধা বাংলাদেশ ছাড়াও অন্য যে দেশগুলো পেতে পারে, সেগুলো হলো মিয়ানমার, ভারত ও চীন। এ দেশগুলোর মধ্যে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঈর্ষণীয়। তাই সরকার-টু-সরকার বা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনাশিপের (পিপিপি) আওতায় কোনো দেশ বা কোম্পানির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশের পক্ষে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ সহজ হবে।
সার্বিক বিবেচনায় ২০২২-২৩ সাল নাগাদ সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দরের এক-দুটি জেটি পণ্য বা কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের আওতায় আনতে হলে অনতিবিলম্বে এর নির্মাণকাজ শুরু করতে হবে। প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকাতে দ্রুত এটি নির্মাণের বিকল্প নেই। আবারো একটি ইংরেজি প্রবাদের শরণাপন্ন হই, 'Early birds get the insect'.

লেখক: টার্মিনাল ম্যানেজার ,চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত)

জলবায়ু পরিবর্তন

লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি + আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি
Topics: সিলেবাসে একাধিকবার উল্লেখকৃত ।
বাংলাদেশ বিষয়াবলি = Bangladesh's environment and nature and challenges.
আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি = Global Environment: Environmental issues challenges, climate change, global warming, climate adaptation.
আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি = Part C (Problem-solving) : climate change.

সিলেবাসে একাধিকবার উল্লেখকৃত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে ৩ টি article শেয়ার করলাম :
****

******** জলবায়ুর সর্বগ্রাসী ঝুঁকিতে বাংলাদেশ: হাছান মাহমুদ *********

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সর্বগ্রাসী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ উল্লেখ করে বন ও পরিবেশ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ঝুঁকির আলোকে আমরা লিমা সম্মেলনে উন্নত রাষ্ট্রগুলো থেকে লিখিতভাবে কতটুকু ক্ষতি পূরণ আদায় করতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে।

বৃহস্পতিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে পরিবেশবাদী আন্দোলন ইকুইবিটি আয়োজিত 'কপ-২০' বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন উপলক্ষে 'বাংলাদেশকে নেতৃত্বের আসনে নিয়ে যাবার চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।
হাছান মাহমুদ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের দেশকে ভীষণ ক্ষতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আগামী সম্মেলনে যদি দর কষা-কষির মাধ্যমে আমদের ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে না পারি তবে আগামীতে বাংলাদেশ অনেক বড় ঝুঁকিতে পড়বে। তিনি আরো বলেন, উন্নত দেশগুলো যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা সবসময় পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। আইলা, সিডরের সময় বিলিয়ন ডলার সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অথচ আমরা মিলিয়ন ডলারও পাইনি। তারা সব সময় প্রতিশ্রুতি পূরনে ব্যর্থ হয়েছে। লিমা সম্মেলনে এমন একটা আইন করা উচিত হবে যাতে প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হলে, এর দায়ভার গ্রহণ করতে হবে।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, আগমী সম্মেলনে বাংলাদেশে রিফিউজির সংজ্ঞা পরিবর্তন করার জোর দাবি জানানো উচিত হবে। কারণ ১৯৫০ সালের দিকে রিফিউজি নিয়ে সর্বপ্রথম যখন সম্মেলন হয়েছিল তখন জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতা ছিল না। তাই রিফিউজিদের মধ্যে জলবায়ুর পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তরা পড়ে না। অথচ এখন এই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আমারা মোটেও দায়ি না থাকলেও আমরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি।

********** জলবায়ু সম্মেলন কাউকেই খুশি করতে পারেনি **********

সম্প্রতি পেরুতে অনুষ্ঠিত কনফারেন্স অব পার্টিস বা কপ ২০ তে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত ১৯৪ দেশ অংশ নিয়েছিল। গত ২০ বছর ধরে জলবায়ুসংকট মোকাবিলায় একটি কার্যকর চুক্তির ব্যাপারে এসব দেশ আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংকট এড়াতে কার্বন নিঃসরণ কমাতে হবে, আর তার জন্য বায়ু ও সূর্যের মতো নবায়নযোগ্য উৎস থেকে জ্বালানি সংগ্রহ ছাড়া বিকল্প নেই। এ পর্যন্ত বিশ্বের দেশগুলো মোটামুটি একমত। কিন্তু কোন পথে এগোলে সমাধান মিলবে, তা নিয়ে মতান্তর শেষ হয়নি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর দাবি, শিল্পোন্নত দেশগুলো গত দেড় শ বছর ধরে তেলের ব্যবহার করছে। কয়লার ব্যবহার তারও অনেক আগে থেকে। ক্ষতিকর কার্বনের সিংহভাগ উৎপাদিত হয় এসব দেশে। ফলে কার্বন হ্রাসের মূল দায়িত্ব উন্নত দেশগুলোর। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে আজ যে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো বিপদের সম্মুখীন, উন্নত বিশ্বকে তার প্রতিকারে ব্যবস্থা নিতে হবে। এই দুই ব্যাপারেও মোটের ওপর মতৈক্য রয়েছে।

সংকট কাটিয়ে ওঠার দুটি পথ: গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাস ও বৈশ্বিক উষ্ণতার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে পরিবর্তিত পরিবেশের জন্য উপযোগী করে তোলা। এ ব্যাপারে শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাধারণ মতৈক্য রয়েছে। কিন্তু এই দুই লক্ষ্য কীভাবে অর্জিত হবে, তা নিয়ে বাদানুবাদ ২০ বছর ধরে চলছে। পেরুর রাজধানী লিমাতেও সেই একই দৃশ্যের পুনরাভিনয় হলো। বাদানুবাদ ও তিক্ততা এত তীব্র হয়ে ওঠে যে পুরো সম্মেলনই ভন্ডুল হওয়ার উপক্রম হয়। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে প্রায় দুই দিন অতিরিক্ত ব্যয়ের পর দুই পক্ষ ছাড় দিতে সম্মত হওয়ায় একটি সমঝোতাপূর্ণ খসড়া চুক্তি গৃহীত হয়। এখন এই চুক্তির ভিত্তিতে আগামী বছর ডিসেম্বরে প্যারিসে কপ ২১ সম্মেলনে একটি নতুন আইনগতভাবে বাধ্যমূলক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কথা।

জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্র দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখা না গেলে ভয়াবহ সংকট দেখা দেবে। ১৯৯৭ সালে গৃহীত কিয়োটো চুক্তিতে নিঃসরণের দায়িত্ব চাপানো হয়েছিল শিল্পোন্নত দেশগুলোর ওপর। কিন্তু গত ২০ বছরে চীন, ভারত ও ব্রাজিলের মতো উন্নয়নশীল দেশ অন্যদের হটিয়ে প্রধান নিঃসরণকারীর স্থান করে নিয়েছে। ফলে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দাবি, নিঃসরণ কমাতে এসব দেশকেও প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। লিমা সম্মেলনের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো, এই প্রথমবারের মতো একমাত্র স্বল্পোন্নত দেশগুলো ছাড়া বিশ্বের বাকি সব দেশকে নিঃসরণ কমাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা গেছে। তবে সমস্যা হলো, কোন দেশ কী পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ অর্জন করবে, তার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেসব দেশের সরকারের ওপর। ২০১৫ সালের মার্চ মাস নাগাদ প্রতিটি দেশ তাদের নিঃসরণ টার্গেট ও পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য জাতিসংঘের কাছে পৌঁছে দেবে। জাতিসংঘ ১ নভেম্বর ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের গৃহীত ব্যবস্থার ফলে কী পরিমাণ বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস পাবে, তার একটি বৈজ্ঞানিক চিত্র হাজির করবে।

নিঃসরণের ব্যাপারে এই মতৈক্যকে যদি অগ্রগতি বলে মেনেও নিই, উপযোগীকরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত অথবা সিদ্ধান্তহীনতা গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে। লিমা সম্মেলনের আগে শিল্পোন্নত দেশগুলো প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার উপযোগীকরণের জন্য দিতে সম্মত হয়েছিল। ২০২০ সালের মধ্যে এ খাতে বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলারের একটি লক্ষ্যমাত্রা জাতিসংঘ নির্ধারণ করেছিল। লিমাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর দাবি ছিল, ইতিমধ্যে যে অর্থ প্রতিশ্রুত হয়েছে, তার বাইরে নতুন অর্থের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। শিল্পোন্নত বিশ্ব তাতে সম্মত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত শুধু অতিরিক্ত অর্থায়নের আহ্বান জানানো হয়েছে, কী পরিমাণ বা কত দিনের মধ্যে সে অর্থ দিতে হবে, তার উল্লেখ করা হয়নি।

কিন্তু জলবায়ুসংকট নিয়ে কাজ করেন, এমন বেসরকারি প্রতিনিধিরা লিমা সম্মেলনের প্রাপ্তি নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশের বিখ্যাত জলবায়ুবিজ্ঞানী ও লন্ডনের ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সিনিয়র ফেলো ড. সলিমুল হক সম্মেলনকে 'লজ্জাজনক' বলে অভিহিত করেছেন। পরিবেশ ও বন বিভাগের সচিব নজিবুর রহমান—যিনি কপ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন—এই মূল্যায়নের সঙ্গে একমত নন। গত মঙ্গলবার প্রথম আলোর সঙ্গে নিউইয়র্কে এক আলাপচারিতায় তিনি বলেন, ব্যাপারটা গ্লাস অর্ধেক খালি না অর্ধেক পূর্ণ, সে রকম। 'আমার চোখে গ্লাস কিন্তু অর্ধেক পূর্ণ'। বাংলাদেশ তথা স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ প্রসঙ্গে তিনি তিনটি অর্জনের কথা বলেন, স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে নিঃসরণপ্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া, সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর 'বিনাশ ও ক্ষতি' (লস অ্যান্ড ড্যামেজ) বিষয়ক ধারা সংযোজন ও উপযোগীকরণ নির্ণয়ের রণকৌশল বিষয়ে সম্মতি। বাংলাদেশের নিজের লাভ-ক্ষতি বিষয়ে নজিবুর রহমান বলেন, যে সবুজ জলবায়ু তহবিল গঠিত হয়েছে, বাংলাদেশ তা থেকে উপকৃত হবে। ইতিমধ্যে এই তহবিলের নির্বাহী কমিটিতে বাংলাদেশ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। উপযোগীকরণ প্রকল্প বাছাই ও তদারকির জন্য বহিঃসম্পদ বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ড. আবদুল মোমেন বলেন, সব লক্ষ্য অর্জিত না হলেও লিমা পরিকল্পনা সঠিক পথে একটি স্পষ্ট পদক্ষেপ। 'ধনী-দরিদ্র সব দেশ নিঃসরণে সম্মত হয়েছে, এটা খুবই ভালো সংবাদ।' ড. মোমেন জানান, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এ বছর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর সরকার নিঃসরণপ্রক্রিয়ায় অংশ নেবে। খসড়া চুক্তিতে যদিও বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশকে নিঃসরণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে দৃঢ় ভূমিকা রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ড. মোমেন মনে করিয়ে দেন, সৌরশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে একটি 'মডেল' দেশ হিসেবে সবার নজর কেড়েছে। ক্ষতিকর কার্বনভিত্তিক জ্বালানির বদলে অধিকতর পরিষ্কার তরল গ্যাসের ব্যবহার সে বাড়িয়েছে। বনায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে একদিকে উপযোগীকরণের কাজ চলছে, অন্যদিকে তা কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে কাজে লাগছে। সুন্দরবন এলাকায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটি প্রকল্প নেওয়া হবে। তাঁর কথায় সম্মতি জানিয়ে নজিবুর রহমান জানান, সুন্দরবন প্রকল্পের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হবে, এই অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্তদের বিকল্প পেশা বাছতে প্রশিক্ষণ ও পুঁজির ব্যবস্থা।

ড. সলিমুল হক অবশ্য লিমা চুক্তির ভিন্ন মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর কথায়, লিমায় যা হলো, তা আমাদের অগ্রগতির বদলে পেছনে ঠেলে দিয়েছে। সম্মেলনের আগে প্রথম আলোকে তিনি বলেছিলেন, প্যারিস সম্মেলনকে সফল করতে হলে লিমায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে হবে। দৃশ্যত সে অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। হক বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য তাদের দায়ভার শিল্পোন্নত দেশগুলো স্বীকার করেছে, কিন্তু সে অবস্থার প্রতিকারে যে অর্থের প্রয়োজন, তা জোগাতে তারা রাজি নয়।
লিমা খসড়ার ব্যাপারে তাঁর হতাশা আরও সোজাসাপ্টা ভাষায় বলেছেন, গ্লোবাল সাউথ থিংক ট্যাংকের পরিচালক বলিভিয়ার পাবলো সলোন। তাঁর কথায়, ধরিত্রী মাতার জন্য লিমা সিদ্ধান্ত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। 'প্যারিসের পথে যে সড়করেখা আঁকা হলো, তা আসলে বিশ্বকে আগুনে পোড়ানোর পরিকল্পনা।' একই কথা বলেছেন, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের সুজান গোল্ডবার্গ। তিনি বলেছেন, লিমার চুক্তির ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার বদলে সম্ভবত তিন-চার ডিগ্রিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হলো। ফ্রেন্ডস অব দি আর্থ-এর মুখপাত্র আসাদ রেহমানের বিবেচনায়, শিল্পোন্নত দেশগুলো সন্ত্রাসের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এই চুক্তি গ্রহণে রাজি করিয়েছে। 'এই চুক্তিতে একমাত্র যা অর্জিত হয়েছে তা হলো, প্যারিসে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে কার্যকর চুক্তি সম্পাদনের পথ বন্ধ করে দেওয়া।'

একই বৈঠকের এই বিপরীতমুখী মূল্যায়নে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। সরকারি প্রতিনিধিরা, যাঁরা এই সম্মেলনে নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান সত্ত্বেও যে চুক্তিটি গ্রহণে সম্মত হন, তার কেন্দ্রে ছিল সব পক্ষের সমঝোতা। চুক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ, এই বোধ থেকে তাড়িত হয়ে কোনো কোনো দেশ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও খসড়া চুক্তিটি মেনে নেয়। ভারত বা চীনের মতো দেশ কোনো রকম সমঝোতার বিরুদ্ধে পূর্বনির্ধারিত অবস্থান নিয়ে সম্মেলনে আসে। কিন্তু লিমায় তাদের ভূমিকা ছিল বহুলাংশে ইতিবাচক। যুক্তরাষ্ট্রের চলতি রাজনৈতিক নেতৃত্ব জলবায়ুসংকট মোকাবিলায় রাজনৈতিকভাবে বদ্ধপরিকর, অথচ দেশের ভেতর

রিপাবলিকান প্রতিপক্ষ ও শক্তিশালী তেল ও কয়লা লবি নিঃসরণ চুক্তির প্রবল বিরোধী। তা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ওবামার নির্দেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি যে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেন, তা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর প্রশংসা অর্জন করে।

কোনো সন্দেহ নেই, লিমা সম্মেলনের গ্লাস যেমন অর্ধেক খালি, তেমনি সে অর্ধেক ভরা। এ পর্যন্ত বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, তার অনেকটাই সম্ভব হয়েছে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক জলবায়ু আন্দোলনের ফলে। আগামী মাসগুলোতে এই আন্দোলন আরও জোরদার করতে হবে। তেলের দাম এখন পড়তির মুখে, সে পতন যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে তেল লবির প্রভাব হ্রাস পেতে পারে। পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি হিসাবে বিস্তর লাভ রয়েছে, এ কথা যদি ব্যক্তিগত খাতের প্রতিনিধিদের বোঝানো সম্ভব হয়, তাতে সরকারি পর্যায়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত্বরান্বিত হবে।
এ জন্য লিমা সম্মেলন নিয়ে মনস্তাপের বদলে কাজে নেমে পড়তে হবে আজই, এখনই। লিমার অর্ধেক খালি গ্লাসটি তাহলে পূর্ণ করা একদম অসম্ভব হবে না।
হাসান ফেরদৌস: যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি।

********** জলবায়ু উদ্বাস্তু ও আমাদের করণীয় **********

রাজনীতির ডামাডোলে অনেকটা মিডিয়ার অজান্তেই খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তিন দিনব্যাপী জলবায়ু উদ্বাস্তু সংক্রান্ত একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের একটি সম্মেলনের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও মিডিয়ায় সম্মেলন সংক্রান্ত খবরাদি আমার চোখে পড়েনি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ডভিত্তিক সংগঠন 'ন্যানসেন ইনিশিয়েটিভ' এর সহযোগিতায় এ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। আর এতে অংশ নেয় দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতে মহাসাগরভুক্ত ১৪টি দেশের সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিরা। খুলনায় এ ধরনের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য নিঃসন্দেহে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকার শীর্ষে রয়েছে। আর বাংলাদেশের যেসব এলাকা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার মধ্যে রয়েছে বৃহত্তর খুলনা এলাকা। 'সিডর' ও 'আইলায়' ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলো এ এলাকাতেই অবস্থিত। এ অঞ্চলের মানুষ আজও ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' ও 'আইলা'র বিপর্যয় থেকে বের হয়ে আসতে পারেননি। বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে যে ক'টি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের উপকূলে প্রতি বছর ১৪ মিলিমিটার করে সমুদ্রের পানি বাড়ছে। ২০ বছরে সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮ সেন্টিমিটার। সমুদ্রের পানি বেড়ে যাওয়ায় উপকূলের মানুষ অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশে প্রতি সাতজনে একজন মানুষ আগামীতে উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। ১৭ ভাগ এলাকা সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ কোপেনহেগেন করা সম্মেলনে পরিবেশগত উদ্বাস্তুদের Universal natural person হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু তা গ্রহণ করা হয়নি। অর্থায়নের ব্যাপারটি নিয়েও নানা জটিলতা রয়েছে। ফাস্ট স্টার্ট ফান্ডে পাওয়া গিয়েছিল মাত্র আড়াই বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ সেখান থেকে পেয়েছিল ১৩০ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু এ অর্থ সাহায্য বিতরণ নিয়ে নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। স্বয়ং পরিবেশমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু একটি অনুষ্ঠানে প্রশ্ন তুলেছেন এর স্বচ্ছতা নিয়ে। বলেছেন, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ যাচ্ছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু এ অর্থ ঠিকমতো খরচ হচ্ছে কিনা তা মনিটরের ব্যবস্থা পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের নেই (২০ আগস্ট ২০১৪)। দুর্নীতি এখানে ভর করছে। যারা সত্যিকার অর্থেই জলবায়ু উদ্বাস্তু, তারা সাহায্য পাচ্ছে না। লিমা সম্মেলনে অর্থপ্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি। এমনকি প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়েও কোনো সমাধান হয়নি অথচ এ প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়টি উন্নয়নশীল বিশ্ব তথা সাগরপাড়ের দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিবেশের যথেষ্ট ক্ষতি করে। উন্নত দেশগুলো এ বিষয়টিকে এড়িয়ে চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, এমনকি ভারতে কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। (পাঠক, রামপালে প্রস্তাবিত কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা চিন্তা করতে পারেন)। বাংলাদেশ বা মালদ্বীপের মতো দেশে সোলার বিদ্যুৎ ও বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও এ ক্ষেত্র দুইটি বারবার উপেক্ষিত থেকে গেছে। গরিব দেশগুলোর কাছে এ প্রযুক্তি সহজলভ্য নয়। প্রযুক্তি হস্তান্তরে উন্নত দেশগুলোর গড়িমসি চোখে লাগার মতো। লিমা সম্মেলনে (২০১৪) নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, প্রতিটি দেশ ছয় মাসের মধ্যে নিজের দেশে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনার ব্যাপারে নিজস্ব কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন ও উপস্থাপন করবে।

বাংলাদেশের জন্য বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রামপালে ভারতীয় কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ প্লান্ট তৈরি করছে বাংলাদেশ। এতে পরিবেশ দূষণ তো হবেই। একইসঙ্গে কার্বন নিঃসরণের মাত্রাও বাড়বে। ইটের ভাটায় কয়লা ব্যবহৃত হয়, যা বায়ুম-লে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছড়ায়। এখন বাংলাদেশকে লিমা ঘোষণা বাস্তবায়ন করে একটি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। দেখার বিষয় বাংলাদেশ এখন কী করে। নিঃসন্দেহে লিমা ঘোষণা একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। তবে প্রশ্ন থাকলই। উন্নত বিশ্ব শেষ পর্যন্ত প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করে

কিনা, এর জন্য আমাদের আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে, কংগ্রেসের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের দ্বন্দ্বের আলোকে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত লিমা ঘোষণার ব্যাপারে কোনো আপত্তি তোলে কিনা, সেটাই দেখার বিষয় এখন। তবে আগামী বেশ কয়েক মাস এ নিয়ে বেশ দেনদরবার হবে। উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক আসরে দেনদরবার করবে। জাতিসংঘ উদ্যোগী হবে। তবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, এক্ষেত্রে জাতিসংঘের করার কিছুই নেই। কেননা উন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র যদি রাজি না হয়, তাহলে প্যারিস সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত কোনো চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না। এজন্যই খুলনা সম্মেলনের গুরুত্ব রয়েছে। সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো অক্টোবরে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে।

খুলনা ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের ব্যাস্তচ্যুতি একটি নির্মম সত্য। এ সমস্যা মোকাবিলায় স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করতে হবে। ব্যাস্তচ্যুতি ঠেকাতে এবং অগত্যা ব্যাস্তচ্যুতদের সহযোগিতার লক্ষ্যে দেশীয় পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী তথা ধনী ও উন্নত দেশগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতিমালা তৈরি করা একান্ত জরুরি।' এছাড়া ব্যাস্তচ্যুত অভিবাসীদের সুরক্ষার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যারা উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছেন, তাদের সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক পরিসরে তেমন কোনো কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হয়নি। বাংলাদেশ এ সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করেছে বলেও আমার জানা নেই। অথচ দ্বীপাঞ্চল থেকে মানুষ প্রতিদিনই উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে, বড় বড় শহরে আশ্রয় নিয়ে এবং বস্তিজীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। হাজার হাজার মানুষ তার পারিবারিক পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ এদের পুনর্বাসনের কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই। বাংলাদেশ বারবার আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় স্থান পেলেও বাংলাদেশের পরিবেশ মন্ত্রণালয় কিংবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যারা চালান, তারা কতটুকু সচেতন, সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সম্প্রতি একটি শঙ্কার কথা আমাদের জানিয়েছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা এডিবি। বাংলাদেশ এ জলবায়ু পরিবর্তনে কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এডিবির রিপোর্টে সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এডিবি জানিয়েছে, ২০৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি গড়ে ১ দশমিক ৮ শতাংশ করে কম হতে পারে। আর চলতি শতাব্দী শেষে এ ক্ষতি হতে পারে প্রায় ৯ শতাংশ। আর বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়তে পারে ৪ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এডিবির ওই রিপোর্টে দক্ষিণ এশিয়ার অপর দুইটি দেশ নেপাল ও মালদ্বীপের ক্ষতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯ আগস্ট (২০১৪) ঢাকায় এডিবির এ রিপোর্টটি উপস্থাপন করা হয়েছিল। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হবে, তা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। শুধু এডিবির রিপোর্টেই নয়, বরং জাতিসংঘের রিপোর্টেও এ ক্ষতির দিকটি উল্লেখ করা হয়েছে একাধিকবার।

প্রতি বছরই জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা কপ বা 'কমিটি অব দ্য পার্টিস' নামে পরিচিত, সেখানেও বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যার কথা উঠে আসে। বাংলাদেশের যারাই পরিবেশমন্ত্রী থাকেন, তারা সেটা করেন, 'কপ' সম্মেলনে যান। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এরই মধ্যে নাসা আরও একটি আশঙ্কার কথা জানিয়েছে। নাসা আশঙ্কা করছে, গ্রিনল্যান্ডে যে বরফ জমা রয়েছে, তা যদি উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে গলে যায়, তাহলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা ৭ মিটার বৃদ্ধি পাবে। তাই কার্বন ডাই-অক্সাইড হ্রাসের কথা বলছে নাসা। আল গোর তার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন, বিশ্বের বৃহত্তম বন্দরগুলোয় এরই মধ্যে ৪ কোটি মানুষ মারাত্মক প্লাবনের হুমকির মুখে আছে। আল গোর বিশ্বের ১০৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে (বাংলাদেশের সাবেক বনমন্ত্রী হাছান মাহমুদও ছিলেন ওই দলে) গিয়ে ছিলেন অ্যান্টার্কটিকায় শুধু জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য। কিন্তু বিশ্ব সম্প্রদায় এখনও নীরব। প্রতি বছরই 'কপ' সম্মেলনে ভালো ভালো কথা বলা হয়। কোপেনহেগেন থেকে ডারবান সম্মেলন, বলা হয়েছিল ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্ব কার্বন নিঃসরণ কমাতে একটি চুক্তি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। এ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা শুরু হলেও বাংলাদেশ কী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। ডিসেম্বরে সমাপ্ত লিমা সম্মেলনে বলা হয়েছিল, ছয় মাসের মধ্যে পরিবেশে কার্বন নিঃসরণ কমাতে প্রতিটি দেশ নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও কাঠামো উপস্থাপন করবে। প্রতিটি দেশকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নিজস্ব কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করার। অর্থাৎ তারা নিজেরাই কার্বন নিঃসরণ কমানোর পন্থা বের করবে। প্রশ্নটা এখানেই। বাংলাদেশ কি কোনো কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে? এটি কে করবে? পরিবেশ না পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়? আমাদের আমলারা বিদেশে 'ভ্রমণে' যেতে পছন্দ করেন। সম্মেলনে যোগ দিয়ে যে 'হাতখরচ' পাওয়া যায়, তা নিয়ে কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকেন তারা! দেশে ফিরে এসে এরকম 'ভুলে' যান সবকিছু। তাই খুলনা সম্মেলনে আমাদের পররাষ্ট্র সচিব মোঃ শহীদুল হক যখন বলেন, শুধু ২০০৮ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ৪ কোটি ৬ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। (কালের কণ্ঠ, ৬ এপ্রিল)। তখন তার এ বক্তব্যে তাকে আমি সাধুবাদ দিতে পারি না। কেননা 'জলবায়ু কূটনীতি'তে বাংলাদেশের ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখানে ব্যর্থ। বলা হয়েছে, অক্টোবরে জেনেভা সম্মেলনে 'খুলনা ঘোষণা' উপস্থাপন করা হবে।

.....

বিসিএস চিরকুট

জলবায়ু বিষয়ক কিছু তথ্য

১৮৫০-১৮৬০ সময়কার তুলনায় বর্তমান পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ।

বর্তমানে বিশ্বের তাপমাত্রা প্রতিদশকে ০.৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস হারে বাড়ছে। ২০১৩ সালে আইপিসিসি (আন্ত:সরকার পরিষদ) প্রকাশ করেছে পঞ্চম মূল্যায়ন রিপোর্ট (এআর-৫)। এই রিপোর্টে প্রকাশিত জলবায়ু মডেলের হিসাব অনুযায়ী ২০ শতকে বিশ্বের বায়ু এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ০.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়েছে, আর ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে ৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এসে দাঁড়াবে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখা না গেলে, বিশ্বে পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এবছর কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ হচ্ছে ৩৯৬ পিপিএম যা গত বছরের চেয়ে ২.৯ পিপিএম বেশি। নেদারল্যান্ড পরিবেশ সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন নির্গমনের হার ২.৯ শতাংশ বেড়ে গিয়ে এ বছর রেকর্ড ৩৫ গিগা টনে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে বৈশ্বিক নিঃসরণের অর্ধেকের চেয়ে বেশি আসছে অর্থনৈতিক পাওয়ার হাউস যেমন চীন (২৯%), আমেরিকা (১৬%) এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (১১%) থেকে। এভাবে অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাস মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদির নির্গমনের পরিমাণ আগের মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি।

বিজ্ঞানীদের মতে গ্রিনল্যান্ডের সব বরফ যদি গলে যায় তাহলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা ৬ মিটার বেড়ে যাবে। কি ভয়ানক কথা! আইপিসিসির নতুন জলবায়ু মডেলের হিসাব মতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা ২০০৭ সালের হিসাবের চেয়ে ৬০ শতাংশ বেশি হারে বেড়ে চলেছে। এইভাবে চললে এই শতকের শেষে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা সর্বোচ্চ ১ মিটার পর্যন্ত বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জলবায়ু বিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রস্তরের উষ্ণতা যদি ১ মিটার বাড়ে তাহলে ২১ শতকের সমাপ্তিকালের মধ্যে মালদ্বীপ, পাপুয়া নিউগিনি, বার্বাডোজ, কিরিবাতিসহ প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে। ডুবে যাবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী নিচু এলাকা। মালদ্বীপ হলো ছোট ছোট কোরাল দ্বীপপুঞ্জের সমন্বয়ে গঠিত একটি দেশ যার অধিকাংশ ভূমি সমুদ্রতল থেকে মাত্র ১.৫ মিটার উপরে। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংস্থার মতে, সমুদ্রের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় মালদ্বীপের অধীন ১২০০ দ্বীপ ডুবে যাবে, গৃহহীন হবে ৪ লক্ষ মানুষ। মালদ্বীপের চেয়ে কোন অংশেই কম ঝুঁকির মধ্যে নেই বাংলাদেশ। বঙ্গোপসাগরের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলভাগ। সমুদ্রপৃষ্ঠের স্ফীতির ফলে লোনা পানি উপকূলীয় এলাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কৃষিজমি ও মিঠাপানির প্রাণী ও উদ্ভিদ ধ্বংস করে ফেলবে। আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের তাপমাত্রা ১.৫০ থেকে ২.০০ সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

কার্বন নি:সরণ কমানো

চায়না ২০০৫ সালকে ভিত্তিবছর ধরে ২০৩০ সালে ৬০-৬৫% কার্বন নি:সরণ কমাবে।

এবং ২০২০ সালের মধ্যে> ৪০-৪৫% কমাবে।

এজন্য নন ফসিল ফুয়েল এর ব্যবহার ২০২০ সালে ১৫% এবং ২০৩০সালে ২০% বাড়াবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে সাফল্য, সাফল্যের কারন,সরকারের গৃহীত কর্মসূচী,করণীয়,দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)

লিখিত প্রস্তুতি :::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি + বাংলা ২য় পত্র (রচনা)
সম্ভাব্য প্রশ্ন:
১.দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্য-বিশ্লেষণ করুন।
২.দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্যের কারন উল্লেখ করুন।
৩.দারিদ্র্য বিমোচনে আরও উন্নতির জন্য কী করণীয় বলে আপনি মনে করেন?
৪.দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) নিয়ে আলোচনা করুন।
৫.দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী উল্লেখ করুন। (Next Post)
****
সম্পর্কিত বিষয় (Related Topic): BA এর সিলেবাসে উল্লেখকৃত = Poverty Alleviation
****
কেন প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু মনে হচ্ছে?
দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর: (০৬ এপ্রিল, ২০১৫)
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচন, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ দমন এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

********** দারিদ্র্যর সংজ্ঞা **********

* দারিদ্রেযর অর্থ হচ্ছে- দরিদ্র অবস্থা, অভাব ও দীনতা।
* দারিদ্র্য বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশকে বুঝায় যার সামান্য সম্পদ ও অল্প আয় রয়েছে, যা দ্বারা ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ।
* ডেলটুসিং বলেন, 'মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতাই হ'ল দারিদ্র্য'।

******** দারিদ্র্য বিমোচনে অভূতপূর্ব সাফল্য বাংলাদেশের ******

বিশ্বব্যাংকের 'দারিদ্র্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন' -2013:

গত দশকে দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের সাফল্য ও অর্জনকে 'বিরল' ও 'উল্লেখযোগ্য' বলে আখ্যা দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দুই-ই কমেছে। বিশ্বব্যাংক গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে ২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময় ধরে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত এক দশকে দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে দেশের এক কোটি ৬০ লাখ মানুষ। বিশ্বব্যাংক বলেছে,

দারিদ্র্যের গভীরতা কমানোর এমডিজি লক্ষ্য পাঁচ বছর আগেই অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এমডিজি লক্ষ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের গভীরতা ৮ শতাংশে নামিয়ে আনার কথা। ২০১০ সালে তা ৬ দশমিক ৫ শতাংশে নেমেছে। গত এক দশকে সমাজে আয়-বৈষম্যও কমেছে। মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি। দারিদ্র্য হ্রাসের এ রকম একটি ইতিবাচক তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক মনে করিয়ে দিয়েছে, এখনো বাংলাদেশের চার কোটি ৭০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এদের মধ্যে আবার দুই কোটি ৬০ লাখ মানুষই চরম দরিদ্র।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও গত দশকে :

* ২৬ শতাংশ দারিদ্র্য কমেছে। বর্তমানে দারিদ্রের হার ২৪%।
* দারিদ্র্য কমছে প্রতিবছর ১ দশমিক ৭ শতাংশ হারে।
* দারিদ্র্য কমেছে কমেছে ১ কোটি ৬০ লাখ।
* ২০০৭-০৮ সালের বৈশ্বিক মন্দাও বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসের গতিকে শ্লথ করে দিতে পারেনি।
* ২০০০ সালে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল যেখানে ৬ কোটি ৭০ লাখ,
* ২০১০ সালে এসে তা দাঁড়ায় চার কোটি ৭০ লাখ।
* ২০০০ মালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ;
* ২০১০ সালে তা ৩১ দশমিক ৫ শতাংশে নেমেছে।

দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়। অথচ এ কর্মসূচির সুবিধা পৌঁছায় মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশের কাছে। তবে এখনও দারিদ্র্য বাংলাদেশের জন্য কঠিন সমস্যা। কেননা ৪ কোটি ৭০ লাখ লোক দরিদ্র রয়ে গেছে, যার মধ্যে ২ কোটি ৬০ লাখ চরম দরিদ্র। শহরের তুলনায় গ্রামে চরম দরিদ্রের সংখ্যা বেশি। উত্তরাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার এখনও বেশি। রংপুরে এই হার ৪২ শতাংশ।

রিপোর্টে বলা হয়, ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সিলেটের মতো বাংলাদেশের পূর্ব দিকের জেলাগুলোয় দারিদ্র্য দ্রুতগতিতে কমেছে। পরের পাঁচ বছরে পশ্চিমাঞ্চলীয় বিভাগগুলোতেই দারিদ্র্য হ্রাসের গতি বেড়েছে এবং পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোর কাছাকাছি চলে এসেছে। গত এক দশকে আবাসনের মানে উন্নয়ন ঘটেছে। বিভিন্ন ধরনের সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে পরিবারগুলোতে টেলিভিশন ও সেলফোনের মতো সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের সক্ষমতা।

******** দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের সাফল্যের কারন ******

প্রধানত দুটি কারণে বাংলাদেশ এ সফলতা অর্জন করেছে। এগুলো হলো:
* শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি,
* জনসংখ্যার প্রকৃতিতে পরিবর্তন।

1. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বেড়েছে বেশি হারে। আগে যে পরিবার মাত্র একজন লোকের ওপর নির্ভরশীল ছিল, সেই পরিবারে এখন উপার্জনক্ষম লোকের সংখ্যা একাধিক হয়েছে। গত দশকে জনসংখ্যা বেড়েছে ১৫ শতাংশ। অন্যদিকে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা বেড়েছে ২৫ শতাংশ।
2. মোট জনসংখ্যায় কর্মক্ষম লোকের অংশ বেড়ে যাওয়ায় মাথাপিছু আয় বেড়েছে। গ্রামে কৃষি ও অকৃষি উভয় খাতেই মজুরি বেড়েছে।
3. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসাও দারিদ্র্য হ্রাসের অন্যতম কারণ।
4. শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করেছে। এক দশকে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ২৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশ হয়েছে।
5. সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমও দারিদ্র্য কমাতে ভূমিকা রেখেছে।
6. দারিদ্র্য কমাতে বিদ্যুৎ-পরিস্থিতির উন্নতি ও মোবাইল ফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি বিশেষ অবদান রেখেছে। ২০০০ সালে দেশের মোট দরিদ্র মানুষের ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধা পেত। ১০ বছর পর ২০১০ সালে এ সংখ্যা বেড়ে ২৮ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০০ সালে দেশের কোনো দরিদ্র মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহারের সামর্থ্য রাখত না।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের পাশাপাশি বৈষম্যও কমেছে। এ হারে দারিদ্র্য কমা অবশ্যই বিরল ও অসাধারণ ঘটনা। বাংলাদেশের এখন যা দরকার তা হলো, ক্রমবর্ধমান তরুণ জনগোষ্ঠীকে তাদের দক্ষতা ও শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা করা।

******* দারিদ্র্য বিমোচনে আরও উন্নতির জন্য কী করণীয় *****

1. দারিদ্র্য হ্রাসের আগের অভিজ্ঞতার আলোকে আয় বাড়ানোর বিষয়ে সরকারকে নীতি গ্রহণ করতে হবে;
2. শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতে হবে;
3. কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে;
4. দরকার কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগ
5. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উৎপাদনশীল ও সেবা খাতে আরও মনোযোগ দেওয়া।
6. উৎপাদন ও সেবা খাতে দক্ষতা উন্নয়ন ও মজুরি বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে
7. দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে সংযোগ বাড়াতে হবে।
8. সমন্বিত বহুখাতবিশিষ্ট কার্যক্রম হাতে নেওয়া।

দারিদ্র্য হ্রাসে গত এক দশকের সাফল্যের পেছনে রয়েছে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনের নানা পদক্ষেপ। তিনি বলেন, গত চার বছরে এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু দেশ উন্নয়নে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছে। এই সময়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে এশিয়ার ১৪টি দেশ এবং আফ্রিকার ১০টি দেশ। বাংলাদেশও এর মধ্যে রয়েছে, যা অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

***** সাউথ সাউথ পুরস্কার: দারিদ্র বিমোচনে সাফল্যের স্বীকৃতি ***

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের অসামান্য অবদান এবং দারিদ্র্য হ্রাসে তাঁর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে দ্য ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন (আইওএসএসসি) অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেছেন। নিউইয়র্কে আইওএসএসসির সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়। জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিলের সহযোগিতায় পরিচালিত দক্ষিণের দেশগুলোর উন্নয়ন সংগঠন আইওএসএসসি মানবাধিকার, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতায় বিশেষ অবদানের জন্য প্রতিবছর এই পদক দিয়ে থাকে। এবার আটজনকে এই পদক দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য দূরীকরণে অবদান রাখায় শেখ হাসিনাকে এই পদক দেওয়া হয়েছে।

পুরস্কারটি বাংলাদেশের জনগণকে উৎসর্গ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এটি আমাদের দেশের জনগণ ও বর্তমান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনের স্বীকৃতি।'

বৈশ্বিক অংশীদারির ওপর গুরুত্বারোপ: প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সাল-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার সার্বিক সাফল্য ও টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি নতুন, বাস্তবধর্মী ও দায়িত্বশীল বৈশ্বিক অংশীদারির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অর্থায়ন, ওডিএ প্রতিশ্রুতি পূরণ, বাণিজ্যিক সুবিধা এবং সাউথ-সাউথ ও ত্রিমুখী সহযোগিতার জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ।

********** দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র **********

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিশ্বে নিম্ন আয়ের দেশগুলির অভ্যন্তরীণভাবে গৃহীত নীতি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সহযোগিতার জন্য প্রণীত দলিল বা রূপরেখা। দেশগুলি তাদের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে কৌশলসমূহ প্রস্তুত করে। এ দলিল প্রণয়নের মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য (এমডিজি) এবং দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার প্রকাশ করা হয়েছে।

মার্চ ২০০৩ সালে বাংলাদেশ অন্তবর্তীকালীন পিআরএসপি (আইপিআরএসপি) প্রথম প্রণয়ন করে। এর শিরোনাম ছিল 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের কৌশল'। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুশাসনকে প্রধান সোপান হিসাবে গণ্য করে প্রথম যাত্রা শুরু হয়। আইপিআরএসপিকে প্রাথমিক সোপান হিসাবে গণ্য করে অক্টোবর ২০০৫ সালে অধিকতর ও ব্যাপক কর্মসূচি ও কৌশল প্রণয়নে কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই দলিলটির শিরোনাম ছিল 'আনলকিং দ্য পটেনশিয়াল:

দ্রুততর দারিদ্র্য বিমোচনের জাতীয় কৌশল' যা পিআরএসপি নামে বহুল প্রচারিত। ২০০৮ সালের অক্টোবরে ২০০৫ সালে প্রণীত দলিলটিকে হালনাগাদ করা হয়।

উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতির ধারাবাহিক স্বাক্ষর হিসাবে গৃহীত এ দলিলের শিরোনাম হলো 'দ্রুততর দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল-২ (অর্থবছর ২০০৯-১১) পথে অগ্রযাত্রা'। এ দলিলকে সর্বাঙ্গীন দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যমেয়াদী কৌশল হিসাবে সরকারিভাবে দাবী করা হয়।

* পিআরএসপির কাঠামো নিম্নরূপ (pic 2)

নতুন কৌশলে অর্থনৈতিক শক্তির প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী
আইসিসিবির ত্রৈমাসিক বুলেটিনের সম্পাদকীয়

বিশ্বে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন হচ্ছে। এ পরিবর্তন রাজনৈতিক ক্ষমতারও পরিবর্তন আনবে। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশের (আইসিসিবি) ত্রৈমাসিক বুলেটিনের সম্পাদকীয়তে এ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে।
আইসিসিবি বলেছে, ওয়াশিংটনের আপত্তি সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে চীনের প্রস্তাবিত এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের (আইআইবি) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে যোগদানের আগ্রহ দেখিয়েছে পশ্চিমা দেশগুলো। চীন দুই বছরে পাঁচ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, চার হাজার কোটি ডলারের নিউ সিল্ক রোড তহবিল এবং ১০ হাজার কোটি ডলারের লিকুইডিটি রিজার্ভ প্রতিষ্ঠা করেছে। চীনের সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে, বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে দুই হাজার কোটি ও পাকিস্তানের অবকাঠামো খাতে ৪ হাজার ৬০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রস্তাবিত ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি) আলাপ-আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, যা কিনা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চুক্তি। যুক্তরাষ্ট্র, জাপানসহ ১০টি দেশ আছে টিপিপিতে। বিশ্ব অর্থনীতির ৪০ শতাংশই এসব দেশের দখলে রয়েছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের টিপিপি অনুমোদনের পক্ষে মত দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য চীনের অর্থনৈতিক কর্তৃত্বকে বাধা দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন ও বড় চ্যালেঞ্জ আসতে পারে বলে মনে করে আইসিসিবি।

সংগঠনটি বলেছে, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের রাষ্ট্রীয় জলসীমার মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। এই অঞ্চলে উভয় দেশেরই রয়েছে বিভিন্ন সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর উপস্থিতি। এ দুটি বৃহৎ দেশের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক বিভাজন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই প্রথম প্রদর্শিত হবে বলে অনুমান করা হয়। কৌশলগতভাবে বিশ্বে অর্থ এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীন সতর্কতা ও চতুরতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে।
সাবেক অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রী কেভিন রুডকে উদ্ধৃত করে আইসিসিবি বলছে, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক শক্তি স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের শ্রেষ্ঠত্ব ও রাজনৈতিক ভূমিকাকে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপে ভিন্ন আঙ্গিকে নিয়ে যাবে চীনের অর্থনৈতিক উপস্থিতি। এ প্রক্রিয়ার ফলে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, বিশ্ববাণিজ্য, বিনিয়োগ, মূলধন প্রবাহ, সঞ্চয়, জলবায়ু এবং অন্যান্য পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ ও বিশ্বব্যাপী মানুষের চলাচলের ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটবে।
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মতে, পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি অনুযায়ী চীনের অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছে। আইএমএফের হিসাব অনুযায়ী চীনের জিডিপি এখন ১৭ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন ডলার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি ১৭ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার। অথচ চীনের অর্থনীতি ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ১০ ভাগের এক ভাগ ছিল।

বিশ্বস্মরণীয় বিপ্লব

লিখিত প্রস্তুতি :::: আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি
Topics:::: Major Ideas and Ideologies
সম্ভাব্য প্রশ্ন: টীকা লিখুন
********** বিশ্বস্মরণীয় বিপ্লব **********

প্রতিবাদ অন্যায়কে পরিবর্তন করার ভাষা। প্রতিবাদের মাধ্যমে পরিবর্তন সাধিত হয় সমাজে, সমাজ থেকে রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রে যখন কোনো অন্যায়ের প্রতিবিধান হয় না সব অনুরোধ, উপরোধ, আহ্বান ব্যর্থ হয়, তখনই মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। সেই প্রতিবাদ হতে পারে শান্তিপূর্ণ কিংবা সহিংস। পৃথিবীতে কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে এই প্রতিবাদের মাধ্যমেই। আসুন দুনিয়া কাঁপানো কিছু প্রতিবাদ সম্পর্কে জেনে নিই:

******* মার্টিন লুথার কিংয়ের বিখ্যাত I have a dream ভাষণ *******
১৯৬৩ সালে মার্টিন লুথার কিং কিং এই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ঘোষনা করেন। কিং তার অনুসারীদের নিয়ে দুইমাস ব্যাপী আন্দোলন চালিয়ে যান, আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল আলাবামাতে কালোদেরকেও সাদাদের সমান অর্থনৈতিক সুবিধা দিতে হবে, কালোদের সর্বত্র প্রবেশাধিকার থাকতে হবে, শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে। এমনি এক শান্তিপূর্ন প্রতিবাদ সমাবেশে আলাবামার পুলিশ সেই সমবেত জনতার উপর দমনমূলক নীপিড়ন চালায়, পুলিশ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জলকামান, টিয়ার গ্যাস, কুকুর লেলিয়ে দেয়াসহ সব রকম অত্যাচার করে সেই শান্তিকামী কালো জনতার উপর, শিশুরাও রেহাই পায়নি এর থেকে। মার্টিন লুথার কিং সহ আরও অনেকেই গ্রেফতার হন। এই ঘটনা খুব ব্যাপক সাড়া জাগায় সারা বিশ্বব্যাপী।

সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার চলমান আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৬৪ সালের ২৮শে অগাস্ট দাসপ্রথা বিলুপ্তির ১০০ বছর পূর্তিতে অগুনতি মানুষের সমাগম হয় ওয়াশিংটন ডিসির লিঙ্কন মেমোরিয়ালের সামনে। সাদা কালো সকল বর্ণের মানুষ এসেছিল সেদিন ঐ শান্তিপূর্ন প্রতিবাদ সমাবেশে কারন এই সমাবেশ ছিল কালোদের স্বাধীনতা বা মুক্তি এবং চাকুরীর নিশ্চয়তা সম্পর্কিত, এই সমাবেশে আমেরিকার দক্ষিনী রাজ্যের দুঃখী কালো মানুষদের হয়ে বক্তৃতা করেছিলেন মার্টিন লুথার কিং। ডঃ মার্টিন লুথার কিং ঐদিন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ, পৃথিবী শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা করেন, যা কিনা 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' নামে খ্যাত।

এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন, কিভাবে বর্ণবৈষম্য গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, শুধু কালো আমেরিকানদের জীবনকে নয়। এরপর তিনি তুলে ধরেন ভবিষ্যতের আমেরিকা নিয়ে তার আশাবাদকে, যেখানে সব আমেরিকান হবে সমান। এটাই হবে সত্যিকারের স্বপ্নের আমেরিকা। 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' শিরোনামের ওই ভাষণে তিনি বলেন, 'আমার একটি স্বপ্ন আছে যে একদিন জর্জিয়ার লাল পাহাড়ে, সাবেক দাসের সন্তান আর সাবেক দাস-মালিকের সন্তান একসঙ্গে ভ্রাতৃত্বের আসনে বসতে সক্ষম হবে। আমার একটি স্বপ্ন আছে যে একদিন, এমনকি মিসিসিপি স্টেটে যে ছটফট করছে অবিচারের উত্তাপে, যে ছটফট করছে নিষ্পেষণের উত্তাপে, সেটিও পাল্টে গিয়ে হয়ে উঠবে মুক্তি আর ন্যায়ের মরূদ্যান। আমার একটি স্বপ্ন আছে যে আমার ছোট চারটি সন্তান একদিন এমন একটি জাতির মধ্যে বসবাস করবে, যেখানে গায়ের রং দিয়ে আর তাদের বিচার করা হবে না, করা হবে চরিত্রগুণ দিয়ে। এই ভাষণের প্রভাবেই ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আইন ও ১৯৬৫ সালে ভোটাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়। আমেরিকা থেকে কাগজে কলমে, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য দূর হয়েছে। এই মানুষটি মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই শান্তিতে নোবেল প্রাইজ পান ১৯৬৪ সালে। প্রাইজ মানি ৫৬,০০০ ডলারের সবটুকুই দান করে দেন নাগরিক অধিকার আন্দোলন সংস্থাগুলোকে।

********** তিয়েনআনমেন স্কয়ার **********
১৯৮৯ সালের জুন মাসে কমিউনিস্ট চীন কেঁপে উঠে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে। এর আগে ১৫ এপ্রিল নিহত হন চীনের সুশীল সমাজের অন্যতম অগ্রনায়ক ও সরকারবিরোধী বুদ্ধিজীবী হু ইয়াওবাং । তার মৃত্যুর পর থেকেই ছাত্র, জনতা ও পেশাজীবীরা প্রতিবাদ জানাতে থাকে বিভিন্ন ভাবে। জুন মাসে রাজধানী বেইজিংয়ের তিয়েনআনমেন স্কয়ারে এ বিক্ষোভের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই সময়ে তিয়েনআনমেন স্কয়ারে জমায়েত হয়ে উদার নীতির আদর্শে উদ্ভাসিত প্রায় ১০ লাখ ছাত্র জনতা ও সাধারণ মানুষ চীন সরকারের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ জানায়। এই আন্দোলনের এক পর্যায়ে চীন সরকার সামরিক আইন জারি করে কঠোর দমননীতির আশ্রয় নেয়। অনুমান করা হয়, চীন সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রায় কয়েক হাজার প্রতিবাদী মানুষকে সে দিন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে হয়েছিলো।

********** বার্লিন দেয়াল ভাঙ্গার ডাক **********
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো জার্মানি। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির রাজনৈতিক ভিন্নতার প্রতীক বার্লিন দেয়াল নির্মিত হয়েছিলো ১৯৬১ সালে বার্লিনের মাঝখান দিয়ে। দেয়াল তুলে আলাদা করে দেওয়া হয়েছিলো সাধারণ জার্মানদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে। রাজনৈতিক ভিন্নতার স্বীকার হয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে মুখ দেখাদেখি হয়েছিলো বন্ধ। আশির দশকের শেষ দিকে পূর্ব জার্মানি নিজেদের রাজনৈতিক নীতির উদারীকরণ শুরু করে। ১৯৮৯ সালে সমগ্র পূর্ব ইউরোপে যখন উদার নীতির জয়গান চলছে, ঠিক তখনই পূর্ব জার্মানি পশ্চিমের সঙ্গে সীমান্ত খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে বছরের ৯ নভেম্বর হাজার হাজার জার্মান বার্লিন দেয়ালের কাছে জড়ো হয়ে দেয়ালটি ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত হয়। তারা দেয়ালের ওপর উঠে নেচে-গেয়ে ২৮ বছরের বিচ্ছেদের প্রতিবাদ জানায়। ভেঙে ফেলে সেই বিচ্ছেদের সৌধ। পরের বছর ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে দুই জার্মানির মধুর মিলন ঘটে।

********** মিসরে আরব বসন্ত **********
হোসনি মোবারক সরকারের লাগামহীন দুর্নীতি, নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্য মূল্য, অসীম বেকারত্ব মিসরীয়দের দারুণ হতাশার জন্ম দেয়। সেই হতাশার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০১১ সালের ২৫ জানুয়ারী। রাজধানী কায়রোর কেন্দ্রে অবস্থিত তাহরির স্কয়ারে জমায়েত হয় মোবারক বিরোধী লাখ লাখ জনতা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এই বিক্ষোভ। পরাজিত হন স্বৈরশাসক হোসনি মোবারক। পরবর্তীতে তিনি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন।

********** ডান্ডি পদযাত্রা বা লবন সত্যাগ্রহ **********
১৯৩০ সালের ১২ মার্চ ডান্ডি পদযাত্রা বা লবন সত্যাগ্রহ শুরু হয়। এই সত্যাগ্রহ ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লবণ পদযাত্রা ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশদের একচেটিয়া লবণ নীতির বিরুদ্ধে একটি অহিংস করপ্রদান-বিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলন। ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পর লবণ সত্যাগ্রহই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠিত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস "পূর্ণ স্বরাজ" প্রস্তাব গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই এই সত্যাগ্রহের সূচনা ঘটে। মহাত্মা গান্ধী আমেদাবাদের কাছে তাঁর সবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডি পদযাত্রা শুরু করে ২৪ দিনে ২৪০ মাইল (৩৯০ কিলোমিটার) পথ পায়ে হেঁটে ডান্ডি গ্রামে এসে বিনা-করে সমুদ্রের জল থেকে লবণ প্রস্তুত করেন। বিরাট সংখ্যক ভারতীয় তাঁর সঙ্গে ডান্ডিতে আসেন। ১৯৩০ সালের ৬ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৬টার সময় গান্ধীজি লবণ আইন ভেঙে প্রথম লবণ প্রস্তুত করেছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর লক্ষাধিক অনুগামীও লবণ আইন ভেঙে ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করলেন। এই আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে

ব্রিটিশদের মনোভাব অনেকটাই বদলে যায়।
.....

Topic :::: Power and Security, Major Ideas and Ideologies

প্রশ্ন: নতুন স্নায়ুযুদ্ধ ব্যবস্থা হবার সম্ভবনা কতটুকু? এ সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত উল্লেখ করুন।

*******নতুন স্নায়ুযুদ্ধ ব্যবস্থা: সংকট ও সম্ভাবনা*********
স্নায়ুযুদ্ধের অবসান: ১৯৮৯ সালের নভেম্বের বার্লিন প্রাচীরের পতন। ২০১৪ সাল সবে শেষ হয়েছে। এ অবস্থায় মনে হচ্ছে, ইউরোপীয় ও মিখাইল গর্বাচভ আন্তর্জাতিক যে রাজনৈতিক কাঠামো ১৯৮৯ সালের পর থেকে বিরাজ করছে, তা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। স্নায়ুযুদ্ধের পর দুনিয়ায় এমন টানটান ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। একদিকে ইউরোপে রক্তপাত হচ্ছে, অন্যদিকে পরাশক্তিগুলোর মধ্যকার আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার ফলে দৃশ্যপটে মধ্যপ্রাচ্যের আবির্ভাব ঘটেছে। সব দেখে মনে হচ্ছে, দুনিয়া দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধের প্রান্তে উপনীত হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, স্নায়ুযুদ্ধ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।
অন্যদিকে দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থা, অর্থাৎ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ, গোলাগুলি ও হত্যাকাণ্ড বন্ধে কোনো ভূমিকা পালন করেনি বা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি বললেই চলে। তারা কেন পরিস্থিতি মূল্যায়নে কোনো সংকল্প নিয়ে কাজ করেনি বা যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করেনি?

আমার ধারণা, এর একটি প্রাথমিক কারণ হতে পারে, স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়ে তারা যে আস্থা অর্জন করেছিল, তা হারিয়ে ফেলেছে। সে রকম আস্থা ছাড়া আজকের বিশ্বায়িত দুনিয়ায় শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়।
কিন্তু এ আস্থা তো আর গতকাল ধূলিসাৎ হয়নি। অনেক আগেই হয়েছে। আজকের পরিস্থিতির গোড়াটি নিহিত রয়েছে ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকের ঘটনায়।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের মধ্য দিয়ে আসলে নতুন ইউরোপ ও নিরাপদ বিশ্বব্যবস্থার গোড়াপত্তন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নতুন ইউরোপীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ও ইউরোপের অসামরিকীকরণ না করে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের বিজয়ী ঘোষণা করে। ন্যাটোর ১৯৯০ সালের ঘোষণায় এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমা নেতাদের মাথায় মঙ্গল ও বিজয়ের ধারণা জেঁকে বসে। রাশিয়ার দুর্বলতা ও শক্তিশালী প্রতিপক্ষের অভাবে বৈশ্বিক নেতৃত্বে একক কর্তৃত্ব দাবির কুফল সম্পর্কে যে সতর্কবার্তা তাদের দেওয়া হয়েছিল, পশ্চিম তাতে কর্ণপাত করেনি।

গত কয়েক মাসে যা ঘটেছে, তা আসলে নিজের সিদ্ধান্ত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ও অংশীদারদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ার কারণে ঘটেছে। এটা ক্ষীণদৃষ্টি। এ ধরনের যেসব কাজ করা হয়েছে এবং যা আর পাল্টে দেওয়া যাবে না তার সংক্ষিপ্ত তালিকা এ রকম: যুগোস্লাভিয়ার যুদ্ধ (বিশেষত কসোভোয়), ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা এবং ইরাক, লিবিয়া ও সিরিয়ার ঘটনা। ফলে যা ছিল ফোস্কা, তা পরিণত হয়েছে গভীর এক ক্ষতে।

এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইউরোপ। পরিবর্তনে নেতৃত্ব না দিয়ে এ মহাদেশটি হয়ে উঠেছে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। প্রভাব বিস্তারে বাসনা ও সামরিক দ্বন্দ্বে মহাদেশটি একেবারে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। ইউরোপ এমন সময়ে দুর্বল হচ্ছে, যখন শক্তির অন্য কেন্দ্রগুলো শক্তিমান হয়ে উঠছে। এটা চলতে থাকলে ইউরোপ বিশ্ব-রাজনীতিতে তার গুরুত্ব হারাবে ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।
১৯৮০-এর দশকের অভিজ্ঞতা সামনের পথে চলার জন্য আমাদের পাথেয় হয়ে উঠছে, এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। সে সময়ের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আজকের চেয়ে কম বিপজ্জনক ছিল না। কিন্তু না, সে সময়ে আমরা শুধু সম্পর্কই স্বাভাবিক করিনি, স্নায়ুযুদ্ধের যবনিকা টেনেছিলাম। মুখ্যত, আলোচনার মাধ্যমেই আমরা তা অর্জন করেছিলাম। কিন্তু আলোচনার ভিত্তি হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা।

আজ সবার আগে আলোচনার ওপরই অগ্রাধিকার দিতে হবে। মিথস্ক্রিয়া, অর্থাৎ একে অপরের কথা শোনার মনোবাসনা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। এখন যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তা বেশ প্রতিশ্রুতিশীল। প্রাথমিক চেষ্টায় অবশ্য খুবই সামান্য ও নাজুক ফলাফল পাওয়া গেছে: যুদ্ধবিরতিতে মিনস্ক চুক্তি, ইউক্রেন থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার, রাশিয়া, ইউক্রেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় গ্যাস চুক্তি এবং পারস্পরিক অবরোধ আরোপের ওপর লাগাম দেওয়া।

তর্কাতর্কি ও পারস্পরিক দোষারোপ থেকে বেরিয়ে এসে ক্রমাগত অবরোধ প্রত্যাহারের এবং একটি মিলনবিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বর্তমান সংস্কৃতি উভয় পক্ষের জন্যই ক্ষতিকর। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংসদেরা তথাকথিত ব্যক্তিগত অবরোধের শিকার হন। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তথাকথিত এই ব্যক্তিগত অবরোধ তুলে নিতে হবে, যাতে তাঁরা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য সমাধানে আসতে পারেন। এই সংযোগের একটি ক্ষেত্র হতে পারে ইউক্রেন। ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের পরিণাম থেকে উঠে এসে পুরো এলাকাটি পুনর্গঠনে সহায়তা করা যেতে পারে।

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ ও প্যান-ইউরোপীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এটা সত্য। সন্ত্রাসবাদ, দারিদ্র্য, অসমতা, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, মহামারি ইত্যাদির মতো আজকের প্রধান প্রধান বৈশ্বিক সমস্যা প্রতিদিনই খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে। এগুলো পরস্পরের থেকে আলাদা হলেও তাদের মধ্যে একটি অভিন্নতাও রয়েছে। এগুলোর কোনোটিরই সামরিক কোনো সমাধান নেই। এসব সমস্যা সমাধানের রাজনৈতিক পদ্ধতি হয় কাজ করছে না, অথবা আদতে তা নেই। যদিও চলমান সমস্যার গুরুত্ব আমাদের অবিলম্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগতভাবে টেকসই মডেল গ্রহণে প্ররোচিত করছে।

ইউরোপের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্যান-ইউরোপীয় সমাধানই কেবল কার্যকর হবে। ন্যাটো সম্প্রসারণ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিরক্ষানীতির মাধ্যমে এই সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা করা হলে তাতে উল্টো ফল হতে পারে। আমাদের আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান ও কার্যসমাধান পদ্ধতি প্রয়োজন, যা অন্তত সবাইকে আশ্বস্ত করতে পারবে।

এ ক্ষেত্রে অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কোঅপারেশন ইন ইউরোপ নামের প্রতিষ্ঠান নিয়ে অনেক আশাবাদ থাকলেও তা শেষমেশ প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি। তার মানে এই নয় যে, তার বদলে নতুন কিছু আনতে হবে। যেহেতু তা ইউক্রেনে নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির সংস্কার করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, এই পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে।

বছর কয়েক আগে সাবেক জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হান্স ডিয়েট্রিচ জেনশার, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেন্ট স্কোক্রফ্ট এবং অন্যান্য নীতিপ্রণেতারা ইউরোপের জন্য একটি নিরাপত্তা পরিষদ অথবা ডিরেক্টরেট গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। একইভাবে, রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি মেদভেদেভ কোনো রাষ্ট্রের প্রতি হুমকির ক্ষেত্রে ইউরোপের নিবৃত্তিমূলক কূটনীতি গ্রহণ ও ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে বাধ্যতামূলক পরামর্শের প্রস্তাব করেছিলেন। এ জাতীয় একটি পদ্ধতি গড়ে উঠলে ইউক্রেনে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটল, তা হয়তো এড়ানো সম্ভব হতো।

এসব ‘ইউরোপীয় কল্পনা’ মহাফেজখানায় ফেলে রাখার দায় রাজনৈতিক নেতাদের ঘাড়ে অবশ্যই বর্তাবে। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য রাজনৈতিক শ্রেণি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও সংবাদমাধ্যমের ওপরও এই দায়ভার এসে পড়বে।
আমি খুব আশাবাদী মানুষ। তার পরও এ সময়ে এসে নৈরাশ্যবাদী না হওয়া খুব কঠিন। তবু আতঙ্ক ও হতাশার কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করা ঠিক হবে না। নেতিবাচক জড়তায়ও নিমজ্জিত হওয়া যাবে না। গত কয়েক মাসের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আলোচনা ও সহযোগিতার সদিচ্ছা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের সব নেতার কাছে এই আমার আবেদন। আসুন, ২০১৫ সালের জন্য আমরা ভাবি, প্রস্তাব দিই ও একসঙ্গে উদ্যোগ নিই।
মিখাইল গর্বাচভ: সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট; শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী।
..... (ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত)

********** জিএসপি **********

জিএসপি: বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা'র (ডব্লিউটিও) সদস্যভুক্ত এবং অনুন্নত (এলডিসি ভুক্ত) দেশ হওয়ার কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা পেয়ে থাকে। এর অন্যতম একটি সুবিধা হলো বাংলাদেশি পণ্যের অগ্রাধিকারমূলক বিশেষ বাণিজ্য সুবিধা বা জেনারালাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স (জিএসপি) সুবিধা। মূলত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার শর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও EU উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে আমদানিকৃত পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে অগ্রাধিকার বা জিএসপি সুবিধা প্রদান করে থাকে।

১৯৭৬ সালে জিএসপি সুবিধা চালু হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এই সুবিধা পেয়ে আসছে। তবে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক খাত এই সুবিধার আওতাভুক্ত নয়। একক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করে। জিএসপি সুবিধা পায় এমন সব পণ্যের মধ্যে রয়েছে তামাকজাত দ্রব্য, প্ল্যাস্টিক, সিরামিকের তৈজসপত্র এবং খেলাধুলোর সামগ্রী। পোশাক খাত জিএসপি সুবিধার আওতায় না থাকায় বিশেষ এই কর সুবিধা প্রত্যাহারে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেনা। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির মাত্র এক শতাংশ জিএসপির আওতাভূক্ত। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদি যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করে জিএসপি সুবিধা আটকে দেয়, তাহলে ইউরোপের বাজারে পোশাক রপ্তানি হুমকিতে পড়বে।

দোহা নীতি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ৯৭ শতাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে তাদের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়ার কথা। বাংলাদেশের ৯৭ শতাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এই সুবিধা দিয়েই রেখেছে। তবে যেসব পণ্য তাতে অন্তর্ভুক্ত আছে তার অধিকাংশই বাংলাদেশ রপ্তানি করে না। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধান রফতানি পণ্য পোশাক শিল্পের জন্য কোনো জিএসপি সুবিধা দেয় না। বাংলাদেশ বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে। বিপরীতে দেশটিতে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করছে। আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশের পণ্যকে ঢুকতে হলে ১৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হয়, পাকিস্তানকে দিতে হয় ৩ শতাংশ আর ফ্রান্সকে দিতে হয় ১ শতাংশ। অথচ একই পণ্যের জন্য ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে শুল্ক নিচ্ছে সর্বোচ্চ এক শতাংশ। এ বছরও বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রকে শুল্ক বাবদ প্রদান করেছে প্রায় ৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। যা যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে ঋণ অনুদান নানাভাবে বাংলাদেশে আসে তার ৬ গুণেরও বেশি। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে নয়, বরং বাংলাদেশই যুক্তরাষ্ট্রকে অর্থের যোগান দিচ্ছে।

***** টিকফা কী ? *********

টিকফা শব্দটি নতুন। আগে এর নাম ছিল টিফা। 'টিফা' চুক্তি হলো Trade and Investment Framework Agreements বা সংক্ষেপে TIFA, যেটিকে বাংলায় অনুবাদ করলে হয় — 'বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাঠামোগত সমঝোতা' চুক্তি। 'টিফা' চুক্তি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে গত বারো বছর আগে থেকে। এই চুক্তির খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু হয় ২০০১ সালে। ১৩টি ধারা ও ৯টি প্রস্তাবনা সম্বলিত চুক্তিটির প্রথম খসড়া রচিত হয় ২০০২ সালে। পরে ২০০৪ সালে এবং তারও পরে আবার ২০০৫ সালে খসড়াটিকে সংশোধিত রূপ দেয়া হয়। দেশের বামপন্থি শক্তিসহ অন্যান্য নানা মহলের তীব্র প্রতিবাদের মুখে চুক্তিটি স্বাক্ষর করা এতদিন বন্ধ ছিল। চুক্তির খসড়া প্রণয়নের পর সে সম্পর্কে নানা মহল থেকে উত্থাপিত সমালোচনাগুলো সামাল দেয়ার প্রয়াসের অংশ হিসেবে এর নামকরণের সাথে Co-operation বা সহযোগিতা শব্দটি যোগ করে এটিকে এখন 'টিকফা' তথা TICFA বা Trade and Investment Co-operamework Agreement ('বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা সংক্রান্ত কাঠামোগত সমঝোতা' চুক্তি) হিসাবে আখ্যায়িত করার হচ্ছে।

********** টিকফা চুক্তিটি কেন ? **********
উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়, বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই টিকফা হচ্ছে। বিশ্বের কোনো দেশের সঙ্গেই তা করতে তো বাধা থাকার কথা নয়, নেইও। তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাধা থাকবে কেন। টিকফা চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি ও আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করবে এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

ইতোমধ্যে ৯২টি দেশ ও আঞ্চলিক জোটের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যুক্তরাষ্ট্র। পুরোপুরি মুক্তবাজার অর্থনীতির দিকে ধাবিত হচ্ছে স্বাক্ষরিত দেশগুলো।

********** চুক্তিতে কী আছে ? **********
১) উভয় পক্ষের সেবা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অশুল্ক বাধা দূর করা, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) আওতায় মেধাস্বত্ব আইন বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মূলনীতি অনুসরণ করে উভয় দেশেরই শ্রম অধিকার বাস্তবায়ন করা এবং পরিবেশের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করতে পরিবেশ আইন মেনে চলা।

২) জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে উভয় পক্ষই জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের প্রতি আনুগত্য দেখাবে। বিশেষ করে কনভেনশনের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত ধারাগুলো বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৩) দেশীয় ও বৈদেশিক উভয় ক্ষেত্রেই বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি করা হবে, যাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং তথ্য প্রযুক্তি খাতের বিকাশের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়।

৪) বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য উভয় দেশের মধ্যে একটি উদার ও অনুধাবনযোগ্য পরিবেশ তৈরির কথা বলা হয়েছে। এর ফলে সম্প্রসারিত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ হবে এবং এ থেকে লাভবান হবে উভয় দেশ। বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পথে বর্তমানে যেসব প্রতিবন্ধকতা এবং রক্ষণশীল উপাদান রয়েছে, সেগুলো কমিয়ে আনা হবে।

৫) চুক্তির ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, এক দেশ আরেক দেশকে লিখিত নোটিশ দিয়ে চুক্তি বাতিল করতে পারবে যে কোন সময়। অর্থাৎ যে পক্ষ চুক্তি বাতিলের নোটিশ দেবে, সেই পক্ষ যদি তা প্রত্যাহার না করে নেয়, তাহলে ১৮০ দিনের মধ্যে চুক্তিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

********** আর কোন কোন দেশের সাথে টিকফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে কী ? *********
মুলত মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকার দরিদ্র ও সংঘাত ময় দেশগুলো, আসিয়ান দেশগুলো, সাবেক সোভিয়েত ব্লকের দেশগুলো, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান।

********** জি এস পি সুবিধার পাবার প্রশ্নের সাথে কি টিকফা চুক্তি যুক্ত ? **********
টিকফার সাথে জি এস পি সুবিধার কোন সম্পর্ক নেই। দোহা নীতি অনুসারে আমেরিকা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ৯৭% পণ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়ার কথা যেটাকে সাধারণভাবে জি এস পি সুবিধা বলা হয়। উল্লেখ্য বাংলাদেশের জন্য সমস্ত জি এস পি সুবিধা আপাতত স্থগিত আছে। আমেরিকা ঠিকই বাংলাদেশের ৯৭% পণ্যের ক্ষেত্রে এই সুবিধা দিয়েছিল তবে তাতে ঐসব পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো যার রপ্তানির পরিমান খুবই কম এবং বাংলাদেশের রপ্তানি সক্ষমতা সামান্য। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাককে সবসময়েই এর বাইরে রাখা হয়েছে। যেই সব পণ্য জি এস পি সুবিধার আওতায় ছিল সেই সব পণ্যের জন্য জি এস পি সুবিধা থাকা আর না সমান কথা। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের যে গার্মেন্টস পণ্য রফতানি হয় তার ওপর উচ্চহারে শুল্ক বসিয়ে রেখেছে তারা। যুক্তরাষ্ট্রের গড় আমদানি শুল্ক হার শতকরা ১ ভাগের মতো। কিন্তু বাংলাদেশের গার্মেন্টসের ওপর শুল্কহার শতকরা গড়ে ১৫ ভাগ। এই শুল্কহার আন্তর্জাতিক বিধিরও পরিপন্থী। এই শুল্ক এমনিতেই বাতিল হওয়া দরকার। এবছরও বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রকে শুল্কবাবদ প্রদান করেছে প্রায় ৫৬০০ কোটি টাকা। এটা যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে ঋণ অনুদান নানাভাবে বাংলাদেশে আসে আসে তার ৬ গুণেরও বেশি। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে নয়,বাংলাদেশই যুক্তরাষ্ট্রকে অর্থের যোগান দিচ্ছে।

********** বাণিজ্য শুল্ক **********
বাংলাদেশের রাজস্ব আয়ের একটি বড় অংশ আসে বাণিজ্য শুল্ক থেকে। তাই শুল্কমুক্ত বাজার করা হলে দেশের রাজস্ব আয়ের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। এজন্য রাজস্ব আয়ের ভিন্ন খাতের উপর জোর দিতে হবে। ১৯৯০ সাল থেকে বাংলাদেশে বাণিজ্য উদারীকরণ বাড়ানোর ফলে আমদানি ও রফতানি উভয়ই বেড়েছে। রফতানি পণ্য ও রফতানির বাজারে কিছুটা বৈচিত্র্য এসেছে। তবে এর মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি কমেনি। সমালোচকদের মতে, এই চুক্তিতে উদার বাণিজ্য নীতি, মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং মেধাস্বত্ব আইনের

বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। বাণিজ্য থেকে পাওয়া করের ওপর বাংলাদেশ অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। দেশের করের প্রায় ২৪ শতাংশ আসে বাণিজ্য কর থেকে। অন্যান্য দেশে এ হার অনেক কম। তাই শুল্কমুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আগে বিকল্প আয় বাড়াতে হবে এবং দেশীয় শিল্পের সক্ষমতাও বাড়ানো প্রয়োজন।

********** টিকফা: সমস্যা ও সম্ভাবনা **********

টিকফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে দেশে মার্কিনি বিনিয়োগ বাড়বে, এটা সত্য কথা। এতে করে আমাদের বাজার ও সেবা খাত উন্মুক্ত হয়ে যাবে মার্কিন বিনিয়োগকারীদের জন্য। ব্যাপক প্রাইভেটাইজেশন ঘটবে, তাতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্যক্তিগত খাত। টিকফা চুক্তির (প্রস্তাবিত) ৫ ও ১৯ ধারা মতে উভয় দেশ (বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র) বাণিজ্যে বেশ নমনীয় নীতি গ্রহণ করবে এবং ব্যাপক বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করবে। ৮ নম্বর ধারায় ব্যাপক ব্যক্তিগত খাত প্রসারের কথা বলা হয়েছে। এই ধারায় একটি বাণিজ্য ও বিনিয়োগে কমিশন গঠন করার কথাও আছে। এদের কাজ হবে ব্যক্তিগত খাত কিভাবে আরো বিকশিত করা যায়, সে ব্যাপারে উভয় সরকারকে উপদেশ দেওয়া। ৯ নম্বর ধারায় বলা আছে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে, কিন্তু উৎপাদন খাতে জড়াবে না। অর্থাৎ কোনো পণ্য উৎপাদন করবে না। যুক্তরাষ্ট্রের কম্পানিগুলো বিনিয়োগ করবে বিশেষ করে সেবা খাতে এবং এসব কম্পানিকে ট্যাক্স সুবিধা দিতে হবে। আইনে যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়, তাহলে বাংলাদেশকে সেই আইন সংশোধন করতে হবে। ফলে স্থানীয় উদ্যোক্তারা মার খাবে। তারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। চুক্তির ফলে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কম্পানিগুলোকে নিরাপত্তা দিতে বাধ্য থাকবে। জ্বালানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, বন্দর ব্যবহার, টেলি কমিউনিকেশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ বেড়ে যাওয়ায় এসব খাতে সরকারি বিনিয়োগ কমে যাবে। ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিক্ষা খাতে সরকারি বিনিয়োগ কমে গেলে, শিক্ষা খাত পণ্যে পরিণত হবে। উচ্চ শিক্ষা ব্যয়বহুল হয়ে যাবে। এতে করে শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের বৈষম্য তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে খরচ বেড়ে যাবে। এসব সেবামূলক খাত থেকে সাধারণ মানুষ যে 'সেবা' পেত, তা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানির দাম বেড়ে যাবে। তবে সবচেয়ে ঝুঁকির মুখে থাকবে কৃষি ও আইটি সেক্টর। কৃষিতে সরকার যে ভর্তুকি দেয়, তা আর দিতে পারবে না। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার দোহা চুক্তিতে বলা হয়েছিল, স্বল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিতে ৫ ভাগের বেশি ভর্তুকি দিতে পারবে না। টিকফা চুক্তির ১৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, কৃষিতে ভর্তুকির পরিমাণ কমাতে হবে। মজার ব্যাপার হলো, যুক্তরাষ্ট্র নিজে কৃষিতে ভর্তুকি দেয় ৯ শতাংশ। এখন বাংলাদেশে কৃষি সেক্টরে ভর্তুকি কমানো হলে কৃষিতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। কৃষক উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। ফলে কৃষি উৎপাদন, বিশেষ করে চাল উৎপাদন হ্রাস পাবে। বাংলাদেশকে এখন চাল আমদানি করতে হয় না। কিন্তু উৎপাদন হ্রাস পেলে মার্কিন কৃষি পণ্যের এক বিশাল বাজার তৈরি হবে বাংলাদেশে। বলা হচ্ছে টিকফা চুক্তি হলে বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়বে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ার আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা, অত্যন্ত উচ্চ কর দিয়ে (১৫ দশমিক ৩ ভাগ) বাংলাদেশ তার রপ্তানি বাজার সম্প্রসারিত করেছে। অথচ চীনের মতো বড় অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের চেয়ে কম কর দেয় (মাত্র শতকরা ৩ শতাংশ)। অথচ চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো টিকফা চুক্তিও নেই। বাংলাদেশ বড় সমস্যায় পড়বে মেধাস্বত্ব আইন নিয়ে। বাংলাদেশের ওষুধশিল্প উন্নয়নশীল দেশে নাম করলেও টিকফা চুক্তির পর এই শিল্প এক ধরনের ঝুঁকির মুখে থাকবে। কেননা, ওষুধ কম্পানিগুলো প্যাটেন্ট কিনে কাঁচামাল আমদানি করে সস্তায় ওষুধ তৈরি করে। বিশ্বের ৬০টি দেশে এই ওষুধ রপ্তানি হয়। তখন এই টিকফা চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ওষুধ কম্পানিগুলোর প্যাটেন্ট ক্রয় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যদিও ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য এই সুযোগটি রয়েছে। বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে মার্কিন কম্পানির লাইসেন্স কিনতে হবে। ওই লাইসেন্স দিয়ে ওষুধ তৈরি করতে হবে। ফলে জীবন রক্ষাকারী ওষুধের দাম বেড়ে যাবে।

******** মেধাসত্ব বা পেটেন্ট আইন মানতে হলে সমস্যা কী ********

পেটেন্ট কোন প্রতিষ্ঠানকে মেধাসত্ব দিয়ে দেয়। ফলে সে সেই মেধাসত্বের ভিত্তিতে সেই পেটেন্টের সাথে সম্পর্কিত যে কোন বাণিজ্যে সে রয়্যালটি দাবী করতে পারে। যেমন নিমের পেটেন্ট করা আছে আমেরিকার তাই নিম গাছ থেকে উৎপাদিত যে কোন পণ্যে সে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কাছে রয়্যালটি দাবী করতে পারবে। বীজ এবং কৃষি পণ্যের দাম অনেকগুন বেড়ে যাবে বলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। তৈরি পোশাক শিল্পকেও ব্র্যান্ড নামে ব্যবহৃত এদেশের তৈরি এ্যাকসেসরিজের জন্য সংশ্লিষ্ট মার্কিন কোম্পানিকে রয়্যালটি দিতে হবে। বাসমতি চাল,চিরতার রস,নিমের দাঁতন ইত্যাদি হেন বস্তু নেই যা আগেভাগেই মার্কিনীসহ বিদেশি কোম্পানিরা পেটেন্ট করে রাখেনি। মেধাস্বত্ব অধিকারের ধারা প্রয়োগ করে তারা এসবকিছুর জন্য রয়্যালটি প্রদানে বাংলাদেশকে 'টিকফা' চুক্তি মাধ্যমে বাধ্য করবে। একবার নাইজেরিয়ায় একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট কিনেছিলাম যেটা অ্যামেরিকান প্যাটেন্ট করা, সেই প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের দাম যেখানে বাংলাদেশে এক টাকার কম সেটা নাইজেরিয়ায় বাংলাদেশী মুদ্রায় ২৭ টাকা লেগেছিল। এই অতিরিক্ত ২৬ টাকা প্যাটেন্ট বা মেধাসত্বের মূল্য। মেধাসত্বের মূল্য সবসময় মুল পণ্যটির চাইতে কয়েকগুন হয়ে থাকে।

********** করনীয় কী **********
জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে কোনো চুক্তি হলে তা দেশের জন্য বয়ে আনে সর্বনাশের বার্তা। তাই টিকফার ফলে দেশীয় শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা যেন ধ্বংস না হয় সেদিকে সচেতন দৃষ্টি প্রয়োজন।

যে কোন চুক্তি স্বাক্ষর হওয়া মানেই সেটা সাথে সাথে বাস্তবায়িত হওয়া নয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পরে সেটা স্ব স্ব দেশে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের মধ্য দিয়ে জেতে হয়। জাতীয়ভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারলে বাংলাদেশে আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত তৈরি করা সম্ভব। টিকফার আর্টিকেল সেভেন অনুসারে ১৮০ দিনের লিখিত নোটিশ দিয়ে বাংলাদেশ এই চুক্তি বাতিল করে দিতে পারে। তবে অ্যামেরিকার সাথে হওয়া চুক্তি বাতিল করবার মতো নৈতিক অবস্থান, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং শক্ত মেরুদণ্ড নেতৃত্বের থাকতে হবে। তবে শেষ বিচারে জনমতের তীব্র উত্তাপ যে কোন গণ বিরোধী ও রাষ্ট্র বিরোধী চুক্তির প্রধান রক্ষা কবচ।

Export to USA under GSP scheme	
India	3.7 billion
Brazil	2 billion
Bangladesh	26.33 million

New Development Bank

সম্ভাব্য প্রশ্ন: (বড় প্রশ্ন বা টীকা)
১. "উদীয়মান দেশের নতুন উদ্যোগ ব্রিকস ব্যাংক বা New Development Bank " - এর উদ্যোগ ও গঠন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. ব্রিকস ব্যাংক গঠনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৩. বিশ্ব ব্যাংক ও আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) কি তাহলে এবার সত্যিই প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে যাচ্ছে? আপনি কি মনে করেন তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য কি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি?
৪. ব্রিকস ব্যাংক এর সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত আলোচনা করুন।
৫. ব্রিকস ব্যাংক এর চ্যালেঞ্জ ও এটি নিয়ে আন্তর্জার্তিক রাজনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

সম্পর্কিত বিষয় (Related Topics):
আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি :: International Economic Relations, Global Initiatives and Institutions.
==========
== ব্রিকস ব্যাংক বা New Development Bank :: উদীয়মান দেশের নতুন উদ্যোগ
==========

===== উদ্যোগ ও গঠন =====
ব্রিকস নেতৃবৃন্দ, অর্থাৎ ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, গণচীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীগণ ১৫ জুলাই, ২০১৪ ব্রাজিলের ফোর্তালেজা শহরে এক ঐতিহাসিক সভায় মিলিত হন। ব্রাজিলের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত মনোরম এ শহরে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে আলোচনা করেন চার মহাদেশের পাঁচ প্রভাবশালী দেশের নেতারা। তারপর অনেক প্রত্যাশা ও শুভেচ্ছা নিয়ে হাসিমুখে হাতে হাত রাখেন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রৌসেফ, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমা। ওরা ব্রিকস ব্যাংক গঠনের ঘোষণা দিলেন, ব্যাপক প্রতিশ্রুতি ও অপার সম্ভাবনার আশা ব্যক্ত করে।

===== প্রেক্ষাপট =====
বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন, কৌশলগত পরামর্শ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা দিয়ে আসছে। তবে সময়ের পরিক্রমায় আর্থিক ও বাণিজ্যিক ভুবনে বর্তমানে অনেক নতুন শক্তি ও ভাবনারও উত্থান ঘটছে। এমন প্রেক্ষাপটে নতুন ধারার অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়া স্বাভাবিক। ব্রিকস (BRICS- Brazil, Russia, India, China, South Africa) ব্যাংকের ঘোষণা তেমনই একটি নতুন প্রতিশ্রুতি।

=== একনজরে ব্রিকস ব্যাংক (প্রয়োজনীয় তথ্য) ===
---

১. উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবকাঠামো বির্নিমাণে ব্রিকস ব্যাংক কাজ করবে।
২. চীনের বৃহৎ বাণিজ্য নগরী সাংহাইতে অবস্থিত হবে এ ব্যাংকের সদর দপ্তর।
৩. দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকবে এই ব্যাংকের আফ্রিকান আঞ্চলিক সদর দপ্তর।
৪. ব্যাংকের প্রথম প্রেসিডেন্ট হবেন একজন ভারতীয়। (On 11 May 2015, K. V. Kamath was appointed as President of the Bank)
৫. বোর্ড অব গভর্নর্সের প্রথম চেয়ারপারসন আসবেন রাশিয়া থেকে।
৬. আর পরিচালনা পর্ষদের প্রথম প্রধান হবেন একজন ব্রাজিলিয়ান।
৭. এই ব্যাংকের অনুমোদিত মুলধন হবে ১০ হাজার কোটি ডলার, তবে প্রাথমিক মূলধন হবে ৫ হাজার কোটি ডলার। গণচীন দিবে ৪ হাজার একশত কোটি ডলার। ব্রাজিল, ভারত ও রাশিয়া দিবে প্রত্যেকে ১ হাজার আট শত কোটি ডলার করে। ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা দিবে ৫ শত কোটি ডলার।
৮. ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হবে ২০১৬ সাল থেকে।

The New Development Bank (NDB), previously referred to as the BRICS Development Bank, is a multilateral development bank operated by the BRICS states (Brazil, Russia, India, China and South Africa) as an alternative to the existing US-dominated World Bank and International Monetary Fund.

=== বিশ্ব ব্যাংক ও আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) কী প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে যাচ্ছে? তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য কি সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি? ===

ব্রাজিলের অর্থমন্ত্রী গুইডো মনে করেন, ‘‘বিশ্ব ব্যাংকের কর্তৃত্ব বরাবরই ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকে। ব্রিকস ব্যাংক হবে গণতান্ত্রিক।’’

তাঁর কথা ঠিক হলে বলতে হয়, সম্ভবত একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাংক তার শুভসূচনা করল। এই ব্যাংকের অনুমোদিত মুলধন হবে ১০ হাজার কোটি ডলার, তবে প্রাথমিক মূলধন হবে ৫ হাজার কোটি ডলার। গণচীন দিবে ৪ হাজার একশত কোটি ডলার। ব্রাজিল, ভারত ও রাশিয়া দিবে প্রত্যেকে ১ হাজার আট শত কোটি ডলার করে। ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা দিবে ৫ শত কোটি ডলার। তবে পরিচালনা ও ঋণদান বিষয়ক নিয়মাবলী নিয়ে পর্যায়ক্রমে আরও আলোচনা হবে এবং সিদ্ধান্ত হবে সে অনুযায়ী।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অভিমত হচ্ছে, শুরু থেকেই ‘স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে, সকলের অভিমত গ্রহণ করে’ ব্রিকস ব্যাংক তার কাজ পরিচালনা করবে। ওদিকে ব্যাংকের সূচনালগ্নে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রৌসেফের বক্তব্য হচ্ছে– ‘‘ব্রিকস ব্যাংক এবং সঞ্চিত আমানতের চুক্তিতে আমরা যে স্বাক্ষর করেছি তা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রশাসনের নতুন

নকশা প্রদানে মূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আমরা একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা চাই ন্যায়বিচার ও সমঅধিকার। আইএমএফকে দ্রুত ভোটাধিকার কোটা পরিবর্তন করতে হবে, উদীয়মান দেশগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে।"

উদ্যোক্তারা বলছেন, একটি গণতান্ত্রিক ধারার সূচনা করা এবং সকলের অভিমত গ্রহণ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ছাড়াও, বিশ্ব পরিমণ্ডলে নতুন অর্থনৈতিক প্রশাসনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা এর লক্ষ্য। শতাব্দী ধরে আর্থিক বিশ্বে আধিপত্যবাদের অবসানের লক্ষ্যে ব্রিকস ব্যাংকের শুভযাত্রার মাধ্যমে উদীয়মান দেশসমূহ বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ-এর প্রতি অর্থবহ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিবে বলে অনেক পর্যবেক্ষকও মনে করছেন।

=== ব্রিকস ব্যাংক :: সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত ===

ব্রিকসভুক্ত পাঁচ দেশের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে বিশ্বের প্রায় ৪২ শতাংশ। বিশ্বের মোট পুঁজি বিনিয়োগের ১১ শতাংশ এবং বৈশ্বিক মোট দেশজ উৎপাদনের ২০ শতাংশ এই পাঁচটি দেশ থেকেই আসে। তাই অর্থনৈতিক প্রজ্ঞাবান দার্শনিকদের ধারণা হচ্ছে, এই ব্যাংকের সম্ভাবনা বিশাল ও ব্যাপক। বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ তাদের আধিপত্যবাদের অস্তমিত সূর্যকে এবার অবশ্যই অবলোকন করবে। তাই তাদের এখনই মাথা নত করে প্রতিযোগিতার পরিমণ্ডলে টিকে থাকার লড়াই শুরু করা দরকার।

== ব্রিকস ব্যাংক :: চ্যালেঞ্জ ও আন্তর্জার্তিক রাজনীতি ==

অর্থনীতির গতিপ্রবাহ চলে নিজস্ব ধারায়। প্রশ্ন হচ্ছে, কী হারে এ ব্যাংক ঋণ দিবে। বিশ্ব ব্যাংক এখন তৃতীয় বিশ্বে, বিশেষত বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ দেয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ০.৭৫ শতাংশ অর্থাৎ ১ শতাংশেরও কম সুদের হারে। এছাড়াও, বড় ধরনের সুবিধা হচ্ছে, প্রায় চল্লিশ বছর পর, এ ঋণ পরিশোধের তালিকায় আসে। তার মানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দ্বারে বিশাল এক সুযোগ উন্মুক্ত করে রেখেছে বিশ্ব ব্যাংক। এ কারণেই বাংলাদেশের জনগণ পদ্মা সেতু নির্মাণে বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বিনা সুদে জাইকার অর্থগ্রহণে উৎসাহ প্রদর্শন করেছে।

ব্রিকস অবশ্য এখনও কিছু ঘোষণা করেনি যে, কোন দেশ এবং কী জাতীয় ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধার আওতায় আসবে এবং অবকাঠামো নির্মাণে কেমন শর্তাবলী আরোপিত হবে। এসবই সামনে আলোচনার বিষয় হিসেবে চলে আসতে যাচ্ছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ যদি ব্রিকস ব্যাংকের সদস্য হয়, তবে বিনিয়োগের হার কী হবে এবং ভোটাধিকার থাকবে কিনা, সবই ভবিষ্যত বলে দিবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্ব ব্যাংকের পরিচালনায় বিকল্প নির্বাহী পরিচালকের ভূমিকা পালন করছে এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গভর্নিং বডির সদস্য।

মূলত একটি ব্যাপক প্রতিযেগিতার সূত্রপাত করতে যাচ্ছে ব্রিকস ব্যাংক। বিশ্ববাসী অবশ্যই দেখবে অথনৈতিক সম্প্রসারণবাদের অবসান অবশ্যম্ভাবী। তাতে উদীয়মান অর্থনীতির দেশসমূহ বিশ্ব অর্থনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব বিস্তার করবে।
তাই গোল্ডম্যান গ্রুপের জোহানসবার্গ শাখার প্রধান কলিন কোলম্যান মনে করেন, "কূটনৈতিক ও আর্থিকভাবে আমরা এখন বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উদীয়মান বাজারের অংশীদার। আমরা তৃতীয় বিশ্বের আমজনতা। আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বরাবরই সোচ্চার, এ সব ব্যাপারে আমাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ তীব্র ও কঠোর। আমরা পরিশ্রম করে অগ্রগতি অর্জন করব, কারও অঙ্গুলির নির্দেশনা মানতে আমরা রাজি নই।"

তবে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এ জাতীয় অর্থনৈতিক উদ্যোগ কীভাবে প্রভাবিত করে তা বুঝে উঠা কঠিন। রাশিয়ার উপর যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে যাচ্ছে। ইউক্রেন প্রশ্নে ভারত, গণচীন ও ব্রাজিল নিরব থাকলেও সকলের ভাবনা এক নয়। মালয়েশিয়ার বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে ১৭ জুলাই বিকাল ৫ টায় এবং ২৯৮ জন আরোহীর সবাই নিহত হয়েছেন। ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, সে দেশের পূর্বাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে বিমানটি ভূপাতিত করেছে। এ নিয়ে বিশ্ব পরিস্থিতি এখনও ঘোলাটে। ওদিকে ব্রাজিলের নির্বাচন সামনে। দিলমা রৌসেফ যদি নির্বাচনে জিতে আসতে না পারেন, পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে বলা কঠিন।

এভাবে রাজনৈতিক অঙ্গন ভিন্নরূপ নিতে চলেছে। তাই প্রশ্ন থেকে যায়, এ সকল রাজনৈতিক ব্যতিক্রমধর্মী কর্মকাণ্ড ব্রিকস ব্যাংকের মহান উদ্যোগে প্রভাব বিস্তার করে তার অভীষ্ট পূরণে সহায়তা করবে কিনা। ভবিষ্যতই সেটা বলে দিবে।

উপসংহার:
বিশ্ব পরিমণ্ডলে অর্থনৈতিক প্রশাসনে প্রতিযোগিতা তীব্র হলে এবং অর্থনৈতিক ভুবনে আধিপত্যবাদবাদের অবসান হলে, বিশ্বে বৈষম্য হ্রাস পাবে। তাই আজকের প্রত্যাশা, নতুন ব্যাংকের যাত্রা শুভ হোক।
.....

E –commerce

Subject: General Science(Information Technology)

Topics:E –commerce technology and its impact to society

প্রশ্নঃ
**** ইকমার্স কী-? ইকমার্স সম্পর্কে যা জানুন লিখুন।-
**** ইকমার্স টেকনোলজি কীভাবে পরিচালিত হয়-?
**** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইকমার্সের ভূমিকা লিখুন।-

=====ই কমার্স-কী?=====

ইলেকট্রনিক কমার্স কে সংক্ষেপে ইকমার্স বলা হয়। এটি একটি আধুনিক ব্যবসা পদ্ধতি। ইন্টারনেটের- মাধ্যমে এ ব্যবসা এবং লেনদেন পরিচালিত হয়ে থাকে। বস্তুত ইলেকট্রনিক কমার্স হচ্ছে ডিজিটাল ডাটা প্রসেসিং এবং ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা সংক্রান্ত আদান প্রদান। সাধারণত এ কাজটি সম্পাদন করা হয় সবার জন্য উন্মুক্ত

একটি নেটওয়ার্ক তথা ইন্টারনেটের মাধ্যমে। তাই বলা যায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা সংক্রান্ত আদান প্রদান বা লেনদেন করার প্রক্রিয়াই হলো ইকমার্স।-

=====ই=====কমার্সের ইতিহাস-

সত্তর দশকে ইকমার্স-কমার্সের সুচনা হয়। কিন্তু আমরা বর্তমানে যে ই- সিস্টেমটি দেখছি এ পর্যায়ে প্রায় ৩০ বছর সময় লেগেছে। গত ৩০ বছরে ইলেকট্রনিক কমার্সের মানেটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ইলেকট্রনিক কমার্স বলতে প্রথমে যা বোঝা যেত সেটি হলো ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনিক ডেটা ইন্টারচেঞ্জএবং ইলেকট্রনিক ফান্ড (ইডিআই) এর মতো (ইএফটি) ট্রান্সফার প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি। এই উভয় প্রযুক্তিই ১৯৭০ সালের পরে চালু হয়। আর এর ফলে ব্যবসার ক্ষেত্রে পারচেজ অর্ডার কিংবা ইনভয়েসের মতো বাণিজ্যিক ডকুমেন্টগুলো ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রেরন করার সুযোগ তৈরী হয়। ইকমার্সের আরেকটি রূপ ছিল এয়ারলাইন- রিজার্ভাশন সিস্টেমের প্রবর্তন। যুক্তরাষ্ট্রে স্যাবরে এবং যুক্তরাজ্যে ট্রাভিকম নামের দুটি প্রতিষ্ঠান এর প্রচলন ঘটায়। মিশেল আলড্রিচ এর হাত ধরে ১৯৭৯ সালে যুক্তরাজ্যে অনলাইন শপিং এর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯০ সাল থেকে ইকমার্সে যুক্ত হয় এন্টারপ্রাইজ - রিসোর্সc¬vwbs সিস্টেম,ডেটা মাইনিং এর মত বিষয়গুলো। ১৯৯৪ সালের দিকে ইন্টারনেট ব্যপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তারপরও সিকিউরিটি প্রটোকলসমূহ ও ডিএসএল)DSL) এর প্রচলন হতে আরও পাঁচটি বছর সময় লাগে। এর ফলে ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে ঘটেছে অভাবনীয় উন্নতি। আর ২০০০ সালের দিকে অসংখ্য ইউরোপ এবং আমেরিকান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের সেবাগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মাধ্যমে শুরু করে। এর পর থেকে সবাই ইকমার্স- নামের সাথে ক্রমেই পরিচিত হয়ে ওঠে।

=====প্রকারভেদ=====

• ব্যবসা) ব্যবসা-থেকে-B2B):
ব্যবসাব্যবসা ইলেকট্রনিক কমার্স সম্পাদিত হয় একাধিক ব্যবসা-থেকে- প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। ৮০ শতাংশের মত (%৮০) ইলেকট্রনিক কমার্স ব্যবসাব্যবসা প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত।-থেকে-
• ব্যবসা) গ্রাহক-(থেকে-B2C):
ব্যবসাগ্রাহক ইলেকট্রনিক কমার্স সম্পাদিত হয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও-থেকে- গ্রাহকের মধ্যে। এই প্রকারে দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা বেশি ইলেকট্রনিক বানিজ্য সম্পাদন হয়ে থাকে।
• ব্যবসা) সরকার-থেকে-B2G):
ব্যবসাসরকার-থেকে- ইলেকট্রনিক কমার্স সম্পাদিত হয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় খাতের মধ্যে। এটি সাধারনত ব্যবহৃত হয়ে থাকে রাষ্ট্রীয় কেনাবেচা/, লাইসেন্স সংক্রান্ত কার্যাবলী, কর প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে।
• গ্রাহক) গ্রাহক-থেকে-C2C):
গ্রাহকগ্রাহক ইলেকট্রনিক কমার্স সম্পাদিত হয় একাধিক ব্যক্তি ও-থেকে- গ্রাহকের মধ্যে। ইলেকট্রনিক বাজার ও অনলাইন নিলাম এর মাধ্যমে সাধারণত এই ধরনের বানিজ্য সম্পাদিত হয়।
• মোবাইল কমার্স)m-commerce):
মোবাইল কমার্স ইলেকট্রনিক কমার্স সম্পাদিত হয় তারবিহীন প্রযুক্তি যেমন মোবাইল হ্যান্ডসেট বা পারসোনাল ডিজিটাল অ্যাসিস্টেন্ট)PDA) এর মাধ্যমে। তারবিহীন যন্ত্রের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের গতি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির সাথে সাথে - এই ধরনের বানিজ্য জনপ্রিয়তা লাভ করছে।
গ্রাহক থেকে সরকার (সি টু জি) কখনো সরসরি জনগনের কাছ থেকে সরকার বিভিন্ন সেবার বিনিময় ফি বা কর নিয়ে থাকে। যখন এর মাঝে কোন মাধ্যমে থাকেনা তখন এটা গ্রাহক থেকে সরকার পক্রিয়া বলে বিবেচিত হয়। ডিজিটাল গর্ভসসেমএর আওতার এ ধরনের সেবা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

=====ই=====কমার্স প্রক্রিয়াটি যেভাবে কাজ করে–

ইকমার্স–ব সাইট থাকে। উক্ত সাইটকে বলা হয় ইকমার্স সিস্টেমে একটি ওয়ে– সাইট। ই কমার্স সাইটে বিভিন্ন ধরনের– পন্য এবং এদের দামসহ অন্যান্য বিবরণ দেওয়া থাকে। ক্রেতা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন পণ্যের অর্ডার প্রদান করেন। অর্ডার গ্রহন করার জন্য ওয়েবসাইটে শপিং কার্টের ব্যবস্থা থাকে। তাতে ক্লিক করলে ক্রেতার কাছে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রদান করতে বলা হয়। ক্রেতা ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করে উক্ত পরিমান অর্থ প্রদান করেন। আর্থিক লেনদেনের এ বিষয়টি অত্যন্ত সুরক্ষিত উপায়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার পর অর্ডার ফরমটির যাবতীয় কার্যক্রম সমপন্ন হয়ে যায়। এ সংক্রান্ত তথ্য একই সাথে ই–মেইল আকারে ক্রেতা, বিক্রেতা এবং ওয়্যার হাউসে প্রেরিত হয়। প্রয়োজনীয় অর্ডার ফরমটি পৌছালে ক্রেতাকে উক্ত পণ্য সরবরাহের উদ্দেশ্য পণ্য পরিবহন সংস্থায় পৌঁছে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট ক্যারিয়ার উক্ত শিপমেন্টকে নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতার বাড়িতে পৌছে দেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিববহনের জন্য কোন ফি নেওয়া হয় না আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিববহনের জন্য অতিরিক্ত ফি নেওয়া হয়। এটা নির্ভর করে সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানের উপর।

=====ই কমার্সের জন্য যা যা প্রয়োজন=====

বিক্রেতার জন্যঃ
• ইকমার্স উপযোগী ওয়েবসাইট।–
• দ্রুত ও কার্যকরভাবে অর্ডার প্রক্রিয়া করার জন্য ইন্ট্রানেট ও সার্ভার।
মধ্যবর্তী মাধ্যমঃ
• ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার,ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মূল্য প্রদানের ও সমধর্মী সেবা প্রদানকারী ব্যাংক প্রতিষ্ঠান।
• দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনকারী প্রতিষ্ঠান।
• পণ্য ও মুদ্রা স্থানান্তর ও পরিবহনে নিরাপত্তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।
গ্রাহকের জন্যঃ
• ইন্টারনেট সুবিধা।
• মূল্য পরিশোধের জন্য ক্রেডিট কার্ড বা সমধর্মী মাধ্যম।
সরকারীভাবেঃ
• ই ও মান নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় আইন ও নীতিমালা।কমার্স এর নিরাপত্তা–

=====ই কমার্সের মাধ্যমে–যে ধরণের সেবা পাওয়া যাবে=====

• অনলাইন পণ্য ও সেবা
১মিডিয়া স্ট্রিমিং .
২বুক-ই ইলেকট্রনিক .
৩সফটওয়্যার .
• রিটেইল সেবা
১ব্যাংকিং .
২অর্ডারিং ফুড .
৩ডেলিভারি ফ্লাওয়ার অনলাইন .
৪রেন্টাল ডিভিডি .
৫ট্রাভেল .

• মার্কেটপ্লেস সেবা
১কম্যুনিটি ট্রেডিং .
২নিলাম .
৩ওয়ালেট অনলাইন .
৪বিজ্ঞাপন .
৫সেবা তুলনামূলক যাচাইয়ের মূল্য .

এছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে উৎপাদিত বা তৈরিকৃত পণ্যের বিপনন প্রক্রিয়াটিও ই কমার্স সাইটের মাধ্যমে করা যায়।আপনার-পণ্যের বিপনন বা বিক্রির জন্য প্রয়োজন হবে একটি ইকমার্স ওয়েবসাইটের। ওয়েব সাইটট-িতে আপনি আপনার পণ্যের ছবি, মূল্য সহ অন্যান্য বিষয় গুলো তুলে ধরবেন ক্রেতাগণ সাইটটির মাধ্যমে আপনার পণ্যের গুনাবলি এবং বৈশিষ্ট্য জানতে পারবে এবং তাদের চাহিদা অনুযায়ী অর্ডার করবে। এভাবে নির্দিষ্ট সিস্টেম অবলম্বন করে কাজটি সম্পন্ন করা হয়।

=====কয়েকটি ইকমার-ৃস সাইটের ঠিকানা=====

১. Amazon.com
২. Ebay.com
৩. Quicker.com
৪. BestBuy.com
৫. E-biponi.com
৬. Rokomari.com
৭. Giftbd.com
৮. Upoharbd.com
৯. Clickbd.com
১০. Bdhut.com

=====সমাজে ই=====কমার্সের প্রভাব-

তথ্য প্রযুক্তি এখন মানব জীবনের একটি আবিছেদ্য অংশ। বিশ্বায়নের কল্যাণে উন্নত দেশের খোঁজখবর ঘরে বসেই পাওয়া সম্ভব। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে বাংলাদেশের ব্যবসাবাণিজ্যেও প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। তবে এই- ক্ষেত্রে বাইরের বিশ্ব যেখানে অনেক অগ্রসর, বাংলাদেশ সেখানে অনেকটা পিছিয়ে আছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহারের কারনে এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে অনেক সহজ এবং দ্রুততর। ফলশ্রুতিতে ব্যবসাবানিজ্যের প্রচার ও প্রসার ঘটছে-দ্রুত। বর্তমানে বাংলাদেশে যে ডিজিটাল যুগের সূচনা হয়েছে তারই পথ ধরে ইকমার্স বা ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসা - বাণিজ্য আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।
আমাদের দেশে ইকমার্সের সূচনা নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে যখন ইন্টারনেট- জনসাধারণের হাতে পৌঁছে। বাংলাদেশে বিবি এর প্রচলন সবচেয়ে বেশি। এর কারন-টু- হচ্ছে আমাদের গার্মেন্টস সেক্টর। তৈরি পোশাক শিল্পের ক্রেতাগণ সাধারণত ইন্টারনেটের মাধ্যমেই বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে স্যাম্পল সংগ্রহ করে থাকে। উন্নতবিশ্বে বিসি এবং-টু- সিসি খুবই জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য হলেও বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে অনেক -টু- পিছিয়ে আছে। বর্তমানে কিছু ওয়েবসাইট ইন্টারনেটের মাধ্যমে কেনাবেচার সুবিধাগুলো প্রদান করছে তবে তার পরিসর স্বল্প। এই অনগ্রসরতার কারণ হিসেবে মনে করা হয় আমাদের দুর্বল প্রযুক্তি ব্যবস্থা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে অনগ্রসরতা। এছাড়াও বাংলাদেশের ধীর গতির ইন্টারনেট সার্ভিস এবং আন্তর্জাতিক মানের পেমেন্ট গেটওয়ে না থাকার কারনেও উপরক্ত দুটি সেক্টর প্রসার লাভ করছেনা। কিন্তু এত প্রতিবন্ধকতা সত্তেও আশার আলো হিসেবে ইন্টারনেটে কেনাকাটা বা প্রয়োজনীয় জিনিসের তথ্য খুঁজে বের করা এখন অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

যেসব ক্ষেত্রে আমরা এখন ইন্টারনেটের শরণাপন্ন হচ্ছি তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিল পরিশোধ, হোটেল বুকিং, বিমানের টিকেট বুকিং, অনলাইন ব্যাংকিং, নতুনবিক্রয়-পুরাতন দ্রব্যাদি ক্রয়-, রিয়াল এস্টেট ব্যবসা, গাড়ি বা অন্যান্য যানবাহন ক্রয়:বিক্রয় ইত্যাদি। ঘরে বসেই মানুষ এখন বিভিন্ন সেবার যেমন- গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদির বিল পরিশোধ করতে পারে। এগুলো সম্ভব হয়েছে মোবাইল ব্যংকিং এর কারনে। এছাড়া সম্প্রতি মোবাইল ব্যংকিং এর মাধ্যমে টাকা পাঠানো জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সব শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে। বিভিন্ন শপিংমলে এখন ইলেকট্রনিকালি বিল পরিশোধের ব্যবস্থা আছে। সুপারমার্কেটগুলোতে কার্ড পেমেন্টের ব্যবস্থা থাকায় ক্রেতারা অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে বাজার করতে পারেন। উন্নত বিশ্বে মানুষ ঘরে বসেই তাদের নিত্য দিনের বাজার করছে অনায়াসে। ইবে, আমাজন ছাড়াও অনেক প্লাটফর্ম আছে যারা এই সুবিধা গুল প্রদান করে থাকে। আমাদের দেশে অনলাইনে কেনাবেচার জন্য বর্তমানে অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে যেমন: বিপনি, ইবিপনন, আইফেরি, রকমারী, প্রিয়শপ, লামুদি, ক্লিকবিডি, এখনি, উপহারবিডি, কারমুদি, গিফটবিডি, সামগ্রি, বিডিহাট, ইত্যাদি। এই ওয়েবসাইটগুলো থেকে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা উপহার সামগ্রী ঘরে বসেই ক্রয় করতে পারে।

উপরে যেসব ওয়েবসাইট গুলো উল্লেখ করা হয়েছে এগুলোর বাইরেও অনেক ওয়েবসাইট আছে যেগুলো একই সুবিধা প্রদান করে থাকে। তবে তুলনামূলক ভাবে এই সেক্টরটি এখনো বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। আমাদের দেশের ব্যংকিং ব্যবস্থা এখনো আশানুরূপ ভাবে নিরাপদ না। অনেক ব্যংক এখনো অনলাইন ব্যবস্থা চালু করতে পারেনি। সাধারণ মানুষের মাঝে কার্ড ব্যবহারের প্রচলন ও কম। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় যে, অনলাইনে কেনাকাটা যেমন সুবিধাজনক, এর কিছু খারাপ দিক ও আছে। অনেক ক্ষেত্রে পণ্যের গুনাগুণ ঠিক থাকেনা, আবার গ্রাহকের প্রতারিত হওয়ার আশংকাও থাকে। তবে আশার কথা এই যে, নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্বেও অনলাইন কেনাকাটা বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। মোবাইল ইন্টারনেট এবং ওয়াই ফাই ইন্টারনেটের প্রসারের কারনে সর্বসাধারণের হাতের নাগালে ইন্টারনেট পৌঁছেছে। এখন প্রয়োজন মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি এবং বিক্রিত দ্রব্যাদির মান নিশ্চিতকরণ। এটা যদি খুব দ্রুত করা সম্ভব হয় তাহলে ইকমার্সের দুই সেক্টর খুব দ্রুত বিকাশ লাভ করবে বলে- আশা করা যায়।

(ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)

*******নিরাপদ পৃথিবীর জন্য ‘‘থ্রি জিরো থিওরি’’ বা তিন শুণ্য তত্ব**********:

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ‘বর্তমান পৃথিবীকে নিরাপদ করতে হলে আমাদের ‘‘তিন শূন্য থিওরি’’ বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই পৃথিবীকে নিরাপদ করতে তিন শূন্য চাই।’

বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘সোশ্যাল বিজনেস ডে’ উপলক্ষে এক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

ডইউনূস বলেন ., পৃথিবীকে নিরাপদ করতে হলে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় বাস্তবায়ন করতে হবে। এগুলো হল-

১। দারিদ্র্যতা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে হবে।

২। বেকারত্ব শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে হবে।

৩। কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে হবে।

এ তিনটি বিষয় বাস্তবায়ন করা গেলে পৃথিবীকে নিরাপদ করা যাবে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

কিভাবে এটি বাস্তবায়ন করা যাবে তার পথও তিনি বাৎলে দিয়েছেন। সেগুলো হল:

১। তরুন সমাজের সৃজনশীলতা ও উদ্যমকে কাজে লাগানো

২। প্রযুক্তির ক্ষমতাকে ব্যবহার

৩। ব্যবসায়কে সামাজিক ব্যবসায়ে রুপান্তর করা

৪। সুশাসন নিশ্চিত করা

তিনি আরও বলেন, ‘পৃথিবীতে মোট সম্পদের ৫০ ভাগ মাত্র ৮৫ জন লোকের হাতে রয়েছে। অবশিষ্ট ৫০ ভাগ সম্পদের মালিক বাকি জনগণ। তাই সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে হলে বেশি বেশি উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে। এ জন্য বিশ্বব্যাপী সামাজিক ব্যবসার যে ধারণা সেটি ছড়িয়ে দিতে হবে।’

নোবেল বিজয়ী এ অর্থনীতিবিদ বলেন, ‘উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য মানুষের জন্ম হয়েছে। অথচ তরুণদের ভুল পথে পরিচালিত করা হচ্ছে। পড়াশোনা শেষে তারা চাকরির পেছনে ছুটছে। চাকরি না পেলে তারা বেকার হয়ে বসে আছে। তরুণদের রয়েছে অপরিসীম সম্ভাবনা। তাদের আমরা সেই সম্ভাবনার পথ দেখাতে চাই। উদ্যোক্তারা ব্যবসার ধারণা দেবে। আমরা তাদের পুঁজি দিয়ে তার ব্যবসার অংশীদার হতে চাই। এটিই সামাজিক ব্যবসার ধারণা।’

অধ্যাপক ড. ইউনূস বলেন, ‘আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। লক্ষ্য নির্ধারণ করলে স্বপ্ন বাস্তবায়ন সহজ হয়। স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের তরুণ সমাজ, প্রযুক্তি, সুশাসন ও সামাজিক ব্যবসা নিশ্চিত করতে হবে।’

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা বলেন, বর্তমানে প্রতিদিন পৃথিবীতে জনসংখ্যা বাড়ছে। যারা পৃথিবীতে আসছে তাদের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব। আমরা শুধু প্রবৃদ্ধি চাই না, প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন চাই। তরুণ উদ্যোক্তাদের হাত ধরে আমরা পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে চাই। এ কারণে আমাদের শ্লোগান –‘আমরা চাকরিপ্রার্থী নই, চাকরিদাতা হতে চাই।’

অনুবাদ ও সংযোজনইন্টারনেট ও ডেইলি স্টার :

The theory of 'Three Zeros'
Mahfuz Anam

We are all familiar with the mathematical formulation that 0+0+0= 0. Well, not so, says Prof Yunus.

He says 0+0+0= 100, 1000, 100,000, 1 million, take your pick.

Has our venerable professor of economics, the famous founder of the one of its kind Grameen Bank, the recipient of Nobel Peace Prize, the initiator of Social Business movement that is now knocking at the door of most of the Fortune 500 companies suddenly turned into a mathematician?

Not really. He spoke of his “Three Zeros” formulation yesterday to a packed house of 1,600 guests with 250 delegates from 30 countries, on the occasion of the 6th Social Business Day at the BICC.

He elaborated how a “Three Zeros” action plan will save the world for our future generation. His ideas, as always, are simple. He said that the world must adopt a policy of:

a) zero poverty;

b) zero unemployment; and,

c) zero carbon emission.

Only then would the world have a sustainable development. Any other plan will not be sustainable.

To achieve his “Three Zeros” plan, he said, we needed four things:

1. Harness the energy and creativity of the youth;

2. Use the power of technology;

3. Transform business into Social Business; and,

4. Ensure good governance.

He believes that there is practically nothing that the young cannot achieve. Their “can do” spirit is the biggest asset for the world especially for Bangladesh. The youth will have to be energised, given freedom of action, sufficient support and guidance and they will do the rest. We must believe in our youth, he kept on emphasising.

About technology, he said that the world is changing at an unbelievable rate and all of it is coming from technological innovation. But this technology is in the hands of the rich who are using it to further enrich themselves.

But if the same technology is used to solve the problems of the world -- poverty, unemployment, environmental degradation, population management, etc., then the world will become transformed. The immediate task should be to use the magnificent innovations of science and technology to trigger “sustainable growth” and not to increase rich-poor gap and all sorts of discrimination.

Social Business is the real business, the rest are a distortion. His view that a business only based on avarice, greed, acquisitive instinct, self interest, etc. is only half the story. There is a far better and glorious “other half” story that remains totally ignored and untold in the present day capitalist narrative of human nature.

Human beings are much more complex and “bigger”, and filled with many other qualities such as love, empathy, fellow feeling, idealism, nobility and capacity for sacrifice. Present day capitalism has successfully produced enormous wealth for which it must be appreciated. But in the process, and by concentrating only on greed related aspects of human nature, our civilisation has perverted the “core human person”.

While producing wealth on the basis of “personal interest” alone and delinking him or her from the fundamental fact that “a human being is a social animal” with a conscious or subconscious desire to produce “social good”, the present capitalistic production system has negatively impacted the human psyche making him or her detached from natural instincts and feelings.

Finally, it is good governance that brings all the above together. Everything that has been said above can be achieved only if a society is based on the rule of law, democracy, fundamental rights, gender equality, accountable and transparent governance process. It is only in an environment of good governance that Social Business can thrive.

It is perhaps a bit audacious on my part to comment that Prof Yunus' ideas have come a long way. While his microfinance sharply focused on the issues of poverty, especially that of women, his ideas of Social Business encompass the whole society -- rich and poor, man and woman, big and small, black or white, developed or developing, etc. So, while microfinance was a development issue, Social Business is a “civilisational” issue. It asks the crucial question whether our civilisation -- as it now operates, produces, consumes, allocates resources, makes laws, dispenses justice, discriminates between the rich and the poor, allows poverty and unemployment to exist, and, most crucially, as it now recklessly and unthinkingly exploits nature -- is sustainable?

“The answer my friend is blowing in the wind”.

On a lighter note, the 6th Social Business Summit began with a message from Sharon Stone, yes, the world famous film actress, sending her love and best wishes to Prof Yunus, his team and all those involved in Social Business. Bill

Clinton, the one and only, in a video message on the occasion of Social Business Day, which also coincides with Prof Yunus' birthday, said of him “your life is a gift to humanity” and wished him many more years of dedicated service to change the world and make it a better place.

But the most enjoyable video greetings came from a Chinese village where housewives remembered Yunus' visit last year and said “Please come again with more ideas to help us, as we are still following what you said the last time”. However what won everybody's heart in yesterday's gathering and led to spontaneous applause was Chinese kids asking Yunus, “Grand pa, when will you come again”.

টীকা লিখুন: যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচন-২০১৫

সব জনমত জরিপ ও বিশ্লেষণকে ভুল প্রমাণ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি। ৭ মে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচন ছিল যুক্তরাজ্যের ৫৬তম সাধারণ নির্বাচন। পার্লামেন্টের ৬৫০ আসনের মধ্যে সরকার গঠন করতে প্রয়োজন ৩২৬ আসন। ৮ মে প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীল কনজারভেটিভ পেয়েছে ৩৩১, বিরোধী লেবার পার্টি পেয়েছে ২৩২ আসন। ব্যর্থতার দায় নিয়ে দলীয় প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন লেবার নেতা এড মিলিব্যান্ড, লিবারেল ডেমোক্রেটিক নেতা নিক ক্লেগ এবং ইউকে ইনডিপেনডেন্স দলের নেতা নাইজেল ফারাজ।

বিগত পার্লামেন্টে ২৫৮ জন এমপি ছিলেন লেবার পার্টির। এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩২ জনে। অন্যদিকে গত পাঁচ বছর কনজারভেটিভ দলের সঙ্গে জোট বেঁধে ক্ষমতায় থাকা উদারপন্থী লিবডেমের অবস্থা আরো খারাপ। গত নির্বাচনে তারা জিতেছিল ৫৬ আসনে। এবার সেই সংখ্যা কমে হয়েছে মাত্র আট। অন্যদিকে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে এসএনপি। স্কটল্যান্ডের ৫৯টি আসনের মধ্যে গতবার দলটি পেয়েছিল মাত্র ছয়টি। এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬। বাকি তিন আসন ভাগ করে নিয়েছে স্কটল্যান্ডের অন্য তিন দল। নির্বাচনের আগের রাতে সর্বশেষ জরিপেও আভাস দেওয়া হয়েছিল, লেবার ও কনজারভেটিভরা ২৭৩টি করে আসন জিতবে। সুতরাং জোট সরকার অনিবার্য। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্লেষকদের একাংশের আশঙ্কা, ইংলিশ জাতীয়তাবাদঘেঁষা কনজারভেটিভ দলের এককভাবে সরকার গঠন, অন্যদিকে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতাকামী এসএনপির আধিপত্য যুক্তরাজ্যের অখণ্ডতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে।

এমপি হলেন তিন বাঙালি কন্যা : যুক্তরাজ্যে সাধারণ নির্বাচনে প্রধান তিনটি দল থেকে মোট ১১ জন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থী এবার এমপি পদে লড়েছেন। তাঁদের মধ্যে লেবার দল থেকে সাতজন, লিবারেল ডেমোক্র্যাটস থেকে তিনজন ও কনজারভেটিভ থেকে একজন মনোনয়ন পেয়েছিলেন। ৮ মে প্রকাশিত ভোটের চূড়ান্ত ফলাফলে জানা গেছে, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রুশনারা আলী, টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক ও রূপা আশা হক-এই তিনজন লেবার দলের হয়ে লড়ে জয়ী হয়েছেন।

রুশনারা আলী : পূর্ব লন্ডনের 'বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো' আসনে লেবার পার্টির প্রার্থী রুশনারা বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। ৩২ হাজার ৩৮৭ ভোট পেয়েছেন তিনি। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থী ম্যাথিও স্মিথ পেয়েছেন আট হাজার ৭০ ভোট। ১৯৭৫ সালে সিলেটের বিশ্বনাথে জন্ম নেওয়া রুশনারা প্রথমবার যুক্তরাজ্যের এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন ২০১০ সালে।

টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক : লন্ডনের সবচেয়ে আলোচিত হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন আসনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি লেবার পার্টির প্রার্থী টিউলিপ প্রথমবারের মতো জয়ী হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানার মেয়ে। টিউলিপ পেয়েছেন ২৩ হাজার ৯৭৭ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থী সায়মন মার্কাস পেয়েছেন ২২ হাজার ৮৩৯ ভোট। লন্ডনের মিচামে জন্ম নেওয়া টিউলিপ কিংস কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০১০ সালে স্থানীয় ক্যামডেন কাউন্সিলে প্রথম বাঙালি নারী কাউন্সিলর নির্বাচিত হন তিনি।

রুপা আশা হক : লন্ডনের অন্যতম আলোচিত ইলিং সেন্ট্রাল অ্যান্ড অ্যাকটন আসনে লেবার পার্টির প্রার্থী রুপা হক ২২ হাজার দুই ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থী এঞ্জি ব্রে পেয়েছেন ২১ হাজার ৭২৮ ভোট। ১৯৭২ সালে লন্ডনের ইলিংয়ে জন্ম নেওয়া কিংস্টন ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক রুপা হক। তিনি পাবনার মেয়ে।

২০ বছর বয়সে সংসদ সদস্য : যুক্তরাজ্যের সাড়ে তিন শ বছরের ইতিহাসে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতি বিভাগের ছাত্রী এমহায়রি ব্ল্যাক মাত্র ২০ বছর বয়সে পার্লামেন্ট সদস্য (এমপি) নির্বাচিত হলেন। স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির (এসএনপি) এই তরুণ নেতার জন্ম ১৯৯৪ সালে।

বাংলাদেশ বিষয়াবলী

টীকা লিখুন: বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট
উত্তরে সহায়ক
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ২০১৭ সালের ডিসেম্বরেই উৎক্ষপণ করতে চায় সরকার। আর এ লক্ষ্যেই ৮ জানুয়ারি, ২০১৫ অরবিটাল স্লট (১১৯ দশমিক ১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) লিজ সংগ্রহের জন্য একটি চুক্তি করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। ইন্টারস্পুটনিক ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব স্পেস কমিউনিকেশনের সঙ্গে এই চুক্তি হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে বিটিআরসি সম্মেলন কক্ষে এ চুক্তি হয়। বিটিআরসির কমিশনার ও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক এ টি এম মনিরুল আলম এবং ইন্টারস্পুটনিক ইন্টারন্যাশনালের মহাপরিচালক ভাদাম ই বেলোভ নিজ-নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিটিআরসির চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, রাশিয়া-ভিত্তিক মহাকাশ যোগাযোগ বিষয়ক আন্তর্জাতিক এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে প্রথম কাজটি শেষ হলো। এখন শুরু হবে এর মূল কর্মযজ্ঞ। সব কাজ শেষে ২০১৭ সালের মধ্যে স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু-১' কক্ষপথে পাঠানো সম্ভব হবে। স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করতে খরচ হবে ২ হাজার ৯৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার দেবে ১ হাজার ৩১৫ কোটি টাকা। বাকি ১ হাজার ৬৫২ কোটি টাকা দেবে যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ পাবে তারা। এর আগে গত ৩১ জানুয়ারি ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি দুই কোটি ৮০ লাখ ডলার ব্যয়ে স্লট বরাদ্দ নেয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। সুনীল কান্তি বোস বলেন, স্যাটেলাইটটি কক্ষপথে স্থাপন করা হলে আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। বিশ্বের সব উন্নত ও আধুনিক দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ আছে। বাংলাদেশের স্যাটেলাইট স্থাপন হলে নিজেদের ভাড়া যেমন বাঁচবে তেমনি ভুটান,

নেপালসহ কয়েকটি দেশের কাছে ভাড়া দেয়া যাবে। প্রস্তাবিত স্যাটেলাইটের ৪০টি ট্রান্সপন্ডার ক্যাপাসিটি থাকবে। এর মধ্যে ২০টি ট্রান্সপন্ডার বাংলাদেশ নিজেরা ব্যবহারের জন্য রেখে দেবে। বাকি ২০টি বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হবে।
সুনীল কান্তি বোস বলেন, বর্তমানে বিদেশি স্যাটেলাইটের ফ্রিকোয়েন্সি ভাড়া নিয়ে টেলিভিশন চ্যানেল, টেলিফোন, রেডিওসহ অন্যান্য যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। এতে প্রতিবছর ভাড়া বাবদ বাংলাদেশকে কয়েক মিলিয়ন ডলার গুনতে হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট চালু করতে পারলে দেশে শুধু বৈদেশিক মুদ্রারই সাশ্রয়ই হবে না, স্যাটেলাইটের অব্যবহৃত অংশ নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমারের মতো দেশে ভাড়া দিয়ে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ ডলার আয় করা যাবে। এ ছাড়া, দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাবে।
জানা গেছে, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নে (আইটিইউ) বাংলাদেশের নিজস্ব অরবিটাল পজিশন ১০২ ডিগ্রি স্লট পাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। কারণ, এ স্লট দেয়ার কর্তৃপক্ষ হচ্ছে আইটিইউ। বাংলাদেশের স্যাটেলাইট ১০২ ডিগ্রিতে উৎক্ষপণ করা হলে ফ্রিকোয়েন্সি পেতে সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে আপত্তি জানায় যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়াসহ এশিয়া মহাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ। ১০২ ডিগ্রিতে স্যাটেলাইট উৎক্ষপণের অনুমোদন না পেয়ে, বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয় ৬৯ ডিগ্রি পূর্বে। তবে এতে একই কারণ দেখিয়ে আপত্তি জানায় মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও চীন। আইটিইউ বাংলাদেশকে নিরক্ষ রেখার ১০২ ডিগ্রির পরিবর্তে ১১৯ দশমিক ১ ডিগ্রিতে (পূর্ব) স্লট বরাদ্দ করার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছে।
প্রসঙ্গত, বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৬০টির মতো দেশের নিজস্ব উপগ্রহ রয়েছে। আর দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে ভারত (১৯৭৫), পাকিস্তান (১৯৯০) ও শ্রীলঙ্কার (২০১২) নিজস্ব স্যাটেলাইট রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ
টীকা লিখুন:'সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী'-২০১৬
উত্তরে সহায়ক কিছু তথ্য

'সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী' হবে কোন শহর
বগুড়া, কুষ্টিয়া, না কুমিল্লা?

এক বছরের জন্য বাংলাদেশের কোন শহর 'সার্কের সংস্কৃতি রাজধানী' হবে- এ নিয়ে শুরু হয়েছে নানামুখী তৎপরতা। সরকারি পর্যায়ে বিবেচনায় আছে তিনটি শহর- বগুড়া, কুষ্টিয়া ও কুমিল্লা।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সার্ক কালচারাল সেন্টার (শ্রীলঙ্কা) ২০১৬ সালের জন্য বাংলাদেশের একটি শহরকে 'সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী' ঘোষণা করবে। সেই শহরকে ঘিরে আয়োজন করা হবে বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠান। এতে যোগ দেবেন সার্কভুক্ত দেশগুলোর শিল্পী, সাহিত্যিক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীরা।

চলতি বছর থেকে শুরু হয়েছে 'সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী' ঘোষণার আয়োজন। প্রথমবার 'সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী' ঘোষণা করা হয়েছে আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক নগরী বামিয়ানকে। পর্যায়ক্রমে সার্কের অন্য দেশেও একটি শহরকে এ মর্যাদা দেওয়া হবে। এই আয়োজনে রাজধানীর বাইরের কোনো শহরকেই বেছে নেওয়া রীতি রয়েছে।

আগামী বছর বাংলাদেশের কোন শহর হবে 'সার্কের সংস্কৃতি রাজধানী' এ নিয়ে কাজ শুরু করেছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি ওয়ার্কিং কমিটিও গঠন করা হয়েছে। গত ৫ মার্চ অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির

প্রথম সভায় সার্ক সংস্কৃতি রাজধানীর জন্য কুষ্টিয়া, বগুড়া ও কুমিল্লাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওই শহরগুলোর ইতিহাস-ঐতিহ্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহবুবা মশকুর এ প্রসঙ্গে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দেশের একটি শহরকে 'সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী' ঘোষণার যে সুযোগ এসেছে তার মাধ্যমে বাংলাদেশের হাজার বছরের শিল্প-সাহিত্য-প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে প্রচার ও প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এই সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি। তিনটি শহরের নাম আলোচনায় এসেছে। এখন নীতিনির্ধারকরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তিন শহরের মধ্যে বগুড়াকে 'সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী' হিসেবে ঘোষণার জন্য নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, "ইতিহাস-ঐতিহ্য ছাড়াও ঢাকা থেকে যাতায়াত, আবাসন, মিলনায়তন, আপ্যায়ন ইত্যাদি বিবেচনায় আমরা বগুড়াকে 'সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী' হিসেবে ঘোষণার জন্য প্রস্তাব করার চিন্তা করছি।"

বগুড়াকে বিবেচনায় নেওয়ার কারণ প্রায় আড়াই হাজার বছরের গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার নিদর্শন মহাস্থানগড়। এ ছাড়া রয়েছে আরো অনেক ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা, যা সব ধর্মের অনুসারীদের কাছে পবিত্র। বগুড়া দইয়ের জন্যও খুব বিখ্যাত। বাংলাদেশের বিখ্যাত অনেক ব্যক্তির জন্মস্থানও বগুড়া।

কুষ্টিয়াকে 'সার্ক সংস্কৃতি রাজধানী' হিসেবে ঘোষণার জোর তৎপরতা চলছে বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এ জন্য ওই এলাকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সামনে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রাচীন ঐতিহ্য, সুর-সংগীত, সাহিত্য-সংস্কৃতির এক পীঠস্থান কুষ্টিয়া। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিধন্য কুঠিবাড়ি, বাউলসম্রাট ফকির লালন শাহর আখড়াবাড়ি, বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক, সাংবাদিক, বাউলসংগীতের অন্যতম পথিকৃৎ কাঙ্গাল হরিনাথ, বাউলশিল্পী গগন হরকরা, মুক্তচিন্তার সাধক ড. কাজী মোতাহার হোসেন, সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন, অবিভক্ত ভারতের প্রধান বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. রাধা বিনোদ পাল, ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী বাঘা যতীনসহ অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের স্মৃতি বহন করে চলেছে এ অঞ্চল। পার্শ্ববর্তী মেহেরপুরের মুজিবনগরে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজধানী ও মুজিবনগর সরকারের স্মৃতিস্মারক। এ ছাড়া রয়েছে এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ বস্ত্রকল কুষ্টিয়া মোহিনী মিল, টেক্সটাইল মিল, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাপড় হাট।

কুমিল্লারও রয়েছে সুপ্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য। শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পাদপীঠ কুমিল্লা। ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম তীর্থভূমি ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও জাদুঘর, লালমাই বৌদ্ধ বিহার, শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, লালমাই পাহাড়, ময়নামতি পাহাড়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শহীদদের সমাধি প্রভৃতি। প্রাচীন সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে খাদিশিল্প, তাঁতশিল্প, কুটির শিল্প, মৃৎ ও কারুশিল্প, রসমালাই, মিষ্টি, ময়নামতির শীতল পাটি ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী

যুক্তরাষ্ট্র- জাপান গভীর সম্পর্কের কারণ
চীনা প্রভাব মোকাবিলায় মতৈক্য যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে

চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের মুখে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে একমত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। নতুন নতুন হুমকি মোকাবিলায় যৌথ সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির ওপরেও জোর দিয়েছেন দুই নেতা। আবের ওয়াশিংটন সফরকালে দুই দেশের মধ্যে এ-সংক্রান্ত একটি চুক্তি হয়েছে। খবর এএফপি ও রয়টার্সের।
গতকাল বুধবার মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষের এক যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার কথা আবের। তিনিই প্রথম জাপানি প্রধানমন্ত্রী, যিনি সেখানে ভাষণ দেবেন।

দক্ষিণ ও পূর্ব চীন সাগরে চীনের সাম্প্রতিক তৎপরতায় উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান উভয়ই। ওয়াশিংটনে দুই নেতার বক্তব্যে ফুটে উঠল তারই চিত্র। সাগর দুটির বিরোধপূর্ণ জলসীমার ভেতরে নতুন দ্বীপ বানানো এবং বিরোধপূর্ণ কিছু এলাকাকে নিজেদের বলে দাবি করার মাধ্যমে চীন 'তাদের পেশি সম্প্রসারিত করছে' বলে অভিযোগ করলেন প্রেসিডেন্ট ওবামা। তিনি বলেন, 'সমুদ্র এলাকায় চীনের তৎপরতা নিয়ে বেশ কিছু প্রকৃত উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।' ওবামা জোর দিয়ে বললেন, জাপানের প্রতিরক্ষার প্রতি যুক্তরাষ্ট্র 'সত্যিকার অর্থে' প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জসহ জাপানের অধীনে থাকা সব ভূখণ্ড' এই প্রতিশ্রুতির আওতাভুক্ত।
পূর্ব চীন সাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জটি জাপানিদের কাছে 'সেনকাকু' হলেও এটি চীনাদের কাছে 'দিয়াওউ' নামে পরিচিত। এর পূর্ণ মালিকানা দাবি করে থাকে বেইজিং। আবের সফরকালে দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির ফলে এই প্রথম জাপান বিরোধপূর্ণ এসব দ্বীপের ব্যাপারে মার্কিন প্রতিরক্ষা নিশ্চয়তা পাবে।
আবের ওয়াশিংটন সফরকালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা হয়েছে। তিনি ও ওবামা একটি আন্তপ্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্যিক চুক্তি এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। এই চুক্তি হবে ১২টি দেশের মধ্যে, যারা বিশ্বের ৪০ শতাংশ অর্থনীতিকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। চীনকে বাইরে রেখে এই চুক্তি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন
অর্থনীতিতে তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ

রাজনৈতিক অস্থিরতা, কাঠামোগত দুর্বলতা ও আন্তর্জাতিক ভঙ্গুরতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে টেকসই প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে। তবে এ মুহূর্তে অর্থনীতিতে তিনটি বৃহৎ চ্যালেঞ্জ দেখছে আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাংক। এগুলো হলো—
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা,
বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং
শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট' প্রতিবেদনে এভাবেই দেশের অর্থনীতিকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। গতকাল রোববার এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে সংস্থাটি। এ উপলক্ষে সংস্থার ঢাকা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে আয়োজন করা হয়।
প্রতিবেদনে মূল্যস্ফীতি, রাজস্ব পরিস্থিতি, রপ্তানি, বহিঃখাতের ভারসাম্য, সুদের হার, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), বাজেট ঘাটতিসহ বিভিন্ন খাতের মূল্যায়ন করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ছয় শতাংশের ঘরে আটকে গেছে। এর কারণ, কর্মক্ষম উচ্চ জনসংখ্যা বা জনসংখ্যা বোনাসের যথাযথ সুবিধা নিতে পারছে না বাংলাদেশ। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ৩৩ দশমিক ৭ শতাংশ। এটি জাপানের সমান হলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি দশমিক ৭ শতাংশ পয়েন্ট বাড়ত। আর থাইল্যান্ডের সমান হলে ১ দশমিক ৬ শতাংশ পয়েন্ট বাড়ত।
সংবাদ সম্মেলনে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, মধ্য আয়ের দেশ হতে বাংলাদেশ কিছুটা স্বস্তির জায়গায় আছে। তবে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বিনিয়োগের অনুপাত ৩৩-৩৪ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। এ ছাড়া শ্রমঘন উৎপাদনশীলতার দিকে বেশি মনোযোগী হতে হবে। বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থানের দিকে জোর দিতে হবে। এখনো কর্মসংস্থানের দিক থেকে পুরুষেরা অনেক এগিয়ে আছে।
মূল্যস্ফীতি: বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১২ মাসে (২০১৪ সালের মার্চ থেকে ২০১৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত) মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৭ শতাংশ থেকে কমে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ হয়েছে। এটি অর্থনীতির ভালো দিক। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যমূল্যের দাম কমে যাওয়ায় খাদ্য উপখাতে মূল্যস্ফীতি কমেছে। আর বিনিময় হার ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনার কারণে খাদ্যবহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে আছে।
বহিঃখাত ভারসাম্য ও রপ্তানি: প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জুলাই-ফেব্রুয়ারি মাসের হিসাবে গত অর্থবছরের তুলনায় এই অর্থবছরে চলতি হিসাবে ১০ হাজার ৮০০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত রয়েছে। গত অর্থবছরে একই সময়ে ১০ হাজার ৯০০ কোটি টাকার ঘাটতি ছিল। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মার্চ মাসে এসে দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার কোটি টাকা।
তৈরি পোশাক রপ্তানি সম্পর্কে জাহিদ হোসেন বলেন, যে রপ্তানিকারকেরা ইউরোপের বাজারে ডলারে ব্যবসা করেন, তাঁরা দাম কম পাচ্ছেন। কারণ ডলারের বিপরীতে টাকার দাম এক বছরে সাড়ে ১৭ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এটি রপ্তানিকারকদের জন্য একটি বড়

চ্যালেঞ্জ।
সুদের হার: বাংলাদেশে সুদের হার অস্বাভাবিক রকমের বেশি নয় বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংক বলছে, সুদের হার কমেছে, তাও নয়। তবে বাজারে যে পরিমাণ তারল্য রয়েছে, সে অনুযায়ী সুদের হার কমেনি। এ ছাড়া পরিচালন ব্যয় বিশেষ করে গ্রামে ব্যাংকের শাখা স্থাপন করলে, তুলনামূলক কম বিনিয়োগ ফিরে আসে। এটাও সুদের হার না কমার অন্যতম কারণ। সুদের হার কমাতে বিশ্বব্যাংক তিনটি সুপারিশ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে মূল্যস্ফীতি কমানো, খেলাপি ঋণে কমাতে তদারকি বাড়ানো এবং বাজারভিত্তিক সঞ্চয়পত্রের সুদের হার নির্ধারণ করা।
বড় অঙ্কের ঋণ পুনর্গঠন সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের মত হলো, তাহলে ছোট ঋণ কেন পুনর্গঠন করা হবে না?
রাজস্ব পরিস্থিতি: প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি মাসে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি ১২ দশমিক ৯ শতাংশ। তবে করবহির্ভূত রাজস্ব আদায় আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩৫ শতাংশ কম হয়েছে। করপোরেট কর হার কমানো, সম্পূরক শুল্ক হার হ্রাস, তৈরি পোশাক খাত ও বেশ কিছু রপ্তানি খাতকে কর ছাড় দেওয়ায় এবার রাজস্ব আদায়ে কিছুটা শ্লথগতি রয়েছে।
এ ছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতায় কর আদায় বিঘ্নিত হয়েছে বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক। আবার ২০১৬ সালের জুলাই মাস থেকে নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন বাস্তবায়ন করা হলে কর ও জিডিপি অনুপাত ১০ থেকে সাড়ে ১০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক। বর্তমানে কর ও জিডিপি অনুপাত মাত্র সাড়ে ৮ শতাংশ।
আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমে যাওয়া সম্পর্কে জাহিদ হোসেন বলেন, ১৯৯৭ সালের পর গত অক্টোবর মাসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) লাভের মুখ দেখেছে। এটি বাজেট ঘাটতি কমাতে সহায়তা করছে।

তথ্যসুত্র: প্রথম আলো ,এপ্রিল ১৩, ২০১৫

৩৫তম বিসিএস প্রস্তুতি
বাংলাদেশ বিষয়াবলী
বিদ্যুৎ খাত
বড় অর্জন, টার্গেট আরও বড়
বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা কত_ সে হিসাব রাখা এমনকি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের জন্যও কঠিন হয়ে পড়েছে। মাত্র এক যুগ আগেও হাতেগোনা কয়েকটি সরকারি প্রকল্পের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল বিদ্যুৎ খাত। লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ ছিল জনসাধারণ। শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যোক্তারা অপরিহার্য এ জ্বালানির অভাবে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ায় ভরসা পেতেন না। এমনকি অনেক চালু প্রতিষ্ঠানও বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ রাখতে হতো। এখন প্রকৃতই বিদ্যুৎ খাত বদলে দিচ্ছে বাংলাদেশকে। রোববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চারটি নতুন বিদ্যুৎ প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন। এর ফলে মোট উৎপাদন প্রকল্প দাঁড়িয়েছে ৯২টি, বছর খানেকের মধ্যেই এ সংখ্যা সেঞ্চুরি করবে_ এমনটিই জানাচ্ছে মন্ত্রণালয়। নতুন চারটি প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে নাটোর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও ঘোড়াশালে। ফলে মোট উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ২৬৫ মেগাওয়াট। উৎপাদন ক্ষমতা সংক্রান্ত এ তথ্য উৎসাহব্যঞ্জক। তবে যে বেঞ্চমার্ক থেকে বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশ পেঁৗছেছে, সেটা আরও বেশি চমকপ্রদ_ শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে ১০ হাজার মেগাওয়াটেরও বেশি। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর জোট ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে পরের পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার সময়ে বিদ্যুৎ খাতকে আদৌ গুরুত্ব প্রদান করেনি। তত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরেও এ খাতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো রয়ে যায় হিমাগারে। এ অবস্থায় শেখ হাসিনার সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষমতার কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচি হাতে নিতে বাধ্য হয়। অর্থনীতির সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশে এ উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। কিন্তু অনেক সময় বৃহত্তর স্বার্থে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে, যার কঠোর সমালোচনা পর্যন্ত হতে পারে; কিন্তু বিকল্প থাকে না। তবে এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় অবশ্যই সর্বোচ্চ বিবেচনায় থাকা চাই_ স্বচ্ছতা। জনস্বার্থের যে কোনো পদক্ষেপ প্রশংসা পাবে; কিন্তু এর প্রক্রিয়ায় বিশেষ প্রতিষ্ঠান সুবিধা পেলে সেটা প্রশ্নবিদ্ধ হবেই। এখন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কয়েকটি বড় বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। রামপালে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত হচ্ছে ১৩২০ মেগাওয়াটের প্রকল্প। রূপপুরে নির্মিত হবে এক হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আরও ৬০০ মেগাওয়াট আমদানির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো হবে এবং বিশেষভাবে কৃষি জমিতে সেচের জন্য এর ব্যবহারের উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এখন দেশের ৭০ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। সামনে টার্গেট_ শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান। এ লক্ষ্য এখন আর স্বপ্নবিলাস নয়। সরকারের সময়োপযোগী ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত এর পেছনে কাজ করছে, এটা সবাই স্বীকার করে নিচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার বড় লক্ষ্য অর্জনের ধারা বজায় থাকবে, এটাই আমাদের বিশ্বাস। একই সঙ্গে একটি জরুরি তাগিদের পুনরুক্তি_ নতুন ও পুরনো প্রতিটি প্রকল্পেই উৎপাদন ও বিতরণ ব্যয় যতটা সম্ভব কমিয়ে রাখা চাই। ব্যয় বাড়লে স্বাভাবিক নিয়মেই এর

দায় চাপে ভোক্তাদের ওপর। তাতে ঘরে ঘরে বাজেটে চাপ বাড়ে, অর্থনীতির উদ্যোক্তাদের জন্যও শঙ্কা সৃষ্টি হয়_ যা চূড়ান্ত পর্যায়ে সরকারের বড় সাফল্যকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলতে পারে। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধকে আমরা খুবই যৌক্তিক মনে করি। এ অর্জনের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং আগামীতে তা আরও বাড়বে। এ ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সুবিধা, সরকারের ব্যয়ের বোঝাও লাঘব হয়।

তথ্যসুত্র: কালের কন্ঠ, ৫মে ২০১৫

৩৫তম বিসিএস প্রস্তুতি
পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন
পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার জন্য কোম্পানি হচ্ছে

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আইন ২০১৫-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে সরকার। এ আইনের আওতায় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য ভেটিং সাপেক্ষে 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার কোম্পানি অব বাংলাদেশ' গঠনের প্রস্তাবও চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সভা শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।
আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, এ ধরনের উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন এবং নিরাপত্তাসংবলিত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য আলাদা কোম্পানি গঠন করতে হয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আইনের খসড়ায়ও এ ধরনের কোম্পানি করার কথা বলা হয়েছে।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, পাবনার ঈশ্বরদীতে ২০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকানা থাকবে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের হাতে। আর কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার কোম্পানি অব বাংলাদেশ'-এর হাতে। প্রকল্পের যিনি শেষ পরিচালক থাকবেন, তিনি হবেন নতুন কোম্পানির প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এই কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দুই বছর ধরে প্রকল্প এলাকায় সমীক্ষা চলবে; যার এক বছর ইতিমধ্যে পার হয়েছে। এ সমীক্ষা-ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ হাজার ৮৭ কোটি ৮১ লাখ টাকা।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) নীতিমালা মেনেই এ বিদ্যুৎকেন্দ্র হবে। রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করার সময়ই নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। রাশিয়াই পারমাণবিক বর্জ্য নিয়ে যাবে।
আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২০১০ সালে সংসদে প্রস্তাব পাস করা হয়, গঠন করা হয় একটি জাতীয় কমিটি। ওই বছরই রাশিয়ার সঙ্গে একটি কাঠামো চুক্তি করে সরকার এবং ২০১১ সালের নভেম্বরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে দুই দেশ চুক্তি করে।
২০১৩ সালের অক্টোবরে রূপপুরে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দুই ইউনিটে ২০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার এ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট ২০২১ সালের মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করছে সরকার।

তথ্যসুত্র: প্রথমআলো,৫মে,২০১৫

টীকা লিখুন :গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮২০১৩ /

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮ রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতন্ত্র সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সুষ্ঠু ও নিরপে নির্বাচন অপরিহার্য। ইতিপূর্বে নির্বাচনকে ঘিরে বহু দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। তাই এ নির্বাচনকে প্রভাবমুক্ত করতে হলে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ২০০৮- বা ¯তবায়ন জরুরি। গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশবা ২০০৮- ¯তবায়ন হলে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে একনায়কতন্ত্রের অনেকটাই অবসান হবে, তৃণমূলের অংশগ্রহণ বাড়বে, দুর্নীতিবাজদের সুবিধা কমবে। এই অধ্যাদেশের কয়েকটি বিধানের দিকে আলোকপাত করলেই বোঝা যাবে রাজনৈতিক দলগুলো কেন এটিকে গ্রাহ্য

করতে চাইছে না।
অধ্যাদেশ অনুযায়ী,
*** রাজনৈতিক দলগলোর নিবন্ধের জন্য গত যে কোন সংসদে দলগুলোর অংতত একজন সদস্য থাকা বা যে কোন নির্বাচনে দুই শতাংশ উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানায় কার্যক্রম থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
*** দলের গঠনতন্ত্রে দেশের সংবিধান বিরোধী কোন বিধান থাকলে জাতিবর্ণ-ধর্ম- নির্বিশেষে কোন বৈষম্য থাকলে , দলের নাম, প্রতীক কিংবা অন্য কোন কর্মকান্ডে ধর্মীয় সহনশীলতা, ভৌগলিক অখন্ডতা বিনষ্টের আশঙ্কা থাকলে সে দলকে নিবন্ধন দেওয়া যাবে না।
*** রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে ছাত্র, শিক, শ্রমিক,ও পেশাজীবী সংগঠন এবং বিদেশে কোন শাখা বা অঙ্গ সংগঠনের বিধান রাখা যাবে না।
*** রাজনৈতিক দলগুলোকে ২০২০ সালের মধ্যে তাদের সব কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার বিধান রাখতে হবে। দলের ভেতরে কেন্দ্রীয় পর্যায়সহ সব পর্যায়ে নির্বাচিত কমিটি থাকতে হবে। একজন প্রার্থীকে অংতত তিন বছর তার দলের সদস্যপদে থাকতে হবে।
*** সরকারি কর্মচারী, সামরিক বাহিনীর সদস্য ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী অবসর বা পদত্যাগের তিন বছর পর্যংত নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেনা।
*** মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন থেকে আগের ছয় মাসের মধ্যে ঋণখেলাপি থাকলে বা আগের তিন মাস টেলিফোন, বিদ্যুৎ,গ্যাস বা অন্যান্য কোন সেবার েত্র বিল বাকি থাকলে একজন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হবে। এর বাইরেও প্রত্যেকটি বিধানই গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাদেশের বিধানগুলো খতিয়ে দেখলে এর তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের চোখে পড়বে- প্রথমতদলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্র চর্চা প্রতিষ্ঠা-,তৃণমূলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এর ফলে পরিবারতন্ত্রে একাধিপত্য ুন্ন করা। দ্বিতীয়তরাজনৈতিক দলগুলো- প্রাগ্রসর করা (বিশেষরূপে অগ্রসর), নারী ও ুদ্র জাতিসত্তার প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল করা এবং ধর্মের অপব্যবহার করে ভোট পাওয়ার পথ কিছুটা হলেও সংকোচিত করা। তৃতীয়তঋণখেলাপি-, বিলখেলাপিদের নির্বাচনের জন্য অযোগ্য করা। এই তিনটি উদ্দেশ্যের বা তবায়ন দলগুলোর এবং গণতন্ত্রের উপর আরো অনেক ইতি বাচক প্রভাব ফেলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গণপ্রতিনিধিত্ব ২০১৩ -আইন (অধ্যাদেশ)'র চূড়ান্ত খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ফলে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্টএর অধীনে ১৯৭৩- দণ্ডিত ব্যক্তিরা সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষিত হবেন।

ফলে আইসিটিএ্যাক্ট১৯৭৩-'র দণ্ডিত ব্যক্তিরা সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষিত হবেন। এছাড়াও নির্বাচনে প্রার্থীর জামানত ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে এবং একজন প্রার্থীর নির্বাচনী খরচের পরিমাণ ১৫ থেকে ২৫ লাখ টাকা করা হয়েছে। চুড়ান্ত এই খসড়ায় ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুদানের পরিমাণ ১০ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ লাখ টাকা এবং কোনো কোম্পানি বা সংস্থারের অনুদান ২৫ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৫০ লাখ টাকা করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসংবিধান সংশোধন :
টীকা লিখুনসংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী :

১ আগস্ট ২০১৪ মন্ত্রিসভায় সংবিধান ৭বিল অনুমোদিত হওয়ার পর (ষোড়শ সংশোধন) সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংবিধান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন ২০১৪বিল (ষোড়শ সংশোধন) আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক। পরিক্ষানিরীক্ষা - মধ্যে করে সাতদিনের সংসদে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য একইদিনে বিলটি আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়সম্পর্কিত - ও ৯সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। সংসদীয় কমিটি ১০ সেপ্টেম্বর দুটি বৈঠকে এ বিলটির প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে। যাচাইবাছাই- শেষে ১৪ সেপ্টেম্বর কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। এরপর ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক জাতীয় সংসদে বিলটি পাসের জন্য দ্বিতীয়বার উত্থাপন করেন।
বিলটি উত্থাপনের পর তা সর্বসম্মতক্রমে পাস হয়। বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ৩২৭টি; বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি। এর আগে বিলেরদফা ও সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর বিভক্তি ভোট হয়, যা ৩২৮ভোট ০-ে পাস হয়। বিলটি জাতীয় সংসদে পাস হতে সময় লাগে মোট ৩ ঘন্টা ৩১ মিনিট। ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধন বিলে সম্মতি দেন

রাষ্ট্রপতি মোআবদুল হামিদ এডভোকেট। এরপর গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে তা আইনে . পরিণত করা হয়।
সংবিধান ২০১৪আইন (ষোড়শ সংশোধন)
১সংক্ষিপ্ত শি .রোনাম। এই আইন সংবিধান আইন (ষোড়শ সংশোধন), ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।
২অনুচ্ছেদের সংশোধন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৬সংবিধানের . ৯৬ অনুচ্ছেদের দফা (২), (৩(, (৪(, (৫(, (৬(, (৭(, ও পরিবর্তে এর (৮) নিম্নরূপ দফা (২), (৩প্রতিস্থাপিত হইবে (৪) ও (, যথা :
"(২প্রমাণিত (অসদাচরণ বা অসামর্থ্যরে কারণে সংসদের মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন- দুইতৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা - সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না।
(৩এই (অনুচ্ছেদের দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধত (২)ি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।
(৪পদত্যাগ করিতে পারিবেন। কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় ("

বৈশ্বিক মানব পুঁজি সূচক
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ এগিয়ে, অবস্থান ৯৯তম

বৈশ্বিক মানব পুঁজি সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও মিয়ানমারের চেয়ে এগিয়ে আছে। তবে শ্রীলঙ্কা ও ভুটান—এ দুটি প্রতিবেশী দেশের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।
ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের এ (ডব্লিউইএফ)ই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৯তম। আর শ্রীলঙ্কা ৬০, ভুটান ৮৭, ভারত ১০০ ও পাকিস্তান ১১৩তম স্থানে রয়েছে।
ডব্লিউইএফ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তিতে বিশ্বের ১২৪টি দেশের ওপর জরিপ চালিয়ে এই সূচক তৈরি করেছে।
মানব পুঁজি সূচকের প্রথম স্থানে রয়েছে ফিনল্যান্ড। দেশটির স্কোর হচ্ছে ৮৬। ঠিক এর পেছনেই রয়েছে নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, কানাডা ও জাপান। সুইডেন, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশও রয়েছে শীর্ষ দশে।
সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় গত বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে ডব্লিউইএফের বৈশ্বিক মানব পুঁজি সূচকটি প্রকাশ করা হয়।
সূচকটির একটি জায়গায় বাংলাদেশ বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। সেটি হলো, কলা ও মানবিক বিভাগে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক ডিগ্রিধারীর সংখ্যায় বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। বর্তমানে বাংলাদেশে কলা ও মানবিক বিভাগে স্নাতক ডিগ্রিধারীর সংখ্যা ১ লাখ ৯ হাজার ৯৪১ জন।
এ ক্ষেত্রে শীর্ষে আছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে স্নাতক ডিগ্রিধারীর সংখ্যা ৩ লাখ ৯৩ হাজার ৫৩৬ জন। আর জাপান ১ লাখ ৪৪ হাজার ২১৯ জন স্নাতক ডিগ্রিধারী নিয়ে দ্বিতীয় ও যুক্তরাজ্য ১ লাখ ২৫ হাজার ৭৩৮ জন নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।
ডব্লিউইএফ মানব পুঁজি সূচকটি তৈরির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর নীতিনির্ধারকদের মানবসম্পদের দক্ষতা বা সক্ষমতা বৃদ্ধির পরামর্শও দিয়েছে।
সূচকে বাংলাদেশে দক্ষ কর্মীর দুষ্প্রাপ্যতা ও সক্ষমতার অভাব রয়েছে বলে উল্লেখ করেছে ডব্লিউইএফ। সেই সঙ্গে মেধাবীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগ প্রদানের পরামর্শ দিয়েছে। ১০০৫৭এর মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর হচ্ছে - দশমিক ৬২।
সংবাদ সম্মেলনে সূচকটি প্রকাশকালে ডব্লিউইএফের নির্বাহী চেয়ারম্যান ক্লস শোয়াব বলেন, 'একুশ শতকে উদ্ভাবন, প্রতিযোগিতাশীলতা ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য পুঁজি নয়, মেধাই হলো মূল নিয়ামক।'
ভারত ছাড়া ব্রিকস জোটের অন্য দেশগুলোর চেয়ে সূচকে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা—এই পাঁচটি দেশের আদ্যক্ষর নিয়ে ব্রিকস জোটের নামকরণ করা হয়। জোটের সদস্যদের মধ্যে ব্রাজিল ৭৮, রাশিয়া ২৬, চীন ৬৪ ও দক্ষিণ আফ্রিকা ৯২তম স্থানে রয়েছে।
মোট ৪৬টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে জরিপ চালিয়ে এই সূচক তৈরি করা হয়। এ ক্ষেত্রে দেশগুলো কীভাবে উন্নতি করছে এবং শিক্ষাকাজে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতায় জোর দিয়ে মানবসম্পদকে- লাগাচ্ছে, তা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।
আমেরিকার আন্তর্জাতিক মানবসম্পদ ও আর্থিক সেবাএর সহযোগিতায়-সংক্রান্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মার্কার- ডব্লিউইএফ মানব পুঁজি সূচক তৈরি করে।

সূত্রডব্লিউইএফ :
প্রথম আলো, ১৮ মে

ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্প

শুধু মুম্বাই, জাপান কিংবা কানাডায় নয়, এবার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় চলবে মেট্রোরেল। বাংলাদেশ সরকার ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি- (জাইকা('র অর্থায়নে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মেট্রোরেলের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ১৯ দশমিক ৭৯ কিলোমিটার দৈর্ঘের 'ঢাকা ম্যাস র্যা পিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' (ডিএমআরটিডিপি বাস্তবায়ন করছে ('ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ' (ডিটিসিএ। (
মেট্রোরেল পরিচালনার জন্য 'ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএলনামে একটি কোম্পানিও গঠন (হাজার যাত্রী ৬০করেছে সরকার। ঘন্টায় বহন সক্ষম এ রেল ২০১৯ সালে উদ্বোধনের লক্ষ্যে কাজ করছে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা। ২০১৩ সালের ৩১ অক্টোবর প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মেট্রোরেলের প্রকল্প পরিচালক মোফাজ্জেল হোসেন গণমাধ্যমকে জানান, মোট আটটি প্যাকেজে বাস্তবায়ন করা হবে মেট্রোরেল। ২০১৬ সালের জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন দরপত্র প্রক্রিয়া চলবে।
২০১৬ সালের অক্টোবরে চুক্তি সই হতে পারে। সব ঠিক থাকলে প্রথম পর্বের নির্মাণকাজ ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে শেষ হবে। ২০২৪ সালে শেষ হবে সম্পূর্ণ কাজ।জানা যায়, ঢাকা মহানগরীতে কার্যকরী ও দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা, সর্বসাধারণের জন্য গণপরিবহন সুবিধাদির ব্যবস্থা করা এবং নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে মেট্রোরেল চালু করার জন্য ২০০৮ সাল থেকে প্রাথমিক কাজ শুরু করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। সম্ভাব্যতা যাচাই আর নকশা অনুমোদনসহ নানা জটিলতায় গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্পটি শুরুই করতে দেরি হয়। তবে সব জটিলতা কাটিয়ে উঠে মূল কাজ শুরু করার জন্য প্রায় প্রস্তুত প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা।
এ বিষয়ে মেট্রোরেলের লিগাল এ্যাফেয়ার্সের ম্যানেজার খান মোমিজানুল ইসলাম বলেন ., টেকনিক্যাল কারণে কিছু সময় লেগেছে। কিন্তু মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় এ বিষয়ে খুবই আন্তরিক। আর পিডি স্যার সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সবাই মিলে কাজ করায় আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি।
এ প্রকল্পকে এগিয়ে নিতে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে উত্তরা থেকে মতিঝিল পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র ৩৮ মিনিট। ঘন্টায় গতি হবে গড়ে ৩২ কিলোমিটার শ১সর্বোচ্চ)' কিলোমিটারচলাচলকারী মোট ।(টি ট্রেনের প্রতিটিতে২৪ ৬টি করে বগি থাকবে। প্রতিটি ট্রেনে ৯শ' ৪২জন যাত্রী বসে ও ৭শ' ৫৪জন দাঁড়িয়ে যাতায়াত করতে পারবে। প্রতি ৪ মিনিট পর পর ট্রেন ছেড়ে যাবে এবং ঘন্টায় প্রায় ৬০ হাজার যাত্রী বহন করবে।
মেট্রোরেল পরিচালনার জন্য প্রতি ঘন্টায় ১৩ দশমিক ৪৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হবে বলে জানা যায়।প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ২১ হাজার ৯শ' ৮৫ দশমিক ৭ কোটি টাকা। জাইকা থেকে পাওয়া যাবে ১৬ হাজার ৫শ' ৯৪ দশমিক ৫৯ কোটি ও বাংলাদেশ সরকারের ৫ হাজার ৩শ' ৯০ দশমিক ৪৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত দিয়েছে প্রায় ৪শ' কোটি ও জাইকা দিয়েছে প্রায় ১শ' ৪৫ কোটি টাকা।
আগামী অর্থ বছরে বড় বরাদ্দ দেয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা। মেট্রোরেলে থাকবে ১৬টি স্টেশন। মেট্রোরেলের নির্ধারিত রুট হচ্ছে উত্তরা ৩য় ফেইজরোকেয়া সরণীর- পশ্চিম পাশ দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেটহোটেল- সোনারগাঁও- বাংলাদেশ ব্যাংক-তোপখানা রোড-দোয়েল চত্বর-টিএসসি-শাহবাগ (মিতিঝিলমেট্রোরেল পুরোটাই হবে উড়ালপথে। ।(বিদ্যমান সড়কের মাঝখানে আড়াই মিটার জায়গা নেয়া হচ্ছে। উচ্চতা হবে মাটি থেকে আট থেকে ১৩ মিটার পর্যন্ত। তিন পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে প্রকল্পটি। মোট ২৪ সেট রোলিং স্টক থাকবে এবং প্রত্যেক সেটে ৬টি কার থাকবে।
এছাড়া লিফট, এসি, হুইল চেয়ার, স্বয়ংক্রিয় টিকেটিং সিস্টেমসহ নানা সুযোগ সুবিধা থাকবে এ রেলে।মেট্রোরেলের জন্য ১৬টি স্টেশন প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে, উত্তরার উত্তর, উত্তরা কেন্দ্র, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, আইএমটি, মিরপুর১০-, কাজীপাড়া, তালতলা, আগারগাঁও, বিজয়সরণি, ফার্মগেট, সোনারগাঁও, জাতীয় জাদুঘর, দোয়েল চত্বর, জাতীয় স্টেডিয়াম ও বাংলাদেশ ব্যাংক। স্টেশনগুলো ওপরে হবে এবং নিচ থেকে লিফট বা চলন্ত সিঁড়ির মাধ্যমে যাত্রীদের উপরে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। কনসালটেন (জিসিশ৯হিসেবে (' ২ কোটি টাকা চুক্তিতে যুক্তরাজ্য, ভারত, জাপান ও বাংলাদেশের সাত প্রতিষ্ঠানকে বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া ৮ (এনকেডিএম এসোসিয়েশন) হয়েছে।
বর্তমানে এর বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন, ভূতাত্ত্বিক জরিপের ফিল্ড টেস্টে ও সংগ্রহ, রাইট অব ওয়ে, জরিপের কাজ চলছে।

সম্পূর্ণ প্রকল্পটি মোট ৮টি প্যাকেজে সম্পন্ন হবে। এর মধ্যে কয়েকটি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পসংশ্লিষ্ট ডেভেলপমেন্ট কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের ইঞ্জিনিয়ার সাইদুর রহমান জানান, উত্তরা থার্ড ফেজ থেকে কাজ শুরু করা হয়েছে। মতিঝিলে গিয়ে শেষ হবে। মোট ভূকিলোমিটার। ১দশমিক ২০তাত্ত্বিক জরিপের কাজ – ভূতাত্ত্বিক জরিপের কাজ প্রায় – শেষের দিকে চলে এসেছে।
মেট্রোরেল আইন অনুযায়ী প্রকল্প শেষ হলে ডিটিসিএ একটি কমিটির মাধ্যমে মেট্রোরেলের ভাড়া নির্ধারণ করবে। রেলের পরিদর্শকও তারা নিয়োগ দেবে। বিনা টিকিটে ভ্রমণ করলে ভাড়ার ১০ গুণ জরিমানা গুনতে হবে। মেট্রোরেল ও যাত্রীর বীমা বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। এছাড়া মেট্রোরেল আইন ভঙ্গ করলে সর্বোচ্চ ১০ বছর জেল ও এক কোটি টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। অনুমতি ছাড়া লাইসেন্স হস্তান্তর করলে ১০ বছর কারাদও এক কোটি টাকা – জরিমানা, পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করলে দুই বছর জেল ও ২ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ

১ম বিশ্বযুদ্ধ

বর্তমান বিশ্ব ব্যাবস্থার রুপায়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করা একটি ঘটনা হচ্ছে ইউরোপীয়ান মহাযুদ্ধ যা প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ নামেই বেশী খ্যাত। ৪ বছর স্থায়ী এই যুদ্ধে দেড়কোটি মানুষ প্রাণ যায় এবং ২ কোটি মানুষ আহত হয়, ৩টি সাম্রাজ্যের পতন হয়, নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং বিশ্বের মানচিত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে !!!

ইতিহাস এমন ভয়াবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা কমই প্রত্যক্ষ করেছে!

এই ভয়াবহ দূর্যোগ কিভাবে বিশ্লেষন করা যায়?

আজকের সহজ ইতিহাসে, সংক্ষেপে এবং সহজ ভাষায় এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার কারন খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো। তথ্যভিত্তিক নয় বরং বিশ্লেষন ভিত্তিক এই লেখাটির উদ্দেশ্য মূলত সাধারন ব্লগার পাঠক বন্ধুদের, ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার কারন সম্পর্কে অবগত করা , সেই সাথে অল্প কথায় যুদ্ধের গতি প্রকৃতিও জানিয়ে দেয়া । তবে বিষয়টা একটু ঝামেলার কারন, এই যুদ্ধের কোন নিরেট কারন খুজে বের করা যায় নাইসেই চেষ্টা করলে ইতিহাসের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। তা ! আমরা কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ঘটনাবলী'র বিশ্লেষন করবো, এবং সবকিছুর একটা মিলিত যোগসুত্র স্থাপন করার চেষ্টা করবো!

মনে রাখার ২টি বিষয় :

একটা বিষয় সব সময় মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোন শত্রুমিত্র নাই–, আন্তর্জাতিক রাজনীতি'র মূলনীতিই হচ্ছে ক্ষমতা অর্জনের প্রতিযোগীতা এবং মানে !"ব্যালেন্স অব পাওয়ার", কোন রাষ্ট্রই চায় না অন্য একটা রাষ্ট্র এতটা শক্তিশালী হোক যা আগামীতে নিজেদের জন্য হুমকি হতে পারে।

এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভুমি হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ন আরেকটা মনে : রাখার বিষয় হলো, জার্মানীঅস্ট্রিয়া এবং ইটালীর – সাল থেকে ১৮৮২মাঝে সামরিক জোট গঠনের চুক্তি বলবৎ ছিল, ১৯০২ এ সেটা নবায়ন হয়।

এবং এটার সালে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স যৌথ সামরিক চুক্তি করে। ১৯০৪হিসেবে "কাউন্টার ওয়েট"

ব্যাকগ্রাউন্ড :

এবার যুদ্ধের কারন ভাল করে বুঝার জন্য, আমরা তৎকালীন সময়ের দেশগুলোর অবস্থান কেমন ছিল সেটা দেখি :

মাত্র ১৮৭১ সালে জার্মানী একটি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদের যুগে ১৮৯৮ এ এসেই তাদের উচ্চাকাঙ্খী সম্রাট, কাইজার দ্বিতীয় উইলহেইমের মনে ইউরোপের বাইরেও সাম্রাজ্য স্থাপনের খায়েশ জাগে। অবশ্য জার্মান অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তি সেই স্বপ্ন দেখার মত অবস্থানে ছিলও।

অপরদিকে রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসও ক্ষয়িষ্ণু অস্ট্রোহাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্যের এলাকায় নিজ প্রভাব বিস্তারের দিকে – নজর ছিল, এবং ঘরোয়া সমস্যা মানে তৎকালীন কম্যুনিস্ট বিপ্লব থেকে জনগণের নজর ফেরানোর জন্য এবং ক্ষমতা নিশ্চিতের জন্য একটি যুদ্ধজয় খুব ইতিবাচক মনে করে। এছাড়াও অস্ট্রিয়ার সুত্র ধরে সার্বিয়ায় জার্মান উপস্থিতি রাশিয়া একটি নিশ্চিত হুমকি স্বরুপ দেখে!

ভৌগলিকভাবে ইউরোপের বাইরে অবস্থিত একটি দ্বীপরাষ্ট্র ব্রিটেন, প্রচন্ড শক্তিশালী নৌশক্তির অধিকারী– সাম্রাজ্যটা এবং নৌসামরিক শক্তি দ্বারা তৎকালীন সময়ের অর্থনৈতিক – গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথে একক আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এর কলোনিগুলোর সাহায্যে তৎকালীন বিশ্বে ব্রিটেন ছিল একক পরাশক্তি। জার্মান উত্থান ছিল তার চোখে নিজ শক্তির প্রতি হুমকিএবং ! জার্মান দৃষ্টি ছিল ব্রিটেনকে চ্যালেঞ্জ করা!

অস্ট্রিয়াহাঙ্গেরী ও– অটোমান সাম্রাজ্য ২টি অতীতে প্রচন্ড শক্তিশালী কিন্তু সেইসময় পতনের মুখে থাকা শক্তি, জার্মানীর সাহায্যে তাদের হারানো ক্ষমতা ফিরে পাবার স্বপ্ন ছিলই।

ফ্রান্স তখন, আফ্রিকার কলোনী থেকে প্রাপ্ত সম্পদের কারনে বেশ ভাল কন্ডিশনে থাকলেও একটি শক্তিশালী জার্মানী মানেই তাদের ভয়াবহ ক্ষতি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এবং ভৌগলিক ও সামরিক শক্তি ব্যাপক থাকলেও তাদের নীতি ছিল যেকোন ইউরোপীয়ান ঝামেলার বাইরে থাকা।

নিরেট ইতিহাস :

এমন অবস্থায়, ১৯১৪ সালে অস্ট্রোহাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্যের হবু সম্রাট-, ডিউক ফার্ডিনান্ড সিংহাসনে আরোহনের কিছুদিন আগে সারায়েভো শহরে স্ত্রী সহ সার্বিয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদী আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়এটাকে দুনিয়ার) ! ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হত্যা অথবা সবচেয়ে ভুল হত্যাকান্ড বললে ভুল হবে না(!
এর ফলে সিংহাসন বসা নিয়ে অস্ট্রোহাঙ্-গেরীয়ান সাম্রাজ্য মুশকিলে পড়ে, এবং সার্বিয়ার উপর যার পর নাই ক্ষুব্ধ হয়। সার্বিয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে কিন্তু অস্ট্রিয়া একটি নিদৃষ্ট সময় বেঁধে দেয় প্রতিবেদন পেশ করার জন্য এবং বিচারের কিছু শর্ত বেঁধে দিয়ে তদন্ত কমিটিতে অস্ট্রোহাঙ্গেরীয়ান সাম্র-াজ্যের প্রতিনিধি নিয়োগের দাবী জানায়। কিন্তু সার্বিয়া এর সব শর্ত মানতে অস্বীকার করে।

তখন জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেইম অস্ট্রিয়াকে সম্পুর্ন সমর্থন দেবার ঘোষনা দেয় এবং অস্ট্রিয়ান দাবীর সাথে সহমত পোষন করে।

আক্রমানাত্মক পদক্ষেপ নেবার জন্য জার্মান সমর্থন অস্ট্রিয়ার জন্য ব্যাপক প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু জার্মানীঅস্ট্রিয়ার এই - যৌথ শক্তি'র উত্থানের বিপক্ষে জার্মানীর ২ প্রতিবেশী ফ্রান্স এবং রাশিয়া সার্বিয়ার পেছনে এসে দাড়ায়।

এবং অস্ট্রিয়ার দ্বারা সার্বিয়া আক্রমনের পরপর ভিন্ন ভিন্ন চুক্তি অনুসারে জার্মানীরাশিয়া যুদ্ধে -অস্ট্রিয়ার সাথে ফ্রান্স- জড়িয়ে পড়ে।

এবং অন্য একটি জার্মানঅটোমান চুক্তি অনুযায়ী- রাশিয়া যুদ্ধে যোগ দিলে অটোমান সাম্রাজ্য জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়ার কথা ছিল, তাই অটোমান সাম্রাজ্যও যুদ্ধে যোগ দেয়!

জার্মানী নিরপেক্ষ বেলজিয়াম আক্রমন করলে তখন পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেন জার্মানীর বিপক্ষে যুদ্ধে ঘোষনা করে!

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক ত্যাগ করে। বিপ্লবের ফলে রাশিয়া যুদ্ধ (কম্যুনিস্ট)

কিন্তু ফ্রান্সব্রিটেনকে রসদ যোগান দেয়ার অভিযোগে জার্মান সাবমেরিন যখন- ৭টি যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ ডুবিয়ে দেয় তখন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত যুদ্ধে যোগ দিয়ে এটাকে বিশ্বযুদ্ধ রুপ দেয়এবং মুলত এরপরই জার্মান পরাজয় ! নিশ্চিত হয়!

এটা তো ইতিহাস কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য হলো এর বিশ্লেষন, ইতিহাস কেন এমন হলো সেটার বিশ্লেষনই আমাদের লক্ষ্য!

বিশ্লেষন:

যুবরাজের হত্যার পর, জার্মানীর হিসাবে ছিল যে, সার্বিয়ার বিরুদ্ধে একটি সংক্ষিপ্ত, আঞ্চলিক যুদ্ধে বিজয়ের সম্ভাবনা আছে। তাই তারা অস্ট্রিয়াকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সার্বিয়ায় হামলা করার অনুমুতি দিয়ে দেয়। যা হয় বিরাট ভুল!

জার্মানী অস্ট্রিয়াকে নজিরবিহীন সমর্থন দেয়ায় ভবিষ্যৎ জার্মান শক্তি'র সম্ভাবনায় আতংকিত ফ্রান্স এবং রাশিয়ার তরফ থেকে অনাকাঙ্খিত শত্রুতা ডেকে আনে!

রাশিয়া এবং ফ্রান্স সাথে সাথে যুদ্ধে যোগ দিলেও জার্মানী তাদের ভালই মোকাবেলা করছিল, কিন্তু ব্রিটেনের চোখে রাশিয়া এবং ফ্রান্সের তুলনায় একটি নতুন ও শক্তিশালী জার্মানী ছিল বড় হুমকী তাই তারা পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী ও নিজেদের ক্ষমতার সুরক্ষিত করার জন্যই জার্মানীর বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষনা করে দেয়। ব্রিটেনের মত পরাশক্তির আগমন জার্মানীর জন্য ব্যাপক থ্রেট হয়ে দাড়ায়!

আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাঝেই রাশিয়া পরাজিত হয়ে যুদ্ধত্যাগ করে। ব্যাপক সৈন্য ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও – কম্যুনিস্ট প্রোপাগান্ডাই সম্রাটের পতন ও রাশান পরাজয় নিশ্চিত করে!

ইতিমধ্যেই ৩ বছর ধরে চলা যুদ্ধে এবং শীতকালে রাশিয়ার অভ্যন্তরে আক্রমন করে ব্যাপক ক্ষতির শিকার জার্মান সেনাবাহিনী অদুরদর্শীতার পরিচয় দেয় আমেরিকান জাহাজে আক্রমন করেজার্মান ! নৌবাহিনীর আক্রমন ঘুমন্ত দৈত্য – যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে ডেকে এনে চুড়ান্ত জার্মান পরাজয় নিশ্চিত করেটেজিক ভুল জার্মানদের দ্বারাইএমন স্ট্র্যা) ! সম্ভব তা আবারো প্রমানিত হয় ২য় বিশ্বযুদ্ধে(

আরেকটি কারন :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম একটি কারন বলে চিন্হিত করা যায়, নব্য ও উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রসার!

অস্ট্রোহাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্য–, অটোমান সাম্রাজ্য ২টিই তাদের মানচিত্রের বিভিন্ন অংশে এবং মুলত বলকান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এলাকা হারাচ্ছিল।

রাশিয়ার সম্রাট (খ্রিষ্টান) ধর্মীয় (জার) অর্থোডক্স জাতীগত নৈকট্যের কারনে এবং রাশিয়ান (স্লাভিক) ও (নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে ও জাতীয় ন্নত রাখতে সার্বিয়ানদের পাশে দাড়ায়। সমু "প্রাইড"

১৮৭৮ এর যুদ্ধে জার্মানীর নিকট পরাজিত ফ্রান্স জাতীগতভাবেই জার্মানীর বিরোধীতাকারী ছিলএবং আরো বেশী ! শক্তিশালী জার্মানী মানেই ফরাসী জাতি'র জন্য হুমকী!

আর যেই হত্যাকান্ড নিয়ে এত কাহিনী সেটাও জাতীয়তাবাদীরই কাজহাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্যের দক্ষিনের একটি –অস্ট্রো ! অংশকে সার্বিয়ার সাথে একীভুত করার লক্ষ্যেই এক উগ্র জাতীয়তাবাদী সার্ব বসনিয়াক, যুবরাজ ফার্ডিনান্ডকে প্রকাশ্য রাজপথে গুলি করে হত্যা করে!

শেষ কথা :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে তাই গ্লোবালিজমের প্রথম পর্যায়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের প্রমান করা এবং ক্ষমতার লড়াই বললে বেশ সঠিক হয়।

কারন শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের লক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে নব্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা জার্মানীর উত্থান ফ্রান্স, ব্রিটেনের সাম্রাজ্যের জন্য নিশ্চিত হুমকি ছিল এবং এটা ঠেকানোর জন্যই ফ্রান্সব্রিটেন এবং সবশেষে –রাশিয়া– বছর ধরে ৪এবং !যুক্তরাষ্ট্র একজোট হয় চলা ব্যাপক ক্ষয়অটোমান (অস্ট্রিয়ান) ক্ষতি নিশ্চিতের পর হাবসবুর্গ– (তুর্কিশটা শতাব্দী প্রাচীন ৩সাম্রাজ্যের মত (রাশিয়ান) এবং রোমানভ (একসময়ের প্রবল আধিপত্য বিস্তারকারী সাম্রাজ্যের পতন নিশ্চিতকারী পরজয় ভাগ্যে জুটে!

এবং নিজেদের আড়াল করার নীতি থেকে সরে এসে যুদ্ধের শেষ দিকে যোগ দিয়েই মুল নায়কের আসনে বসে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রএবং ! প্রেসিডেন্ট উইলসনের নেতৃত্ব শুরু হয় দুনিয়ায় নতুন ধরনের রাজনীতি!

২য় বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হলেও ফিরে আসার আশা ত্যাগ করে নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধটা যেমন হঠাৎ করে হয়ে গেল, ২য় বিশ্বযুদ্ধ তেমন ছিল না। বরং এটা ছিল পূর্ব পরিকল্পিনার ফসল! জার্মানীইটালি এবং জাপান পরিকল্পিতভাবে – তৎকালীন বিশ্ব ব্যাবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে এই যুদ্ধ বাধায়!

বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ এই যুদ্ধটি সহজ ভাবে বুঝার চেষ্টা করবো আজকেযথারীতি তথ্যভিত্তিক ! নয় বরং বিশ্লেষনমুলক আলোচনা করবো। কি কারনে, কোন পরিস্থিতিতে এবং কিভাবে যুদ্ধ লাগে সেটারই একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষন আপনাদের সাথে শেয়ার করবো!

১ম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নতুন বিশ্বব্যাবস্থা এবং মনে রাখার মত একটি ফ্যাক্ট :

-------১ম বিশ্বযুদ্ধ শেষে অস্ট্রোহাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্য–, অটোমান সাম্রাজ্য এবং রাশিয়ান সম্রাটের পতনের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতির ময়দানে খেলোয়াড় বদল হয়। মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসন্ন হয়ে পড়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রের আগমনে সবমিলিয়ে নেতৃত্ব উঠে যায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের হাতেওদিকে লেনিনের নেতৃত্বে রাশান রাজনীতিও ভিন্ন ! পথে চলে যায়।

উইলসন ছিলো আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে, গণতন্ত্র এবং লিবেরালিজমের প্রবক্তা ও বাস্তবায়নের অন্যতম নায়ক।

যুদ্ধপরবর্তীকালীন নেতারা সবাই এই মর্মে একমত হয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যুদ্ধ একটা অভিশাপ। সবাই ভবিষ্যতের সম্ভাব্য যুদ্ধ এড়ানোর লক্ষ্যে একমত হয়ে উইলসনের সাথে একমত হয় যে, যেহেতু যুদ্ধের পুরো ক্ষতিটাই বহন করে জনগণ তাই জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। যদিও তাদের কাজকর্ম সেই সময়ের তুলনায় বেশ "ইউটোপিয়ান" ছিল, কিন্তু তারা বেশ কিছু সমস্যার সঠিক কারন খুজে বের করে , গোপন সামরিক চুক্তি এবং গোপন আন্তর্জাতিক রাজনীতি যুদ্ধের সহায়ক ধারনা করে, "ওপেন ডিপ্লোম্যাসির প্রচলন শুরু হয়।"

সরকারব্যাবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সচ্ছতার নিশ্চয়তা করার লক্ষ্যেই জন্ম নেয় সহজ !"লীগ অব নেশন্স" ভাষায় যেটার দায়িত্ব ছিল বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধ প্রতিরোধে একটি "মুরুব্বী" কাউন্সিল হিসেবে কাজ করা ! পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা যা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে গঠিত হয়!

আজকের এর পুরানো বা ব্যার্থ "জাতিসংঘ " ভার্সনই হলো এই ।"লীগ অব নেশন্স"

এক কথায় বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পুরো আন্তর্জাতিক রাজনীতি উল্টো পথে চলা আরম্ভ করে। রাষ্ট্রগুলো শতাব্দী প্রাচিন "রিয়েলিজম" দর্শনকে খারিজ করে বিশ্বব্যাপী দর্শন গ্রহনে পদক্ষেপ নেয়। "লিবেরাল "

১ম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ঘটনা যা ২য় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল :

সহজ ইতিহাসকে সহজ রাখার উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে পরবর্তী ঘটনাবলী সহজ : ইতিহাসের ক্ষেত্রে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের চেয়ে যুদ্ধের আগের ঘটনাবলী বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

যুদ্ধে পরাজিত জার্মানীকে ২৬৯ বিলিয়ন "গোল্ড মার্ক" জরিমানা করা হয়ে। এবং ১৮৭২ এর যুদ্ধে জার্মান দখলকৃত এলাকা "লরেন–আলসাক" ফ্রান্স নিয়ে নেয়জার্মানীকে অস্ত্রহীন করে ফেলা হয়। এবং ! অস্ট্রোহাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্যকে – খন্ড খন্ড করে ফেলা হয়। একদম

অটোমান সাম্রাজ্যের উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্য বেদখল করা হয় এবং তুরস্কের নানা অংশ দখল করার লক্ষ্যে ব্রিটেনগ্রিস তুর্কী-ইটালী-ফ্রান্স- ভুখন্ডে ঢুকে যায় যদিও কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্ক নিজেদের ভুমি) রক্ষা করতে সক্ষম হয় ।(

সবচেয়ে অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে , যুদ্ধ পরবর্তী মূল নেতা, মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের সাথে !মার্কিন নেতৃত্বে পুরো দুনিয়া বদলে দেবার স্বপ্ন দেখিয়ে ইউরোপ থেকে দেশে ফেরার পর মার্কিন কংগ্রেস উইলসনের সমস্ত প্ল্যান খারিজ করে দেয়, এবং নিজেদের ইউরোপীয়ান ঝামেলা থেকে দুরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়যেটা শুরুতেই বর্ণিত নতুন) ! ! ! ! ! বিশ্ব ব্যাবস্থা সফল করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে যায় (

এই অবস্থায়, ১০ বছর পেরিয়ে যায়। তখনো বিশ্ব জুড়ে ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চ সাম্রাজ্য ছিল এবং নিদৃষ্ট যোগ্য কোন নেতৃত্ব না থাকায় দেশগুলো নব্য লিবেরাল আইডিয়া ঠিক মত আত্মস্থ করতে ব্যার্থ হওয়ায়, ফলে "লীগ অব নেশন" কার্যত কাজ করতে পারছিল নাএবং রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করার ! নীতি এবং সামগ্রিক চিন্তার অভাবে ধীরে ধীরে এটা পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে পড়ে

এই অবস্থায়, বিজয়ী ব্রিটেন বা ফ্রান্স আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রনে অনাগ্রহী হয়ে নিজ নিজ হিসাব ঠিক রাখায় ব্যাস্ত হয়ে পড়ে। ফ্রান্সের লক্ষ্যে ছিল জার্মানীর ভবিষ্যত যুদ্ধ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্হ করে ফেলতে, কিন্তু ব্রিটেন হয়তো যুগের কথা স্বরন "নেপোলিয়ান" করে ক রাখার জন্যই জার্মানীর সামরিক উপস্থিতিরঠি "ব্যালেন্স অব পাওয়ার" সমর্থন করেএবং জার্মানী আবার নিজেদের সামরিক বাহ !িনী গঠনের অনুমুতি পায়) ! এটা একটা মহা গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, কারন ১ম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফিরে আসার পথ উন্মুক্ত হয় এর দ্বারাই(

এরই মাঝে বিশ্বজুড়ে দেখা দেয়) "অর্থনৈতিক মহামন্দা" বর্তমান সময়ের মতই অবস্থাকরু (!ন অর্থনৈতিক পরিবেশে ইটালীতে ফ্যাসিস্ট মুসলিনির আবির্ভাব ঘটে এবং জার্মানীতে নির্বাচিত হয়ে যায় এডলফ হিটলার! ! !

অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলায় সব দেশই নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং চিরসত্য হলো, সামাজিকঅর্থনৈতিক - বিশৃঙ্খল পরিবেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির চেয়ে স্বৈরাচারী শাষন বেশী কার্যকর। তাই ফ্রান্সব্রিটেনের- তুলনায় জার্মানীইটালী-'র অর্থনীতি দ্রুত সংগঠিত হচ্ছিল!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম পক্ষ, তুর্কী এইবার নিজেদের বেশ কৌশলে যুদ্ধ থেকে দুরে রাখে। যদিও তুর্কি জনগণ জার্মানদের প্রতি সহানুভুতিশীল ছিল, কিন্তু তুর্কি সরকার মিত্র বাহিনীর সাথে মিত্রতা রক্ষা করে চলে পুরো সময়জুড়ে!

এবং এশিয়ার শক্তি জাপানও যখন ফ্যাসিস্ট নীতি গ্রহন করে তখন, জার্মানীদেশ মিলে সারা টি৩ইটালী ও জাপান - সামাজিক-বিশ্বে তৎকালীন আর্থ ব্যাবস্থা বদলে নতুন ব্যাবস্থা প্রণোয়ন "জাতিভিত্তিক"ের পরিকল্পনা গ্রহন করে।

এবং সেই লক্ষে কাজ করা শুরু করে দেয় শীঘ্রই!

যুদ্ধের নিরেট ইতিহাস :

পরবর্তী ইতিহাস বেশ সহজ!

ফ্যাসিস্ট ইটালি এবং জার্মানীর সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আংশিক জয়ী জাপানও সামরিক বাহিনীর প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে ফ্যাসিস্ট রিজিম কায়েম হয়!

এবং এই ৩ দেশ তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ধারা পরিবর্তনের পরিকল্পনা করে। ওদের দাবী ছিল, তৎকালীন ব্যাবস্থা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন এবং ফ্রান্সেরই সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করছে, অন্যদের ঠকাচ্ছে ঐ ব্যাবস্থা!

প্রথম আগ্রাসী হয় জাপান, ১৯৩১ সালে চীনের মাঞ্চুরিয়া, ১৯৩৭ সালে চীনের মুল ভুখন্ড দখল করে।

ইটালী ১৯৩৫ সালে আবিসিনিয়া এবং ১৯৩৯ আলবানিয়া দখল করে।

এবার এ্যাকশন শুরু করে হিটলারতারও স্বপ্ন ছিল তৎকালীন বিশ্বব্যাবস্থা ! বদলে দিয়ে একটি জাতিভিত্তিক ব্যাবস্থা প্রনোয়ন করা। তার মতে তৎকালীন ব্যাবস্থা বদলে জার্মান জাতির সন্মান পুনরুদ্ধার এবং শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়!

১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর সাথে একীভুত করা হয়। টা জোর করেযদিও অস্ট্রিয়ানরা বলে হিটলার এমন) করেছিল , কিন্তু আমার মনে হয় ঘটনা ভিন্ন (

১৯৩৯ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় বসবাসরত জার্মানদের নিরাপত্তার অজুহাতে চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে ফেলে!

ব্রিটেন এবং ফ্রান্স ততদিনে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হতে শুরু করেছে। কিন্তু জার্মান শক্তির কথা মাথায় রেখে ধৈর্য্য ধরে পর্যবেক্ষন করে যাচ্ছিল এবং নাৎসিদের চেক দখল পর্যন্ত মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু নাৎসীদের পরবর্তী সম্ভাব্য শিকার পোল্যান্ডের উপর নজর রাখছিল১৯৩৯আগস্ট ২৩এই অবস্থায় ! সালে দুনিয়াকে স্তব্ধ করে দিয়ে নাৎসি হিটলারের সাথে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট নেতা স্ট্যালিন একটি অনাগ্রাসন চুক্তি সম্পন্ন করে!

রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যাবার পর ব্রিটেন এবং ফ্রান্স এখন কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না চিন্তা করে জার্মানী একসপ্তাহ পরই ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে পোল্যান্ড আক্রমন করে!

কিন্তু নাৎসীদের অবাক করে দিয়ে, পোলিশদের পাশে দাড়ায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স এবং তারা জার্মানীর বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষনা করে দেয়!

হিটলার দ্রুতই প্রচন্ড শক্তিশালী জার্মান সেনাবাহিনীকে বলকান অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করায়। তারা নরওয়ে, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, হল্যান্ড দখল করে নেয়। ফ্রেঞ্চব্রিটিশ সব- প্রতিরোধ উড়ে যায় ! সালেই জুলাই মাসের মধ্যে প্যারিস পর্যন্ত দখ ১৯৪০ল করে ফেলে নাৎসি জার্মানীএবং ব্রিটেনের উপর ভয়াবহ বিমান ! !হামলা চালায়

এরপরই ঘটে অদ্ভুদ সেই ভুলকোন এক অজানা কারনে ব্রিটেন সম্পুর্ণ দখল না ! করেই সদ্য মিত্র রাশিয়া আক্রমন করে বসেএকই ভুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে) ! করেছিল করেছিল জার্মান কাইজার দ্বিতীয় উইলহেইম (

এরপর অপেক্ষা করছিল তারচেয়ে বড় ভুলজাপান পার্ল হার্বারে তখন পর্যন্ত যুদ্ধের বাইরে থাকা মার্কিন ঘাটি আক্রমন ! !করে বসে (একই ভুল এর আগে করেছিল জার্মানি মার্কিন জাহাজ ডুবিয়ে) এবং একই সময়ে জার্মানীও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষনা করে!

জাপানী আক্রমন এবং জার্মান যুদ্ধ ঘোষনার প্রেক্ষিতে একঘরে নীতি বাদ দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট ব্রিটেন ও সোভিয়েত বাহিনীর সাথে মিত্রতা করে যুদ্ধে যোগ দেয়!

এরপর আরো ৪ বছর জার্মানী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া ফ্রন্টে যুদ্ধ করে যায় এবং কনসান্ট্রেশন ক্যাম্পে ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ হত্যা করেরাশিয়ায় ব্যাপক সৈন্য হারিয়ে এবং মিত্র বাহিনীর ! বিমানহামলায় জার্মানীর অভ্যন্তর বিদ্ধস্ত হয়ে ব্যাপক শক্তি হারিয়ে এক পর্যায়ে ১৯৪৫ সালে আত্মসমর্পন করে!

এরপর পরাজয়ের দাড়প্রান্তে দাড়িয়ে থাকা জাপান সাধ্যমত লড়ে যাচ্ছিল কিন্তু জার্মানীর আত্মসমর্পনের ৩ মাস পর হিরোশিমা ও নাগাসাকির ২ টা এ্যাটম বোমার বিস্ফোরন তাদেরও আত্মসমার্পন তড়ান্বিত করে!

এবং ৫ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষের প্রানের বিনিময়ে ৬ বছরের যুদ্ধ শেষে দুনিয়ার রাজনৈতিক ব্যাবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে শুরু হওয়া যুদ্ধ পরিবর্তনকামীদের পরাজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়!

শেষ কথা :

২য় বিশ্বযুদ্ধের পেছনে প্রধান কারন ছিল, হিটলারের উচ্চাভিলাষী, আগ্রাসী স্বপ্ন। ২য় বিশ্বযুদ্ধের কারন হিসেবে হিটলারের কে "ইল এ্যাডভাইসড ডিসিশন" চিন্হিত করা হয়। এছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি এবং কঠিন চুক্তির হাত থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্খাএবং তৎকালীন সমাজে ফ্যাসিজমের ! জনপ্রিয়তা মুসোলিনি), হিটলার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত স্বৈরাচার ছিল(!

জার্মানী এমন সুযোগ পায় মূলত তৎকালীন বিশ্বে কোন একক ক্ষমতার উপস্থিতি ছিল না, যে মুরুব্বী রোল প্লে করতে পারবে। এবং "লীগ অব নেশন্স" গঠিত হলেও রাষ্ট্রগুলোর ঐক্যমত না থাকায় এর অকার্যকর ভূমিকা শান্তিকামী মানুষদের হতাশ করেছিল!

ভাল অবস্থানে থেকেও) র"অক্ষ শক্তি" জার্মানীযুদ্ধে পরাজয়ের মূল কারন আমার চোখে (পানজা-ইটালী-, ভুল স্ট্র্যাটেজি ! ব্রিটেনের পতন নিশ্চিত করার আগেই রাশিয়ার শক্তিকে খাটো চোখে দেখে কাইজার উইলহেইমের মতই ভুল উপায়ে শীতকালে রাশিয়া আক্রমন করা। এর ফলে , পূর্বতবে !পশ্চিম উভয় ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে হয়-, জাপানের কারনে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে আগমন, ছিল সবচেয়ে বড় ভুল!

এছাড়াও নাৎসীদের চুড়ান্ত বর্বর উপায়ে মানুষ হত্যার একটি এফেক্টও ছিল হয়তো!

পরশিষ্ট এমন একটি বিজয়ের পর বিশ্ব আর আগের ভুল করে নাই :। যুক্তরাষ্ট্র আবার তার খোলশে গিয়ে ঢুকে নাই বরং আগ বাড়িয়ে এসে নেতৃত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছে। প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব শান্তির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ "জাতিসংঘ" নেয়। কিন্তু ততদিনে সোভিয়েত রাশিয়াও শক্তিশালী ইন্ডাস্ট্রিয়াল হয়ে গেছে "গ্লোবাল" আর ততদিনে আক্ষরিক অর্থে ! দুনিয়ায় কম্যুনিস্ট সোভিয়েত এবং পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী নিজ আদর্শ ও স্বার্থ সংরক্ষন এবং প্রসারের লক্ষ্যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই একে অপরের প্রতি সন্দেহবাদী হয়ে উঠে! তাই তো, বিজয়ীদের মিত্রদের মাঝে সবচেয় শক্তিশালী ২টি রাষ্ট্রের ভেতরেই শুরু হয় স্নায়ু যুদ্ধ যা !কোল্ড ওয়ার / পৃথিবীকে কাঙ্খিত শান্তির স্পর্শ থেকে দুরে রেখেছিল প্রায় ৪৪ বছর!

ইবোলা ভাইরাস

উত্তরে সহায়ক

ইবোলা:(রক্তপ্রদাহ জনিত জ্বর রোগ)

১ম শনাক্ত হয়>> ১৯৭৬

২.সনাক্ত করা হয় >. কঙ্গো (ততকালীন জায়ারে)ও সুদান

৩. নামকরণ >> কঙ্গোর একটি নদীর নামে

৪.সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়ে>> পশ্চিম আফ্রিকার গিনি, লাইবেরিয়া, নাইজার, সিয়েরা লিওন

৫.প্রথমবার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার ৯০%
৬.প্রাথমিক লক্ষণ>> সর্দি-কাঁশি,মাথা-ব্যথা,ডায়ারিয়া,এবং জ্বর

গত বছর পশ্চিম আফ্রিকায় মহামারী আকারে ছড়িয়ে পরে ইবোলা ভাইরাস। ইতোমধ্যে বহু লোক মারা গেছে। ইবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে বিশ্বব্যাপী ঘোষণা করে জরুরি অবস্থা। আশঙ্কার ব্যাপার হলো পশ্চিম আফ্রিকাতে বিভিন্ন শান্তি মিশনে কর্মরত রয়েছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনীর শান্তিরক্ষীরা। যাদের মাধ্যমে বংলাদেশেও চলে আসতে পারে এই ভাইরাস।

তাই এই ভাইরাস সম্পর্কে সবারই জেনে রাখা উচিত, আর এ জন্য ব্রেকিংনিউজ তুলে ধরছে ইবোলা ভাইরাস সম্পর্কে আদ্যোপান্ত তথ্য:

এই ভাইরাসের কোনো প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কৃত হয়নি এখনও। নেই কোনো কার্যকর ওষুধ। তাই নেই তেমন কোনো চিকিৎসাও। এই প্রাণঘাতী 'ইবোলা ভাইরাস' শনাক্ত করার কোনো ধরনের ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত নেই বাংলাদেশে। বিশেষজ্ঞদের মতে আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার ৯০ শতাংশ। একজন আক্রান্তের সংস্পর্শে আসলেই আক্রান্ত হচ্ছে অপরজন। মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাস বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে ঘটাতে পারে স্মরণাতীত কালের ভয়াবহ মহামারী। কারণ এখানে আমরা একই ব্যক্তির জিনিস ব্যবহার করি বহুজন, প্রতি মুহূর্তেই আমরা লেগে আছি কারো না কারো স্পর্শে, অফিসে, রাস্তায়, ফুটপাতে, বাসে, দোকানে।

প্রথমে জেনে নেয়া যাক ইবোলা কি?
ইবোলা ভাইরাস আগে রক্তপ্রদাহজনিত জ্বর [Ebola hemorrhagic fever (EHF)] হিসাবেই সমধিক পরিচিত ছিল। ইবোলা মূলত একটি আরএনএ ভাইরাস। যেটির নামকরণ করা হয়েছে কঙ্গোর ইবোলা নদীর নাম থেকে। ইবোলা ভাইরাস গোত্রের ৫টির মধ্যে ৩টি প্রজাতি মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়ে গুরুতর অসুস্থ করার ক্ষমতা রাখে! বাকি ২টি মানুষের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে জাইরে (Zaire) ইবোলা ভাইরাস (জাইরে হলো একটি জায়গার নাম যেখানে সর্বপ্রথম এই ভাইরাসে কোনো মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলো)। প্রথমবার এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার ছিল শতকার ৯০ শতাংশ! ভয়াবহ এই ভাইরাসটি মানবদেহে রক্তপাত ঘটায়। লিভার, কিডনিকে অকেজো করে দেয়, রক্তচাপ কমিয়ে দেয়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কমিয়ে দেয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত করে।

ইবোলা ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশের পর কয়েকদিন থেকে প্রায় ৩ সপ্তাহ কোনো লক্ষণ প্রকাশ না করেই অবস্থান করতে পারে। অর্থাৎ এর লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ ২১দিন লাগতে পারে। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি এই রোগ নিয়ে চলে যেতে পারেন এক দেশ থেকে অন্য দেশে। আর সেখানে ছড়িয়ে দিতে পারেন নিজের অজান্তেই।

ইবোলার লক্ষণ
ইবোলা আক্রান্ত ব্যক্তি প্রথমে নিরীহ ফ্লু'র মতো হালকা জ্বর, মাথা ব্যাথা, শরীর ব্যাথা অনুভব করে। কিছুদিন পর তীব্র মাথা ব্যথা, জ্বর, শরীর ব্যথা, ত্বকে দানা দানা উঠা, মুখে ঘা, ডায়রিয়া এবং মারাত্মক বমি শুরু হতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ে শরীরের ভিতরে বাইরে রক্তপাত শুরু হতে পারে। এই ভাইরাসটি আক্রান্ত ব্যক্তির লিভার, কিডনি, হার্ট অকেজো করে দেয় যার ফলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলো সাধারণ ফ্লু'র মতোই। সর্দি কাশি, মাথা ব্যাথা, বমি, ডায়েরিয়া এবং জ্বর এই রোগের প্রাথমিক উপসর্গ। তাই কারো উপরোক্ত কোনো উপসর্গ দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে! রক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে এটা ম্যালেরিয়া, হ্যাপাটাইটিস, কলেরা বা অন্য কোনো রোগের জীবাণুর কারণে হচ্ছে কিনা!

কিভাবে ছড়ায়?
বলা হয়ে থাকে বাদুরের খাওয়া ফল থেকেই ইবোলা ভাইরাস মানুষের দেহে প্রথম প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে তা মানুষ থেকে মানুষে ছড়াতে শুরু করে। ইবোলা আক্রান্ত মানুষের দেহরস অপর কোনো মানুষের দেহের স্পর্শে আসলে সেই ব্যক্তিও আক্রান্ত হতে পারেন। এমনকি আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পরও ভাইরাসটি বেশ কয়েকদিন টিকে থাকে।

আশার কথা হলো, রোগটি ফ্লু ও অন্যান্য বায়ুবাহিত রোগের মতো ছড়ায় না, আক্রান্ত ব্যক্তির সরাসরি সংস্পর্শে না আসলে এই রোগে সংক্রমিত হবার ভয় নেই।

চিকিৎসা
রিহাইড্রেশন এবং হালকা বেদনানাশক দিয়ে করা হচ্ছে ইবোলা আক্রান্তের চিকিৎসা। খুব একটা কার্যকরী কোনো প্রতিষেধক এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। নেই কোনো প্রতিষেধক টিকাও। তথ্য মতে এই রোগে মৃত্যুর হার ৫০%-৯০%।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এই রোগের লক্ষণগুলো অন্য আরো অনেকগুলো রোগের লক্ষণের সাথে মিলে যায়! ফলে রোগ শনাক্ত করতে সময় লেগে যায়!

তাই সঠিক রোগ শনাক্ত করা এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা দেয়াটাও অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ! তবে যদি রোগ দ্রুত সময়ের মধ্যে শনাক্ত করা যায় এবং সঠিক মেডিক্যাল সাপোর্ট দেয়া যায় তাহলে রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়!

আমাদের করণীয়
যেহেতু এর কোনো টিকা আবিষ্কৃত হয়নি তাই এই ভাইরাসটি যাতে আমাদের দেশে প্রবেশ করতে না পারে এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। বিমানবন্দরে কর্তব্যরতদের এই ভাইরাসে আক্রান্তদের শনাক্তকরণের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যদি কোনো আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হয় তবে তাকে কিভাবে পৃথক করে চিকিৎসা দিতে হবে সেই ব্যাপারেও প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা এমন একটি দেশ যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে হাজারের বেশি মানুষ বাস করি। তাই এই ভয়াবহ ভাইরাসটি যাতে কোনোভাবেই আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেই বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এখনই।

তারপরও সতর্কতা হিসাবে সবসময় সাবান ও গরম পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন হাত না ধুয়ে চোখ, নাক বা মুখে হাত লাগনো না হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে যাওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের কোনো প্রকার তরল যাতে আপনার সংস্পর্শে না আসে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যদি কোনো কারণে এই রোগের লক্ষণ দেখা দেয় তবে সাথে সাথে নিজেকে আলাদা করে ফেলতে হবে যাতে অন্য কেউ এ রোগে আক্রান্ত না হয় এবং ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

সরকারের করণীয়
বাংলাদেশ সরকারের উচিত এখনই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আফ্রিকার দেশে থেকে আগত যে কাউকে ইমিগ্রেশন পার হবার আগেই মেডিক্যাল চেকআপের ব্যবস্থা করা। মনে রাখতে হবে এটি খুবই সংক্রামক রোগ। তাই এই ব্যাধি মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়তেও বেশি সময় লাগবে না।

ইবোলা ভাইরাস কি? এর লক্ষন ও প্রতিকার !
ইবোলা ভাইরাস কি? এর লক্ষন ও প্রতিকার !

প্রথমে আসি ইবোলা ভাইরাস কি?

ভাইরাসটির সম্পূর্ণ নাম ইবোলা ভাইরাস ডিসেজ। সর্বশেষ আক্রমণে মৃত্যু ঘটেছে প্রায় শতকরা ৫০% ভাগ । ঠিক কোথা থেকে এই ভাইরাসের উৎপত্তি? সেই ১৯৭৬ সালে কংগোর জিয়েরা এলাকায় ইবোলা নামক নদীর তিরে এটির প্রথম সংক্রমণ শুরু হয় বা ধরা পরে। তখন এই রোগের আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩১৮ জন এবং এর মদ্ধে ২৮০ জনই মারা যায়। এর পর থেকে এই ভাইরাসের নাম করন করা হয় ইবোলা। এই ভাইরাসের ধারক বা বাহক হচ্ছে বাদুর। এটি মানুষের মাঝে ছড়িয়েছে গরিলা, শিম্পাঞ্জি, বাদুর ইত্যাদি বন্য প্রানির মাধ্যমে। ধারণা করা হয় তখনকার সময়ে কেউ একজন আক্রান্ত কোন বন্য পশুর মাংস খেয়ে ফেলে এবং তারপর থেকে এই রোগের বিস্তার শুরু হয়।

Ebola-virus

যখন একবার কোন বেক্তি এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তখন সেই আক্রান্ত বেক্তির রক্ত, পুঁজ, এমনকি তার ব্যাবহার করা কাপর বা বিছানা থেকে এটি ছরাতে পারে। এ কারনে আক্রান্ত বেক্তিকে চিকিৎসা দিতে সেবা কর্মীরা পর্যন্ত ভয় পায় কারন যেকোনো সময় তারাও এই ভয়ংকর ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। তাহলে বুঝুন এটি কতোখানি মারাত্মক একটি ভাইরাস।

ইবোলা বর্তমানে পশ্চিম আফ্রিকাতে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পরেছে। ইতিমধ্যে বহু মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারাও গেছেন। এই ভাইরাসের মহামারী ঠেকাতে বিশ্বজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)। বর্তমানে পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন শান্তি মিশনে কর্মরত আছেন আমাদের দেশের সেনাবাহিনী জাদের মাধ্যমে খুব সহজে আমাদের দেশেও চলে আসতে পারে এটি। আমাদের সরকারও এটি নিয়ে খুব দুশ্চিন্তার ভেতরে আছেন এবং দেশের ভেতরে ঢোকার জন্য যে এয়ারপোর্ট এবং বর্ডার আছে সেগুলাতে কঠিন নজরদারি রাখার কথা শোনা যাচ্ছে।

ইবোলার লক্ষনঃ এই ভাইরাসটি কোন মানুষকে আক্রান্ত করার ২ থেকে ২১ দিনের মধ্যেই লক্ষন বা উপসর্গ দেখা দেয়। প্রাথমিক ভাবে আক্রান্ত বেক্তির জ্বর আসবে এবং সাথে সাথে গায়ে ব্যাথা, মাথা ব্যাথা, গলা ব্যাথা, বমি, ডাইরিয়া দেখা দিবে। এছাড়া এর সাথে লিভার ও কিডনীর সমস্যার লক্ষণ থাকবে। কখনো কখনো আক্রান্ত বেক্তির রক্ত বমি হতে পারে। এবং সাথে সাথে দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়বে ও পায়খানা দিয়ে রক্ত যাবে। এই লক্ষণ গুলো দেখা দেবার সাথে সাথে ভাল কোন ল্যাবে গিয়ে পরিক্ষা করানো উচিৎ বা ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে হবে।

ebola_virus

ইবোলা ভাইরাস নির্ণয় করার জন্য যে পরিক্ষা গুলা করতে হবেঃ

১। Antibody-capture enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)

২। Antigen capture detection test.

৩। Serum neutralization test

৪। Reverse transcriptase polymerase chain reaction assay

৫। Electron microscopy virus isolation by cell culture

সূত্রঃ (WHO)

Ebola-Virus

ইবোলা ভাইরাসের চিকিৎসাঃ

১। পানি স্বল্পতা দূর করার জন্য আক্রান্ত রোগীর মুখে বা শিরাই স্যালাইন দিতে হবে পানি স্বল্পতা দূর করার জন্য।

২। রোগীর মৃত্যুর ঝুকি কমাতে ব্লাড প্রোডাক্ট বা ইমিউন থেরাপি দেয়া জেতে পারে।

৩। বর্তমানে এর সঠিক কোন চিকিৎসা আবিষ্কার হয়নি। তবে অনেক আশার বানি শোনা যাচ্ছে। যেমন, যে সকল আক্রান্ত বেক্তি এর মদ্ধে সুস্থ হয়ে উঠেছে তাদের রক্ত নিয়ে একটি ভ্যাকসিন তৈরি করা হচ্ছে এবং এটি খুব কার্যকর হবে বলে জানা গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বক্তব্য অনুযায়ী আগামি কয়েক সপ্তাহের ভেতরে এই ভ্যাকসিনটি পশ্চিম আফ্রিকা সহ কয়েকটি আক্রান্ত স্থানে পাঠানো হবে। এখানে উল্লেখ্য যে ইবোলা ভাইরাস থেকে সেরে ওঠা বেক্তিদের শরীরে যে এন্টিবডি বা প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে সেটি দিয়ে এই ভ্যাকসিন উৎপাদন করা হচ্ছে। আমরা আশাকরি যেন গবেষকদের কথা সত্যি হয়।

ইবোলা থেকে বাঁচার জন্য আপনাকে কি কি করতে হবে বা এই রোগ থেকে বাঁচার উপায় কি?

১। সর্বপ্রথম আপনাকে বন্য প্রানি বা জন্তু জানোয়ার থেকে দূরে থাকতে হবে। কারন এদের রক্ত মাংস থেকে ইবোলা ছরায়। কেউ আক্রান্ত হলে তাকে সবার থেকে আলাদা করে এবং খুব সতর্কতার সাথে চিকিৎসা দিতে হবে।

২। সবসময় সাবান বা এলকোহল মিশ্রিত হ্যান্ডওয়াশ দিতে হাত ধুতে হবে।

৩। অন্য কোন বেক্তি বা রোগীর রক্ত মিশ্রিত আছে এমন কোন বস্তুতে হাত দেবার আগে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যতদূর সম্ভব এর থেকে দূরে থাকায় ভাল।

৪। ইবোলা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এমন কোন প্রাণীকে না ধরাই ভালো।

৫। এরপরেও যদি আপনি আক্রান্ত হয়ে পরেন তবে আপনাকে যত দ্রুত সম্ভব একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ নিতে হব

******ইবোলা ভাইরাসজনিত রোগ*****

----***এবার ৩৫ তম লিখিত তে ইবোলা নিয়ে কোন না কোন প্রশ্ন আসার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করছি এই লেখাটি ইবোলা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জানান দিবে।----***

==== ইবোলা ভাইরাস রোগ====

ভাইরাস ইবোলা রোগ Ebola virus disease (EVD) রক্তপ্রদাহজনিত জ্বর হিসাবে পরিচিত যা একটি তীব্র ভাইরাসঘটিত অসুস্থতা । এটি মূলত একটি আরএনএ ভাইরাস । কঙ্গোর ইবোলা নদীর নাম থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে । এটা ইবোলা ভাইরাস Ebolavirus গোত্রের মধ্যে পাঁচটি প্রজাতির তিনটির কারণে হয়ে থাকে। বাকি দুইটি মানুষকে সংক্রমন করতে সক্ষম নয়। দুর্ভাগ্যবশত, জায়ারে ভাইরাস ইবোলা সবচেয়ে মারাত্মক প্রজাতি এবং বর্তমানে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ হিসাবে একে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভয়াবহ এই ভাইরাসটি মানবদেহে রক্তপাত ঘটায়। লিভার, কিডনিকে অকেজো করে দেয়, রক্তচাপ কমিয়ে দেয়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কমিয়ে দেয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত করে। পূর্বে প্রকাশিত তথ্যানুসারে - এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার ছিল ৯০ শতাংশ ।

====উৎপত্তি====
মধ্য আফ্রিকার উত্তরাংশে কঙ্গোর উপত্যকায় প্রবাহিত ইবোলা নদী থেকে ইবোলাভাইরাসের নামকরণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম ১৯৭৬ সালে এ ভাইরাসের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। মার্বুগ ভাইরাসের সাথে এ ভাইরাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যা ১৯৬৭ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল। উভয় ভাইরাসই ফিলোভিরিডায়ে পরিবারের সাথে জড়িত ও মানবদেহে রোগ সংক্রমণের জন্য দায়ী। ইবোলা ভাইরাসের পাঁচটি ভিন্ন নাম রয়েছে জায়ারে-ইবোলা -, ইবোলাসুদান-, ইবোলাআইভোরি কোস্ট-, ইবোলা-বুন্দিবুগিও। এ নামকরণগুলো ছড়িয়ে পড়া এলাকার-রেস্টন এবং ইবোলা নামানুসারে হয়েছে।

====কোথায় EVD এর আবির্ভাব ঘটে?====

বাদুড়ের অন্ত্রের নালীর মধ্যে এই ভাইরাস আশ্রয় গ্রহণ করে বলে মনে করা হয়, যদিও এটি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার নয়। প্রথম যে মানুষটি এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি সম্ভবত শিকারে গিয়েছিলেন এবং একটি সংক্রমিত পশু খেয়ে

ফেলায় এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পরেন। সুদানে প্রথম এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে মানুষ দ্বারা । প্রথম প্রাদুর্ভাবে সংক্রমিত ২৮৪ জনের মধ্যে ১৫১ জন মারা যান। (শতাংশ ৫৩প্রায়)

==== ইবোলার লক্ষন====

এই ভাইরাসটি কোন মানুষকে আক্রান্ত করার ২ থেকে ২১ দিনের মধ্যেই লক্ষন বা উপসর্গ দেখা দেয়। প্রাথমিক ভাবে আক্রান্ত বেক্তির জ্বর আসবে এবং সাথে সাথে গায়ে ব্যাথা, মাথা ব্যাথা, গলা ব্যাথা, বমি, ডাইরিয়া দেখা দিবে। এছাড়া এর সাথে লিভার ও কিডনীর সমস্যার লক্ষণ থাকবে। কখনো কখনো আক্রান্ত বেক্তির রক্ত বমি হতে পারে। এবং সাথে সাথে দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়বে ও পায়খানা দিয়ে রক্ত যাবে। এই লক্ষণ গুলো দেখা দেবার সাথে সাথে ভাল কোন ল্যাবে গিয়ে পরিক্ষা করানো উচিৎ বা ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে হবে।
আসলে এই ভাইরাস আপনাকে সংক্রামণ করেছে কিনা তা সরাসরি বলা সম্ভব নয়। EVD প্রতিরোধের টিকা বর্তমানে নেই। নেই কোনো কার্যকর ওষুধ। তাই নেই তেমন কোনো চিকিৎসাও।

====ইবোলা ভাইরাসের চিকিৎসা====

১। পানি স্বল্পতা দূর করার জন্য আক্রান্ত রোগীর মুখে বা শিরাই স্যালাইন দিতে হবে পানি স্বল্পতা দূর করার জন্য।
২। রোগীর মৃত্যুর ঝুকি কমাতে ব্লাড প্রোডাক্ট বা ইমিউন থেরাপি দেয়া জেতে পারে।
৩। বর্তমানে এর সঠিক কোন চিকিৎসা আবিষ্কার হয়নি। তবে অনেক আশার বানি শোনা যাচ্ছে। যেমন, যে সকল আক্রান্ত বেক্তি এর মদ্ধে সুস্থ হয়ে উঠেছে তাদের রক্ত নিয়ে একটি ভ্যাকসিন তৈরি করা হচ্ছে এবং এটি খুব কার্যকর হবে বলে জানা গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বক্তব্য অনুযায়ী আগামি কয়েক সপ্তাহের ভেতরে এই ভ্যাকসিনটি পশ্চিম আফ্রিকা সহ কয়েকটি আক্রান্ত স্থানে পাঠানো হবে। এখানে উল্লেখ্য যে ইবোলা ভাইরাস থেকে সেরে ওঠা বেক্তিদের শরীরে যে এন্টিবডি বা প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে সেটি দিয়ে এই ভ্যাকসিন উৎপাদন করা হচ্ছে। আমরা আশাকরি যেন গবেষকদের কথা সত্যি হয়।

====ইবোলা থেকে বাঁচার উপায় কি? ====

১। সর্বপ্রথম আপনাকে বন্য প্রানি বা জন্তু জানোয়ার থেকে দূরে থাকতে হবে। কারন এদের রক্ত মাংস থেকে ইবোলা ছরায়। কেউ আক্রান্ত হলে তাকে সবার থেকে আলাদা করে এবং খুব সতর্কতার সাথে চিকিৎসা দিতে হবে।
২। সবসময় সাবান বা এলকোহল মিশ্রিত হ্যান্ডওয়াশ দিতে হাত ধুতে হবে।
৩। অন্য কোন বেক্তি বা রোগীর রক্ত মিশ্রিত আছে এমন কোন বস্তুতে হাত দেবার আগে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যতদূর সম্ভব এর থেকে দূরে থাকায় ভাল।
৪। ইবোলা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এমন কোন প্রাণীকে না ধরাই ভালো।
৫। এরপরেও যদি আপনি আক্রান্ত হয়ে পরেন তবে আপনাকে যত দ্রুত সম্ভব একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ নিতে হবে।

Ebola virus disease

Ebola, which first appeared in outbreaks in Sudan and DR Congo in 1976, is a severe and often fatal disease with no known specific treatment or vaccine. It has since killed more than 1,500 people in parts of Africa.

SOURCE

In Africa, particular species of fruit bats are considered possible natural hosts for Ebola virus.

TRANSMISSION

Infected bats are thought to transmit the disease to humans, or indirectly through other animals which are hunted for their meat.

DAMAGE

Incubation period is from two to 21 days. Death from the disease is often caused by multiple organ failure and tissue death.

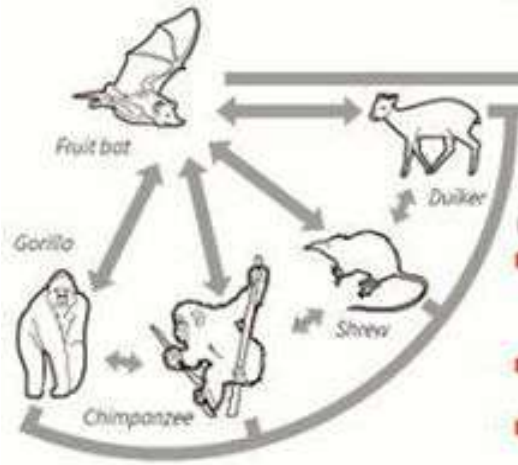

Possible routes

- Close contact with the blood, secretions, organs or other bodily fluids of infected or dead animals
- Consumption of infected bushmeat
- Touching objects that have come in contact with the virus.

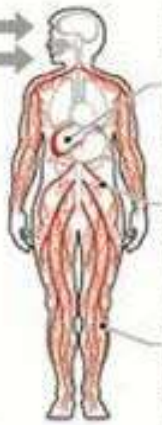

Targets in the body

- Hepatocytes, functional cells of the liver
- Endothelial cells, which form the linings of the blood vessels
- Phagocytes, blood cells that absorb foreign particles

Symptoms

- Fever
- Sore throat
- Severe headache
- Muscle pain
- Intense weakness
- Vomiting
- Diarrhea
- Impaired liver and kidney function
- Internal and external bleeding

Note: List of animals is not exhaustive.

Sources: Centers for Disease Control and Prevention; World Health Organisation

গ্রিস সংকটঃ

==========
Related: International Affairs (Section-C: Problem Solving)
==========

ইউরোপের ভেতরে যে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ চলছে এবং তা থেকে যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বাইরের মানুষের কাছে মনে হতে পারে, এটা গ্রিস ও তার ঋণদাতাদের মধ্যে চলমান খেলার শেষ পর্যায়। বস্তুত, ইউরোপীয় নেতারা শেষ পর্যন্ত চলমান ঋণ-সংকটের আসল রূপ উন্মুক্ত করা শুরু করেছেন। আর এর উত্তরটা সুখকর নয়: এটা যত না টাকা বা অর্থনীতির ব্যাপার, তার চেয়ে বেশি ক্ষমতা ও গণতন্ত্রের ব্যাপার।

অবশ্যই, ট্রয়কা (ইউরোপীয় কমিশন, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল—আইএমএফ) পাঁচ বছর আগে গ্রিসের ওপর যে কর্মসূচি চাপিয়ে দিয়েছিল, তার অর্থনৈতিক প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। এর ফলে দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন ২৫ শতাংশ কমে যায়। আর কোনো মন্দা এমন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল না বা তার ফলাফল এত বিপর্যয়কর ছিল না। উল্লেখ্য, গ্রিসে বর্তমানে তরুণদের বেকারত্বের হার ৬০ শতাংশ।

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, ট্রয়কা এর কোনো কিছুরই দায়িত্ব নেয়নি। আবার তার ভবিষ্যদ্বাণী ও মডেল যে এতটা খারাপ ছিল, তাও তারা স্বীকার করেনি। এর চেয়েও বাজে ব্যাপার হচ্ছে, ইউরোপীয় নেতারা এ থেকে কিছু শেখেননি। ট্রয়কা এখনো দাবি করে যাচ্ছে, গ্রিসকে ২০১৮ সালের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনের ৩ দশমিক ৫ শতাংশ উদ্বৃত্ত অর্জন করতে হবে।

সারা বিশ্বের অর্থনীতিবিদেরাই এই লক্ষ্যকে শাস্তির শামিল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ, এর পেছনে ছুটলে দেশটির মন্দা আরও গভীর হবে। গ্রিস ঋণ পুনর্গঠনে যদি কল্পনাতীত সফলতা দেখায়, তাহলেও দেশটি মন্দার কবলেই থাকবে। সেখানকার ভোটাররা এ সপ্তাহের শেষের দিকে অনুষ্ঠেয় গণভোটে ট্রয়কার লক্ষ্যে সায় দিলে ব্যাপারটা এমনই হবে। বিপুল অঙ্কের প্রাথমিক ঘাটতিকে উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে গ্রিস গত পাঁচ বছরে যে সফলতা দেখিয়েছে, খুব কম দেশই তা করতে পেরেছে। আর গ্রিস সরকারের সাম্প্রতিক প্রস্তাবের কারণে মানুষকে অনেক ভুগতে হলেও ঋণদাতাদের দাবি মেটানোর ক্ষেত্রে তারা বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল।

আমাদের পরিষ্কার থাকতে হবে: গ্রিসকে যে বিপুল অঙ্কের টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল, তার প্রায় কিছুই গ্রিসের হাতে পৌঁছায়নি। বেসরকারি খাতের ঋণদাতাদের ঋণ পরিশোধে এটা ব্যয় হয়েছে, এর মধ্যে আছে জার্মান ও ফরাসি ব্যাংকগুলো। গ্রিস সামান্য কিছু পেলেও নিজেদের ব্যাংক-ব্যবস্থাকে বাঁচাতে তাকে অনেক অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। যে টাকা দাবি করা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও অন্যান্য 'আনুষ্ঠানিক' ঋণদাতাদের তা দরকার নেই। ব্যবসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যে টাকা পাওয়া যাবে, তা খুব সম্ভবত আবার গ্রিসকেই ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে। কিন্তু আবারও বলতে হয়, এটা টাকার ব্যাপার নয়। বিষয়টা হচ্ছে, 'সময়সীমা' আরোপ করে গ্রিসকে নতি স্বীকারে ও গ্রহণযোগ্য নয়—এমন বিষয় গ্রহণ করতে বাধ্য করা। শুধু কৃচ্ছ্রসাধন নয়, আরও কিছু পশ্চাদ্গামী ও শাস্তিমূলক নীতি গ্রহণেও তাকে বাধ্য করা হয়েছে।

কিন্তু ইউরোপ কেন এটা করবে? ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা গণভোটের বিরোধিতা করছেন কেন? আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলকে গ্রিসের ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময় ছিল ৩০ জুন, সেটাই বা আইএমএফ পেছানোর বিরুদ্ধে ছিল কেন? ইউরোপ কি তাহলে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক নয়? গ্রিসের জনগণ দেশটিতে চলমান কৃচ্ছ্রসাধন শেষ করতে চায়—এমন একটি দলকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিল এ বছরের জানুয়ারিতে। সরকার যদি শুধু তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চাইত, তাহলে তারা ইতিমধ্যে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করত। কিন্তু আর্থিক পুনরুদ্ধার (বেইলআউট) কর্মসূচি বাস্তবায়নে ঋণদাতা দেশ ও সংস্থাগুলো গ্রিসকে যে প্রস্তাব দিয়েছে, গ্রিসের সরকার সে-বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার জনগণের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে। এটি তাদের দেশের ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এ বিষয়ে জনগণের রায় নেওয়ার ব্যাপারটা ইউরোজোনের রাজনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আসলে এই ইউরোজোন কখনোই গণতান্ত্রিক ব্যাপার ছিল না। এর অধিকাংশ সদস্যদেশই নিজেদের মুদ্রার সার্বভৌমত্ব ইউরোপিয়ান

সেন্ট্রাল ব্যাংকের (ইসিবি) হাতে তুলে দেওয়ার আগে জনগণের রায় নেয়নি। সুইডেন তার জনগণের রায় চাইলে সুইডিশরা 'না' বলেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, তাদের দেশের মুদ্রানীতি যদি এমন একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যারা একনিষ্ঠভাবে শুধু মূল্যস্ফীতি নিয়ে কাজ করে, তাহলে তাদের দেশে বেকারত্ব বাড়বে (আর সেটা হলে আর্থিক স্থিতিশীলতায় যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হবে না)। আর এতে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, ইউরোজোনের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক মডেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্ষমতা সম্পর্কের ভিত্তিতে, যার কারণে শ্রমিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। আর এটা তো সত্য, ইউরোজোন এই সম্পর্ককে প্রাতিষ্ঠানিক করার ১৬ বছর পর আমরা গণতন্ত্রহীনতা দেখছি। অনেক ইউরোপীয় নেতাই গ্রিসের বামপন্থী প্রধানমন্ত্রী আলেক্সিস সিপ্রাসের পতন দেখতে চান। সর্বোপরি, যে রাজনীতি সারা বিশ্বের অনেক উন্নত দেশেই অসমতা বাড়িয়েছে, তার বিরোধিতা করে গ্রিসে এমন সরকার থাকলে তা এই রাজনীতির জন্য অস্বস্তিকরই বটে। গ্রিসের এই সরকার আবার সম্পদের অপরিসীম ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরতে চায়। মনে হয়, এই অগণতান্ত্রিক শক্তি এটা বিশ্বাস করে যে গ্রিসের বামপন্থী সরকারকে জনগণের ম্যান্ডেটবিরোধী চুক্তি করতে বাধ্য করে তারা তাকে গদি থেকে নামাতে পারবে।

গ্রিসের নাগরিকরা ৫ জুলাই কীভাবে ভোট দেবেন, সে বিষয়ে তাঁদের উপদেশ দেওয়া কঠিন। কারণ, ট্রয়কার শর্ত মেনে নেওয়া বা না-নেওয়া কোনোটিই খুব সহজ ব্যাপার হবে না। তারা যা-ই করুক, উচ্চ মাত্রার ঝুঁকি থাকবেই। তারা 'হ্যাঁ' ভোট দিলে দেশটি অনিঃশেষ মন্দার কবলে পড়বে। সেটা হলে দেশটি একদম নিঃস্ব হয়ে যাবে, যারা নিজেদের সব সম্পদ বিক্রি করে দিতে ও যাদের মেধাবী তরুণেরা দেশান্তরি হতে বাধ্য হবে, তাদের ঋণ তখন হয়তো মওকুফ হয়ে যাবে। হয়তো মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়ে গ্রিস শেষমেশ বিশ্বব্যাংকের সহায়তা পাবে। আগামী দশকে হয়তো এ রকম হবে বা তারও পরের দশকে সেটা হতে পারে।

অন্যদিকে, গ্রিকরা 'না' ভোট দিলে দেশটি অন্তত তার শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের নিয়তি নিজেই নির্ধারণ করার সুযোগ পাবে। সেটা হলে গ্রিস নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ পাবে। সেটা হয়তো অতীতের মতো অত সমৃদ্ধিশালী হবে না, কিন্তু বর্তমানে যে অন্যায্য অত্যাচার তাদের সইতে হচ্ছে, তা থেকে তারা অন্তত রেহাই পাবে।

Important but Confusing day….(দিবস(

EURO day = 1 January
Civil Service day = 1 September

বাংলা ভাষা দাবি দিবস =11 March
রাষ্টভাষা দিবস =21 February

জাতীয় শোক দিবস =15 August
জাতীয় শহীদ দিবস =21 February
আন্তর্জার্তিক মাতৃভাষা দিবস =21 February

ছয় দফা দিবস =7 June
পররাষ্ট মন্ত্রণালয় দিবস =18 April

শহীদ আসাদ দিবস =20 January
মতিউর দিবস = অভুর্থান দিবস-গণ /24 January

নুর হোসেন দিবস =10 November
সৈরতন্ত্রের পতন দিবস = গণতন্ত্রের উত্থান দিবস /6 December

আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস =26 January
জাতীয় আয়কর দিবস =15 September
জাতীয় মূসক) VAT) দিবস =10 July

শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে সংবিধান এর =17 অনুচ্ছেদ
শিক্ষা দিবস =17 September
শিক্ষক দিবস =19 January
শিশু দিবস =17 March (Birth of Bangabandhu)

১. বাংলাদেশকে জানুন

প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যে ভরা আমাদের এই বাংলাদেশ। এই দেশে পরিচিত অপরিচিত অনেক পর্যটক-আকর্ষক স্থান আছে। এর মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ঐতিহাসিক মসজিদ এবং মিনার, পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত, পাহাড়, অরণ্য ইত্যাদি অন্যতম। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি এলাকা বিভিন্ন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিশেষায়িত । বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর পূর্ব অংশে অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তর সীমানা থেকে কিছু দূরে হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য এবং মায়ানমারের পাহাড়ী এলাকা। অসংখ্য নদ-নদী পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ প্রধানত সমতল ভূমি। দেশের উল্লেখযোগ্য নদ-নদী হলো- পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনা ও কর্ণফুলী।একেকটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন ধরনের। বাংলাদেশ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেশ যার বাস সুন্দরবনে। এছাড়াও এখানে রয়েছে লাল মাটি দিয়ে নির্মিত মন্দির। এদেশে উল্লেখযোগ্য পর্যটন এলাকার মধ্যে রয়েছে: শ্রীমঙ্গল, যেখানে মাইলের পর মাইল জুড়ে রয়েছে চা বাগান। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে-ময়নামতি, মহাস্থানগড় এবং পাহাড়পুর। রাঙ্গামাট, কাপ্তাই এবং কক্সবাজার প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য খ্যাত। সুন্দরবনে আছে বন্য প্রাণী এবং পৃথিবীখ্যাত ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এ বনাঞ্চলে অবস্থিত ।

এক নজরে বাংলাদেশ

আনুষ্ঠানিক নাম: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয়তা: জাতি হিসেবে বাঙ্গালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন।

সাপ্তাহিক ছুটি: শুক্রবার ও শনিবার। কিছু কিছু অফিস শনিবার খোলা থাকে।

আন্তর্জাতিক ডায়ালিং কোড : +৮৮০

আন্তর্জাতিক সময় অঞ্চল: বিএসটি (জিএমটি +৬ ঘন্টা)

জনগণ:

জনসংখ্যা : ১৫.২ কোটি পুরুষ : ৭.৬৩৫ কোটি, মহিলা : ৭.৬১৫ কোটি

শিক্ষার হার : ৬০%

ভাষা : বাংলা (জাতীয় ভাষা) - ৯৫% জনগণ, অন্যান্য ভাষা - ৫%, ইংরেজির ব্যবহার প্রচলিত আছে।

ধর্ম: মুসলিম - ৮৬.৬%, হিন্দু - ১২.১% ,বৌদ্ধ - ০.৬% , খ্রিস্টান - ০.৪% এবং অন্যান্য - ০.৩%.

বয়স-ভিত্তিক বন্টন :

০-১৪ বছর : ৩৩.৮% (পুরুষ ২,৩০,৬৯,২৪২, নারী ২,১৯,৯৫,৪৫৭)

১৫-৬৪ বছর : ৬২.৮% (পুরুষ ৪,২৯,২৪,৭৭৮, নারী ৪,০৮,৭৩,০৭৭)

৬৫ বছরের উপরে : ৩.৪% (পুরুষ ২৪,৪৪,৩১৪, নারী ২০,৬৯,৮১৬)

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার: ১.৩৭%

জন্মহার: প্রতি হাজারে ২৫.১২ জন

মৃত্যুহার : প্রতি হাজারে ৮.৪৭ জন

লিঙ্গ বন্টন :

লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি ১০০ জন নারীর বিপরীতে পুরুষ) : ১০০.৩

উর্বরতা হার : নারীপ্রতি ২.৩ শিশু

জাতিগোষ্ঠী: বাঙালি : ৯৮%, ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী : ২%

প্রধান নৃ গোষ্ঠীসমূহ : চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, গারো, মনিপুরী, ত্রিপুরা, তনচংগা

ভৌগোলিক অবস্থান : ২৬° ৩৮' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২০° ৩৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ০১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯২° ৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ

আয়তন : ১৪৭,৫৭০ বর্গকিমি (ভূমি : ১৩৩,৯১০ বর্গকিমি, জলজ : ১০,০৯০ বর্গকিমি)

সীমানা : উত্তরে ভারত (পশ্চিমবঙ্গ আর মেঘালয়) পশ্চিমে ভারত (পশ্চিম বঙ্গ) পূর্বে ভারত (ত্রিপুরা ও আসাম) এবং মিয়ানমার, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর

সীমানা দৈর্ঘ্য : ৪,২৪৬ কিমি. (মায়ানমার : ১৯৩ কিমি., ভারত : ৪,০৫৩ কিমি.)

সমুদ্র সীমানা : ৫৮০ কিমি. মহীসোপান : মহাদ্বীপীয় মার্জিন বাইরের সীমা অবধি; বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা : ২০০ নটিক্যাল মাইল , সমুদ্র এলাকা : ১২ নটিক্যাল মাইল

ভুমির ধরন : প্রধানত সমভুমি, পূর্ব ও দক্ষিনপূর্বে পাহাড়ি ভুমি

রাজধানী : ঢাকা

এলাকাভিত্তিক পরিসংখ্যান :

বিভাগ ৭টি - ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর

জেলা ৬৪ টি, উপজেলা ৪৮৮ টি

প্রধান নদীসমূহ : পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, তিস্তা, শীতলক্ষ্যা, রূপসা, মধুমতি, গড়াই, মহানন্দা

জলবায়ু:

জলবায়ুর ধরন : উপ ক্রান্তীয় মৌসুমি বায়ু

গড় তাপমাত্রা : শীতকালে ১১° সি - ২০° সি (অক্টোবর - ফেব্রুয়ারি)

গ্রীষ্মকালে ২১° সি - ৩৮° সি (মার্চ - সেপ্টেম্বর)

বৃষ্টিপাত : ১১০০ মিমি. - ৩৪০০ মিমি. (জুন - আগস্ট)

আর্দ্রতা : সর্বোচ্চ ৯৯% (জুলাই), সর্বনিম্ন ৩৬% (ডিসেম্বর - জানুয়ারি)

অর্থনীতি অর্জন : বাংলাদেশ D8 এর সদস্য আর গোল্ডম্যান স্যাস কর্তৃক “Next Eleven Economy of the world” হিসেবে বিবেচিত

জিডিপি : মাথাপিছু $১,৩১৪ (২০১৫) (সূত্র)

জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%) : ৬.৫১ (২০১৪-২০১৫)

দরিদ্রতার হার : ২৫% (প্রতিদিন $২ এর নিচে বসবাসকারী জনগণ)

আন্তর্জাতিক অনুদান নির্ভরতা: ২%

প্রধান ফসল : ধান, পাট, চা, গম, আঁখ, ডাল, সরিষা, আলু, সবজি, ইত্যাদি।

প্রধান শিল্প : পোশাকশিল্প (পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম শিল্প), পাট (বিশ্বের সর্ববৃহৎ উৎপাদনকারী), চা, সিরামিক, সিমেন্ট, চামড়া, রাসায়নিক দ্রব্য, সার, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত, চিনি, কাগজ, ইলেক্ট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী, ঔষধ, মৎস্য।

প্রধান রপ্তানি : পোশাক (পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম শিল্প), হিমায়িত চিংড়ি, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি, পাট ও পাটজাত দ্রব্য (পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রথম), সিরামিক্স, আইটি আউটসোর্সিং, ইত্যাদি।

প্রধান আমদানি : গম, সার, পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি, তুলা, খাবার তেল, ইত্যাদি।

প্রধান খনিজ সম্পদ : প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা, চিনামাটি, কাচ বালি, ইত্যাদি।

মুদ্রা : টাকা (বিডিটি - প্রতীক ৳) ১০০০, ৫০০, ১০০, ৫০, ২০, ১০, ৫, ২, ও ১ টাকার নোট আর

৫০, ২৫, ১০, ৫, ২৫, ১০, ৫ ও ১ পয়সা

শ্রমিক বন্টন: ৫.৪১ কোটি , পুরুষঃ ৩.৭৯ কোটি, নারীঃ ১.৬২ কোটি (সূত্র : বিইএস)

শিল্প-ভিত্তিক শ্রমিক বন্টন: কৃষি : ৪৮.৪%, শিল্প : ২৪.৩%, অন্যান্য : ২৭.৩% সুত্র : বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো

পরিবহন ব্যবস্থা : সড়ক, আকাশপথ, রেল, নদীপথ

ইপিজেড : ঢাকা, উত্তরা, আদমজী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, কর্ণফুলী, এবং মংলা।

ঐতিহাসিক দিনসমূহস্বাধীনতা দিবস: ২৬ মার্চবিজয় দিবস: ১৬ ডিসেম্বর শহীদ দিবস: ২১ ফেব্রুয়ারি (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও পরিচিত)

পর্যটনপর্যটন আকর্ষণ: ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কুয়াকাটা, বগুড়া, খুলনা, সুন্দারবন, সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর, এবং কুমিল্লা

বিমানবন্দর: ঢাকা (আন্তর্জাতিক), চট্টগ্রাম (আন্তর্জাতিক), সিলেট (আন্তর্জাতিক), যশোর, রাজশাহী, সৈয়দপুর, বরিশাল, কক্সবাজার আরও তথ্য: বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন তথ্য প্রযুক্তি (আইটি), জাতীয় ডোমেইন: .bd

ইন্টারনেট অনুপ্রবেশ : ৪.৪৬ কোটি (জনসংখ্যার ২৯%)

মোবাইল ব্যাবহারকারী : ১২ কোটি ৩৭ লক্ষ (মার্চ ২০১৫), সুত্র: www.btrc.gov.bd

মোবাইল অনুপ্রবেশ : জনসংখ্যার ৮০%

বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রম

জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর ৮ম বৃহত্তম দেশ,

৪র্থ বৃহৎ মুসলিম দেশ, মুসলিম সংখাগরিষ্ঠ দেশ হিসাবে বিশ্বের ৩য় দেশ,

জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে বিশ্বের ৭ম বৃহৎ দেশ,

১০ কোটির উপর জনসংখ্যার দেশ হিসাবে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ

গাঙ্গেয় বদ্বীপে অবস্থিত, যা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপ, কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত

জিডিপির দিক থেকে, বাংলাদেশের অর্থনীতি পৃথিবীর ৩৫তম দেশ কিন্তু জিডিপি বৃদ্ধির দিক থেকে পৃথিবীর ২৮তম অর্থনীতি

বাংলাদেশের পোশাকশিল্প পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম পোশাকশিল্প

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাট উৎপাদনকারী দেশ (পাট উদ্ভিজ্জ আঁশের মধ্যে উৎপাদনের দিক দিয়ে ২য়, তুলার পরেই অবস্থান)

সুন্দরবন (বাংলাদেশ ও ভারত) পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নূন্যতম মজুরি পৃথিবীর সর্বনিম্ন

একনজরে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহঃ

১। বাজেট উপস্থাপন -- ৪ জুন, ২০১৫(পাস হবে-৩০ জুন)

২। বাংলাদেশের -- ৪৫তম বাজেট (সরকারের -- ১৬তম ,অর্থমন্ত্রীর-- ৯ম)

৩। GDP -- ১৭,১৬,৭০০কোটি টাকা

৪। ADP -- ৯৭,০০০ কোটি টাকা। (GDP এর 5.7 %)

৫। বাজেটের মুল ব্যয় ধরা হয়েছে-- ২,৯৫,১০০ কোটি টাকা । (GDP এর 17.2 %)

৬। রাজস্ব আয়ের পরিকল্পনা --২ লাখ ৮ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা (GDPএর 12.1 %)

৭। জিডিপি প্রবৃদ্ধি --৭ শতাংশ (২০১৫-১৬)

৮। মূল্যস্ফীতি --৬.২ শতাংশ।

৯। বাজেটের ঘাটতি ধরা হয়েছে – ৮৬ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা [অনুদান ছাড়া] (GDP এর ৫%)

--- ৮০ হাজার ৮৫৭ কোটি টাকা [অনুদান সহ]

১০। ব্যাংক ঋণ --৩৮ হাজার ৫২৩ কোটি ।

১১। সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত খাত –জনপ্রশাসন খাত (মোট ব্যায়ের ১৯ দশমিক ২ শতাংশ)

১২। করমুক্ত আয়সীমাঃ-

=>ব্যক্তিশ্রেণী : ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ।

=>নারী ও ৬৫ বছরের অধিক বয়স্ক : ৩ লাখ টাকা।

=> প্রতিবন্ধী ব্যক্তি : ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।

=>গেজেটভূক্ত যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা : ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা।

১৩। কর হার

করযোগ্য আয়----------কর হার

২,৫০,০০০ পর্যন্ত ----------০%

পরবর্তী ৪,০০,০০০----------১০%

পরবর্তী ৫,০০,০০০----------১৫%

পরবর্তী ৬,০০,০০০----------২০%

পরবর্তী ৩০,০০,০০০----------২৫%

অবশিষ্ট অংশ----------৩০%

১৪। কর্পোরেট টেক্সঃ-

=> তালিকাভুক্ত কোম্পানি- ২৫% (বিদ্যমান- ২৭.৫%)

=> অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানি- ৩৫% (বিদ্যমান- ৩৫%)

=>তালিকাভুক্ত ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্টান- ৪০% (বিদ্যমান- ৪২.৫%)

=>অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্টান - ৪০.৫% (বিদ্যমান- ৪২.৫%)

১৫। মাথাপিছু আয়–১৩১৪ মার্কিন ডলার

২. বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের বর্তমান আইন ও বিচার ব্যবস্থা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় দুইশো বছরের বৃটিশ শাসনের কাছে বহুলাংশে ঋণী, যদিও এর কিছু কিছু উপাদান প্রাক-বৃটিশ আমলের হিন্দু এবং মুসলিম শাসন ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

এটি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে পর্যায়ক্রমে বিকাশ লাভ করে। এ বিকাশের প্রক্রিয়াটি আংশিক স্বদেশী ও আংশিক বিদেশি এবং গঠন প্রণালি, আইনগত ধারণা ও নীতিমালার ক্ষেত্রে ইন্দো-মোঘল এবং বৃটিশ উভয় ব্যবস্থার সমন্বয়ে উদ্ভূত একটি মিশ্র আইনি ব্যবস্থা। ভারতীয় উপমহাদেশের বৃটিশ আমলের পূর্ববর্তী পাঁচশত বছরেরও বেশি মুসলিম ও হিন্দু শাসনের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। প্রত্যেকটি শাসনামলের নিজস্ব স্বতন্ত্র আইন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

প্রায় পনের’ শ বছর আগে এবং খ্রিস্টীয় যুগ আরম্ভ হওয়ার পরে হিন্দু আমলের বিস্তৃতি ঘটে। সে সময় প্রাচীন ভারতবর্ষ কতিপয় স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং রাজা ছিলেন প্রত্যেকটি রাজ্যের সর্বময় কর্তা। বিচার ব্যবস্থা তথা ন্যায় বিচার প্রসঙ্গে রাজা ন্যায় বিচারের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতেন এবং তাঁর রাজত্বে বিচার প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হতেন।

১১০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান শাসকদের আক্রমণ ও বিজয়ের ফলে মুসলমান আমলের শুরু হয়। একাদশ শতাব্দীর শুরুতে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে মুসলমান শাসকদের আক্রমণের মুখে হিন্দু রাজত্ব পর্যায়ক্রমে খণ্ড বিখণ্ড হতে শুরু করে। যখন মুসলমানরা সকল রাজ্য জয় করে, তখন তারা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের উপর ভিত্তি করে তৈরি মতবাদও তাদের সঙ্গে করে এনেছিল। পবিত্র কোরআন অনুসারে সার্বভৌমত্ব সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাতে ন্যস্ত এবং রাজা হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশ পালনকারী এক অনুগত দাস। শাসক ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর পছন্দনীয় প্রতিনিধি এবং জিম্মাদার।

ইংরেজ আমলে বৃটিশ রাজকীয় সনদপ্রাপ্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু কর্মকর্তা ভারতের প্রাচীন আইন ও বিচার ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ভার গ্রহণ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পর্যায়ক্রমে বোম্বে, মাদ্রাজ এবং কলকাতার দখল গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, যা পরবর্তী সময়ে ‘প্রেসিডেন্সি টাউন’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কোম্পানি বিচার প্রশাসনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিল। রাজা প্রথম জর্জ কর্তৃক ইস্যুকৃত ১৭২৬ সালের সনদ ভারতে ইংরেজ আইন ও বিচার ব্যবস্থা চালুর ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যের জন্য অনুমোদন পায়। পরবর্তী কালে এ সনদের ত্রুটিসমূহ দূর করার লক্ষ্যে রাজা দ্বিতীয় জর্জ ১৭৫৩ সালে নতুন সনদ ইস্যু করেন। এ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য হাউজ অব কমনস- এর গোপনীয় কমিটি হস্তক্ষেপ করে এবং রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৭৭৩ পাশ করে, যার অধীন রাজা কলকাতায় বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৭৭৪ সালে একটি পৃথক সনদ ইস্যু করে। পরবর্তী সময়ে ১৮০১ সালে মাদ্রাজে এবং ১৮২৪ সালে বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ভারতে ১৮৫৩ সালে প্রথম আইন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং একটি সর্ব ভারতীয় আইন সভা সৃষ্টি করা হয় যার প্রণীত আইন সকল আদালতের উপর কার্যকর ছিল। এ সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলুপ্ত করা হয় এবং ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন তথা সিপাহী বিপ্লবের পর ১৮৫৮ সালেই ভারতের শাসনভার বৃটিশ রাজা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। দেওয়ানী কার্যবিধি আইন, ফৌজদারী কার্যবিধি আইন, দণ্ডবিধি, সাক্ষ্য আইন ইত্যাদি সেই সময় প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং সাধারণ আইনি কাঠামোয় বৃটিশ আইন সভা ১৮৬১ সালে ভারতীয় হাই কোর্ট আইন প্রণয়ন করে যার মাধ্যমে তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরে (কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ) প্রতিষ্ঠিত বিদ্যমান সুপ্রীমকোর্ট প্রতিস্থাপন করে হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়।

হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার পর দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের একটি নিয়মিত ক্রমঅধিকারতন্ত্র দেওয়ানি আদালত আইন, ১৮৮৭ এবং ফৌজদারি কার্যবিধি আইন, ১৮৯৮ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভারতীয় উপ-মহাদেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে বিদ্যমান বর্তমান ব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি হচ্ছে এই দেওয়ানি আদালত আইন, ১৮৮৭ এবং ফৌজদারি কার্যবিধি আইন, ১৮৯৮। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট বৃটিশ আইন সভা ভারত ও পাকিস্তানকে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ এর বলে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। এ আইন অনুসারে, স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের জন্য নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত এ দুই দেশের সরকার পরিচালিত হবে ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর মাধ্যমে। বিচার বিভাগের গঠন প্রণালি ১৯৪৭ সনের আগে যেরূপ ছিল প্রধানত তাই রয়ে গিয়েছে।

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন সরকারের গঠন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে দেয়। ফলে শাসন ব্যবস্থা একক বা কেন্দ্রীয় শাসন পদ্ধতি হতে ফেডারেল পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয়। এ আইনের বিধি অনুসারে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশেই নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ফেডারেল আদালত চালু রাখা হয়।

পাকিস্তান গণপরিষদ 'প্রিভি কাউন্সিল (অধিক্ষেত্র বাতিল) আইন, ১৯৫০' পাশ করে যা পাকিস্তানের ফেডারেল আদালত হতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল দায়েরের ব্যবস্থাকে বাতিল করেছিল। ১৯৫৬ সালে নতুন সংবিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে এর আওতায় প্রদেশসমূহে হাই কোর্ট এবং কেন্দ্রে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফেডারেল আদালত পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে কাজ করেছে। পাকিস্তানের এ সংবিধান ১৯৫৮ সালে বাতিল করা হয়েছিল এবং ১৯৬২ সালে নতুন আরেকটি সংবিধান চালু করা হয়, কিন্তু সমগ্র বিচার কাঠামো একই রয়ে যায়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ একটি সংবিধান গ্রহণ করে যাতে আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রীম কোর্টের গঠন প্রণালি ও কার্যক্রম বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের অধঃস্তন বিচার বিভাগ, দেওয়ানি ও ফৌজদারি ব্যবস্থা উভয়ের উৎপত্তি হয়েছিল দেওয়ানী আদালত আইন, ১৮৮৭ এবং ফৌজদারী কার্যবিধি আইন ১৮৯৮ থেকে। এছাড়াও বাংলাদেশে আরো কতিপয় অন্যান্য বিশেষ আইন আছে, যা কিছু বিশেষ আদালতের ভিত্তিস্বরূপ কাজ করে, যেমন - শ্রম আদালত, শিশু অপরাধ আদালত, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি।

৩. বাংলাদেশের দারিদ্র্য মানচিত্র

দেশে যত গরিব মানুষ আছে, তার এক-তৃতীয়াংশেরই বাস ঢাকা বিভাগে। আর সবচেয়ে কম দরিদ্র মানুষ থাকে সিলেট বিভাগে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), বিশ্বব্যাংক এবং জাতিসংঘের খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) যৌথভাবে বাংলাদেশের দারিদ্র্য মানচিত্র প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, দেশের দরিদ্র মানুষের ৩২ দশমিক ৩ শতাংশই বাস করে ঢাকা বিভাগে।

আর সিলেটে বাস করে মাত্র ৫ দশমিক ৭ শতাংশ দরিদ্র মানুষ। বেশি মানুষ বাস করে বলেই ঢাকা বিভাগে গরিব মানুষের সংখ্যাও বেশি।

অন্যদিকে জেলাওয়ারি হিসাবে কুষ্টিয়ায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে কম, ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। আর সবচেয়ে বেশি কুড়িগ্রামে। এই জেলার ৬৩ দশমিক ৭ শতাংশ মানুষই গরিব।

খানা আয়-ব্যয় জরিপে উল্লিখিত দারিদ্র্য হারের সঙ্গে দারিদ্র্য মানচিত্রের তথ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। মানচিত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে খানা জরিপ ও আদমশুমারির পরিসংখ্যান সমন্বয় করে। খানা জরিপ অনুযায়ী, ২০১০ সালে দেশের দারিদ্র্য হার ছিল ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ। আর মানচিত্র অনুযায়ী, এ হার ৩০ দশমিক ৭ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক সূত্র বলছে, দারিদ্র্য হারের গরমিলের কারণ হলো, খানা জরিপ করা হয় কিছু নির্ধারিত খানা ধরে। আর আদমশুমারিতে দেশের প্রত্যেক মানুষকে গণনা করা হয়। দারিদ্র্য মানচিত্র প্রণয়নে খানা জরিপ থেকে গরিব মানুষের শুধু মৌলিক চাহিদার উপাত্তগুলো নেওয়া হয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার সঙ্গে খানা জরিপের মৌলিক চাহিদার উপাত্তগুলো সমন্বয় করতে গিয়েই দারিদ্র্য হারে কিছুটা হেরফের হয়েছে। আদমশুমারি অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যাকে দারিদ্র্য হার দিয়ে ভাগ করলে গরিব মানুষের হিসাব পাওয়া যাবে। সে অনুযায়ী দেশে এখন দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি।

দারিদ্র্য মানচিত্রের বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্বব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন প্রথম আলোকে জানান, গরিব মানুষের হার কমাতে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। গরিব মানুষের আয় বাড়লে দারিদ্র্য হার কমবে। গরিব মানুষের আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। আর গরিবের সংখ্যা কমে যাওয়ার পর আয়-বৈষম্য কমানোর নীতি-সহায়তা দিতে হবে। বর্তমানে রাষ্ট্র ধনী মানুষকে আরও ধনী হওয়ার নীতি-সহায়তা দিয়ে থাকে।

একই রকম মত দিয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণা পরিচালক বিনায়ক সেন বলেন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে কাজের সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি। তাই সেখানে বেশি গরিব মানুষ ভিড় করে। যদি অন্য বিভাগগুলোতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, তবে দারিদ্র্য হার কিছুটা দ্রুত গতিতে কমানো যেত। তাঁর মতে, দারিদ্র্য হার কমানোর প্রবণতা ত্বরান্বিত করতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্য কৃষি, শ্রমঘন শিল্প ও সেবা খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে।

প্রকাশিত দারিদ্র্য মানচিত্র অনুযায়ী, সার্বিকভাবে ঢাকা বিভাগের পর বেশি গরিব মানুষ বাস করে চট্টগ্রামে, ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ। এ ছাড়া রংপুর বিভাগে ১৫ শতাংশ, রাজশাহী বিভাগে ১১ দশমিক ৬ শতাংশ, খুলনা বিভাগে ১১ দশমিক ৪ শতাংশ এবং বরিশাল বিভাগে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ।

কোনো বিভাগে বসবাসকারী মানুষের কত শতাংশ দরিদ্র, সে তথ্যেরও উল্লেখ রয়েছে মানচিত্রে। তাতে দেখা যাচ্ছে, রংপুর বিভাগে যত মানুষ বাস করে, তার ৪২ শতাংশই দরিদ্র। এরপর জনসংখ্যার দিক থেকে বেশি গরিব মানুষের বাস বরিশালে,

৩৮ দশমিক ৩ শতাংশ। এর বাইরে খুলনার মোট জনসংখ্যার ৩১ দশমিক ৯ শতাংশ, ঢাকার ৩০ দশমিক ৫ শতাংশ, রাজশাহীর ২৭ দশমিক ৪ শতাংশ, চট্টগ্রামের ২৬ দশমিক ১ শতাংশ এবং সিলেটের ২৫ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ দরিদ্র।

জেলা পর্যায়ের দারিদ্র্য পরিস্থিতিও উঠে এসেছে মানচিত্রে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ঢাকা বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষ বাস করে শরীয়তপুরে, ৫২ দশমিক ৬ শতাংশ আর কম ঢাকা জেলায়, ১৫ দশমিক ৭ শতাংশ। চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে দরিদ্র মানুষ বেশি চাঁদপুরে, ৫১ শতাংশ এবং কম নোয়াখালীতে, ৯ দশমিক ৬ শতাংশ। রাজশাহী বিভাগে বেশি দরিদ্র মানুষের বাস সিরাজগঞ্জে, ৩৮ দশমিক ৭ শতাংশ এবং কম বগুড়ায়, ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ। রংপুর বিভাগে বেশি দরিদ্র কুড়িগ্রামে, ৬৩ দশমিক ৭ শতাংশ এবং কম পঞ্চগড়ে, ২৬ দশমিক ৭ শতাংশ। খুলনা বিভাগে বেশি দরিদ্র সাতক্ষীরায়, ৪৬ দশমিক ৩ শতাংশ এবং কম কুষ্টিয়ায়, ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। সিলেটে দারিদ্র্য বেশি সুনামগঞ্জে, ২৬ শতাংশ এবং কম সিলেট জেলায়, ২৪ দশমিক ১ শতাংশ। বরিশালে বেশি দরিদ্র মানুষের বাস বরিশাল জেলায়, ৫৪ দশমিক ৮ শতাংশ আর কম বরগুনায়, ১৯ শতাংশ।

আবার ঢাকা বিভাগের দরিদ্র মানুষের ৫৫ শতাংশের বেশি বাস করে ওই বিভাগের ১০টি দরিদ্রতম উপজেলায়। অন্যদিকে ধনী ১০টি উপজেলায় মোট মানুষের মাত্র ৪ শতাংশ দরিদ্র। একইভাবে চট্টগ্রামের দরিদ্র মানুষের অর্ধেকই বাস করে ওই বিভাগের ছয়টি দরিদ্রতম উপজেলায়। আর ছয়টি ধনী উপজেলায় চার শতাংশের কম দরিদ্র মানুষ আছে।

সবচেয়ে দরিদ্র বিভাগ রংপুরেও এমন চিত্র দেখা গেছে। ওই বিভাগের ১১টি ধনী উপজেলায় দারিদ্র্যের হার জাতীয় গড়ের নিচে। অন্যদিকে দরিদ্রতম সাত উপজেলায় দারিদ্র্য হার জাতীয় গড়ের দ্বিগুণ। আবার সিলেটে যদিও দারিদ্র্য হার কম, তবু গোয়াইনঘাট উপজেলার ৫০ শতাংশ মানুষই গড় দারিদ্র্য হারের নিচে।

দারিদ্র্য হার বেশি আবার কৃষিকাজে মজুরিও কম–এমন অঞ্চলও চিহ্নিত করা হয়েছে দারিদ্র্য মানচিত্রে। রংপুর, টাঙ্গাইল, যশোর ও ফরিদপুর অঞ্চলে কৃষিকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা কম মজুরি পান। তাঁদের গড় মজুরির পরিমাণ প্রতিদিন ৮৬ থেকে ১০২ টাকা।

আবার দারিদ্র্যঘন এলাকার মানুষের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার কেমন, তার একটি চিত্রও তুলে আনা হয়েছে মানচিত্রে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বান্দরবান, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামের।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান। বিবিএসের মহাপরিচালক গোলাম মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব নজিবুর রহমান, ডব্লিউএফপির এদেশীয় পরিচালক ক্রিস্টা রেডার এবং বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ সালমান জায়েদী।

৪. আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশ

স্বাধীনতার প্রায় সাড়ে তিন বছর পর ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য হয় বাংলাদেশ। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৮ সালে। বর্তমানে ১২২টি দেশের ৬৯ টি মিশনে এক লাখ সাত হাজার ৮০৫ জন শান্তিরক্ষী বিভিন্ন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন। এরমধ্যে ২০৫ জন নারীসহ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর সংখ্যা ৯ হাজার ৫৯২ জন। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ১২৪ জন শান্তিরক্ষী বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালনের সময় নিহত হয়েছেন। এরমধ্যে ২০১৪ সালের জুন থেকে চলতি বছরের মে পর্যন্ত সময়েই নিহত হয়েছেন ছয় জন।

ছয় জন প্রয়াত শান্তিরক্ষীর পরিবার এবং ১০ জন আহত শান্তিরক্ষীকে সম্মাননা দেন।

বিশ্ব শান্তির জন্য জীবন উত্সর্গ করছেন বাংলাদেশের রক্ষীরা

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উত্সর্গ করছেন বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা। সর্বশেষ আফ্রিকার দেশ মালিতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত এক বাংলাদেশি সেনাসদস্য নিহত ও আরেকজন আহত হয়েছেন। মালির রাজধানী বামাকোতে গত সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত বাংলাদেশ ট্রান্সপোর্ট কন্টিনজেন্টের একটি জীপে এই হামলার ঘটনা ঘটে। নিহত নীল কন্ঠ হাজং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈনিক পদে ছিলেন। আহত সৈনিক সিরাজুল ইসলাম বামাকোর লেভেল-২ হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

শুধু নীল কন্ঠ হাজং-ই নয়, বাংলাদেশের ১২৫ জনেরও বেশি শান্তিরক্ষী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষায় ইতোমধ্যে জাতিসংঘের পরীক্ষিত

বন্ধু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে বাংলাদেশ। এ পর্যন্ত মিশনে সোয়া লাখেরও বেশি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী অংশগ্রহণ করেছেন। আজ শুক্রবার বিশ্ব শান্তিরক্ষী দিবস। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে রাষ্ট্রীয়ভাবে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী রবিবার সকালে ঢাকা ও বিভাগীয় শহরে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে 'পিস কিপার্স রান' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ওইদিন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশের শহীদ শান্তিরক্ষীদের আত্মীয় ও আহত শান্তিরক্ষীদের সংবর্ধনা এবং জাতিসংঘে শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের কার্যক্রম ডিজিটাল ডিসপ্লে-প্যানেলের নান্দনিক উপস্থাপন করা হবে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন।

সেনাবাহিনী সূত্রে জানা যায়, ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরান শান্তি মিশনে সেনাবাহিনীর ১৫ জন সদস্যের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে শুরু হয় শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের পথচলা। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী শান্তিরক্ষী মিশনে যোগ দেয়। ১৯৮৯ সালে নামিবিয়া মিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশবাহিনী জাতিসংঘ পরিবারের সদস্য হয়। 'সবার প্রতি বন্ধুত্ব কারো প্রতি বৈরিতা নয়' – বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশবাহিনী দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে যোগ দিচ্ছে। এদিকে শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেছেন, 'বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা তাদের অনন্য অবদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের সুনাম বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতিসংঘের ভাবমূর্তিও সমুন্নত করেছে। তিনি বলেন, আমরা গর্বিত যে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বাধিক সংখ্যক শান্তিরক্ষী প্রেরণ করে বাংলাদেশের অবস্থান আজ শীর্ষে। এটা বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের যোগ্যতা ও আন্তরিক কর্মদক্ষতার ফলেই অর্জিত হয়েছে।

এছাড়া পৃথক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষায় জাতিসংঘ কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে তার সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, 'বিশ্বের অস্থিতিশীল ও সংঘাতময় এলাকায় শান্তি স্থাপনে বাংলাদেশ আজ এক আস্থার প্রতীক। এ মহতী ধারা অব্যাহত রাখতে আধুনিক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবেন- এটাই আমার প্রত্যাশা।' তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন সংঘাতময় অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন এক বাণীতে বলেছেন, 'জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে উত্সাহ জোগায়, যা ঝুঁকি ও সুযোগগুলোকে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের ছোট ও বড় দেশসমূহে ছড়িয়ে দেয়। আমি সৈন্য ও পুলিশ প্রেরণকারী ১২২টি দেশের এক লাখ ৭ হাজারের বেশি পোশাকধারী শান্তিরক্ষীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছি, যারা বর্তমানে ১৬টি দেশে কর্মরত রয়েছেন।'

৪। প্রশ্ন: বাংলাদেশের সন্ত্রাসবিরোধী প্রচেষ্টার বর্ননা দিন?

বাংলাদেশের সন্ত্রাসবিরোধী প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কেবল জঙ্গি তৎপরতার অভিযোগে নিয়মিত গ্রেপ্তার নয়, আন্তর্দেশীয় পর্যায়েও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মোকাবিলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে আল-কায়েদা নেতা আয়মান আল জাওয়াহিরির নাম ও ছবিসহ এক অডিও বার্তা প্রকাশ করা হয়। ওই ঘটনা তদন্তেও সরকার আন্তরিকতা দেখিয়েছে। চলতি মাসে (জুন'১৫)

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার দেশীয় ও আন্তর্দেশীয় পর্যায়ে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলো মোকাবিলায় দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেখানোয় ২০১৪ সালে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে 'অগ্রগতি' করেছে বাংলাদেশ। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বর্তমান সরকার আইন প্রণয়ন, আইনশৃঙ্খলা জোরদার, সীমান্ত নিরাপত্তা, সন্ত্রাসের অর্থায়ন প্রতিরোধ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সহিংসতা ও সহিংস জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করে দেশকে জঙ্গি রাষ্ট্রের তকমা থেকে রক্ষা করেছে। বিশ্বের বহু দেশে এখন নতুন সমস্যার নাম ধর্মীয় জঙ্গিবাদ। এ ছাড়া গোষ্ঠী বা আঞ্চলিকতাকে কেন্দ্র করে একটি চক্র চরমপন্থা অবলম্বন করছে, যাতে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। এরা গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ

পরিবেশকে অসহনীয় করে তুলছে। এরা আগে বিচ্ছিন্নভাবে ও সমন্বয়হীনভাবে কাজ করলেও প্রযুক্তির বদৌলতে তারা এখন অনেক বেশি সুসংহত ও সমন্বিতভাবে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

সন্ত্রাসীদের চলাচলের গতি বেড়েছে, যোগাযোগ সহজ হয়েছে এবং আত্মগোপনের জন্য বিস্তীর্ণ এলাকা ব্যবহার করছে। দেশে দেশে উগ্র জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান ঘটছে। এসব জঙ্গিগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের জানমালের পাশাপাশি বিশ্বশান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ। বিশ্বশান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই উগ্র জঙ্গিগোষ্ঠীর মোকাবিলা করা শান্তিকামী সব মানুষের দায়িত্ব। বাংলাদেশের জনগণ সব সময়ই শান্তির পক্ষে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অহিংস নীতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর সেই আদর্শ অনুসরণ করছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো এখন স্বীকার করতে বাধ্য যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সম্মুখভাগে রয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৪ সালে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা ৩৫ শতাংশ বেড়েছে এবং আগের বছরের তুলনায় মোট হতাহতের সংখ্যা ৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব আক্রমণের ৬০ শতাংশের বেশি পাঁচটি দেশে সংঘটিত হয়েছে। এগুলো হলো ইরাক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত ও নাইজেরিয়া। আর ৭৮ শতাংশের বেশি হতাহত হয়েছে সিরিয়ায়। ২০১৪ সালে ২০টি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ১০০ জনের বেশি নিহত হয়েছে, যেখানে আগের বছর এ ধরনের দুটি হামলার ঘটনা ঘটে। একই বছর বাংলাদেশে বড় ধরনের কোনো সন্ত্রাসী ঘটনা সংঘটিত হয়নি। বরং নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের প্রধানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২০১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর আইএস ও আল-নুসরাহ ফ্রন্টের জন্য জঙ্গি সংগ্রহের অভিযোগে সামিউন রহমান নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সামিউনকে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে ইরাকে ইসলামিক স্টেট (আইএস) প্রতিরোধে বৈশ্বিক জোটের অংশীদার না হলেও বাংলাদেশ এই হুমকি মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিয়েছে। এ ছাড়া সহিংস জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে কৌশলগত যোগাযোগ স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। এ দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর নজরদারি করছে এবং মানসম্পন্ন জাতীয় পাঠ্যক্রম তৈরি করছে, যাতে ভাষা শিক্ষা, গণিত ও বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একই সঙ্গে অষ্টম ধাপ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষায় ন্যূনতম মানের ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়গুলো পড়ানো বাধ্যতামূলক করেছে। এমনকি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরিতে ইমাম ও আলেমদের নিয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয় একসঙ্গে কাজ করছে। সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে পূর্ণরূপে সক্রিয় রয়েছে বাংলাদেশ।

দুই বছর আগে একইভাবে মার্কিন প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থানের প্রশংসা করার পরপর জাতীয় সংসদে 'সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) বিল ২০১৩' পাস হয়। 'এ দেশের মাটিতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানো কঠিন'- এই শিরোনামে সন্ত্রাস দমনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রশংসা করে যুক্তরাষ্ট্র বলেছিল, সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের মাটিতে কাজ চালানো সন্ত্রাসীদের জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে।

বৈশ্বিক সন্ত্রাস নিয়ে ওই বছর ৩০ মে ওয়াশিংটনে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়। ২০১২ সালের পরিস্থিতি নিয়ে 'কান্ট্রি রিপোর্টস অন টেররিজম ২০১২' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনটি করা হয়েছিল। সেই সময় মহাজোট ক্ষমতায় এসে ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি 'সন্ত্রাস দমন আইন, ২০০৯' পাস করে। কিন্তু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ (এপিজি) ও ফিন্যানশিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের (এফএটিএফ) মানদণ্ড অনুসরণ করতে সন্ত্রাস বিরোধী আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরপর ২০১২ সালে এক দফা আইনটি সংশোধন করা হয়। তার পরও আরো কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক মহল থেকে অনুরোধ আসে। এসব বিষয় যুক্ত করতেই সরকার আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ওই বিলটি পাস করা হয়েছে। ওই বিলের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইন্টারনেট ভিত্তিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে বাস্তবসম্মত ধারাসমূহ অন্তর্ভুক্তি।

কোনো সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সংগঠন ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করলে সাক্ষ্য আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এসংক্রান্ত তথ্যগুলো প্রমাণ হিসেবে আদালতে উপস্থাপন করা যাবে। অন্যদিকে এই বিলে জঙ্গি দমনে গুরুত্বপূর্ণ ধারা যুক্ত হয়েছে। আল-কায়েদার সম্পদ বাজেয়াপ্ত, অস্ত্র বিক্রি ও ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা ও জঙ্গিবাদে অর্থায়নে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নেওয়া দুটি প্রস্তাবও আইনে পরিণত করা হয়েছে। বিএনপি-জামায়াত জোট আমলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করা ও বিরোধী দলকে (আওয়ামী লীগকে) নির্মূলের নানা ঘটনা বিবেচনায় রেখেও বলা যায়, জঙ্গিগোষ্ঠী দমনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার রয়েছে ব্যাপক সাফল্য। জঙ্গি

সংগঠন জেএমবির নেতাদের গ্রেপ্তার ও তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীসহ অন্যান্য মৌলবাদী সংগঠনকে আইনের কাছে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছে 'RAB' ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। মানুষের আস্থার জায়গাটি তৈরি হয়েছে; যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বিরল একটি ঘটনা। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত RAB দেড় লাখেরও বেশি ব্যক্তিকে বিভিন্ন অপরাধে আটক করেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে ধর্মভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনের সদস্য, চিহ্নিত সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ী, অর্থ পাচারকারী ও প্রতারক, নারী ও শিশু পাচারকারী ও অপহরণকারী। তাদের তৎপরতায় ১০ হাজার ৫২০টি আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। এমনকি সন্ত্রাসী গ্রেপ্তারের অভিযানে গোলাগুলির মধ্যে পড়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ২০ সদস্য নিহত ও ২০০-রও বেশি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। এটা সত্য যে বর্তমান সরকারকে সন্ত্রাস নির্মূলের সময় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আরো বেশি সচেষ্ট থাকতে হবে। আইনের শাসন কার্যকর করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ শাসক আমাদের দরকার। ইতিমধ্যে এ দেশের সব নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সন্ত্রাস সম্পর্কে জিরো টলারেন্স নীতিতে বিশ্বাসী হিসেবে অভিনন্দিত হয়েছে বর্তমান সরকার। তবে এ পরিস্থিতিতেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি লঙ্ঘন করলে তা হবে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অবমাননাকর ও জঘন্য অপরাধ। এ কারণে তাদের ব্যক্তি-অধিকারের সীমারেখা ও প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বজায় রাখার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। জীবনের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিধানের অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের। সন্ত্রাসবিরোধী প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের প্রশংসা জঙ্গিবাদবিরোধী কর্মকাণ্ডকে গতিশীল এবং একই সঙ্গে মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

৫. প্রশ্ন: ডিজিটাল বাংলাদেশ : তাৎপর্য ও রূপকল্প বর্ননা করুন।

উত্তর: অন্তর্নিহিত তাৎপর্য স্পষ্ট না হলেও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শব্দযুগল ব্যাপকভাবে পরিচিতি পেয়েছে। ইংরেজি ডিজিট শব্দের বিশেষণ হলো ডিজিটাল। ডিজিটের বাংলা অর্থ অঙ্ক; এখানে অঙ্ক অর্থ গণিত শাস্ত্র নয়। ব্যাপকভাবে ব্যবহার হওয়া দশমিক পদ্ধতির গণনার দশটি অঙ্ক : ০ হতে ৯; এই দশটি অঙ্কের ভিত্তিতে ডিজিটাল যন্ত্রপাতির বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব। বস্ত্তত কমপিউটার, ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোনসেটসহ সব ধরনের ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ০ এবং ১ এই দুটি অঙ্কের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়। আধুনিক সভ্যতা ডিজিটাল যন্ত্রপাতির ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ডিজিটাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়িয়ে দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়াই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'- এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শব্দযুগলের সাথে 'ভিশন ২০২১' শব্দযুগলের সম্পর্ক টানা হয়েছে। ইংরেজি ভিশন শব্দের অর্থ দূরদৃষ্টি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির বছর ২০২১ সাল। ডিজিটাল যন্ত্রপাতি এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, অর্থাৎ আইসিটির বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালে সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা বর্তমান মহাজোট সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ছিল একটি আকর্ষণীয় বিষয়।

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্য স্থির করেছে। কমপিউটার ও ইন্টারনেটের বহুল ব্যবহার এ দেশের জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। জনসাধারণের প্রত্যাশার সাথে সরকারের প্রত্যাশার মিলনের ফলে সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে সবাই আশাবাদী। এই লেখার ক্ষুদ্র পরিসরে ডিজিটাল বাংলাদেশের তাৎপর্যসহ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে, অর্থাৎ ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের

রূপরেখা, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কৌশল নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা কেমন হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা? ২০২১ সালে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির রূপরেখা বা অবস্থা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। বিভিন্ন আলোচনা, টকশো, পত্রপত্রিকার লেখালেখি থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য নানারকম আয়োজন ও কার্যক্রমের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এজন্য স্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে পর্যায়ক্রমে সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে মালয়েশিয়ার সুপারকরিডরের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল হতে পারে একটি অনুসরণীয় উদাহরণ।

১৯৯১ সালে গৃহীত এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২০ সালে মালয়েশিয়া পরিণত হবে একটি উন্নত রাষ্ট্রে। এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় হলো : ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, ই- এডুকেশন, ই-মেডিসিন, ই- অ্যাগ্রিকালচার ইত্যাদি। অর্থাৎ ডিজিটালপ্রযুক্তি বা আইসিটিনির্ভর প্রশাসনব্যবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসাব্যবস্থা, কৃষি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। ডিজিটালপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ছাড়া পশ্চাৎপদ বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধশালী মাঝারী আয়ের দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে না। ডিজিটালপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুতগতিতে সরকারের সেবামূলক কার্যক্রম জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। মোবাইল ফোন অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্রুত তথ্য বিনিময় সম্ভব। ইন্টারনেট ব্যবহার করে ঘরে বসে অফিস ও ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা উন্নত দেশে একটি বিবর্ধমান ট্রেন্ড, এবং এর ফলে প্রচলিত নয়টা-পাঁচটা অফিস- সময়ের গুরুত্ব ক্রমাগত কমে আসছে। এই ব্যবস্থা পরিবহন ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ে সহায়ক এবং বড় বড় শহরে জানজট কমাতে সহায়ক। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তথ্যের স্বচ্ছতা বিধানের মাধ্যমে দুর্নীতি ও অদক্ষতা নির্ণয় করা সহজ হয়।

২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, সুশিক্ষিত, সুদক্ষ এবং সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন কৌশল ছাড়া কল্পনার এই 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে প্রয়োজন ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য কী প্রয়োজন? সংক্ষেপে বলতে হয়, কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, অর্থাৎ কমপিউটার, ফোন ও ইন্টারনেটের সঠিক ও বহুল ব্যবহার। আরও প্রয়োজন এসব বিষয়ে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল। পৃথিবীর আর দশটি দেশের তুলনায় এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন নৈরাশ্যজনক। বর্তমানে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা শতকরা এক ভাগের মতো। বিশাল জনগোষ্ঠী এখনো পার্সোনাল কমপিউটার ছুঁয়ে দেখেনি। এখনো এক-তৃতীয়াংশ জনগণ সাধারণ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান উপাদান ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের ব্যবহার উল্লেখ করার মতো নয়। মোবাইল ফোনের অগ্রগতি সমেত্মাষজনক মনে হলেও বিশ্ব পরিস্থিতির তুলনায় অনেক পেছনে। বর্তমানে পনেরো কোটি জনসংখ্যার জন্য ফোনের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি, অর্থৎ টেলিফোনের ঘনত্ব প্রায় শতকরা তেত্রিশ ভাগ। পৃথিবীর অনেক দেশে এই ঘনত্ব শতকরা একশ' ভাগের উপরে এবং কয়েকটি দেশে শতকরা দুইশ' ভাগের বেশি। পার্শ্ববর্তী থাইল্যান্ডে এই ঘনত্ব শতকরা সোয়াশ' ভাগ। উন্নয়নশীল দেশে মোবাইল ফোনের গুরুত্ব অনেক। কথা বলা ও টিভি দেখা ছাড়াও এসএমএস, ই-মেইল ও ওয়েব ব্রাউজিংয়ের জন্য মোবাইল ফোনের ব্যবহার দ্রুত বেড়ে চলেছে। ডিজিটালপ্রযুক্তির জন্য প্রয়োজন বিদ্যুৎশক্তি। আর বিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহারের বিচারে বিশ্বে আমাদের অবস্থান একেবারে পেছনের সারিতে। ডিজিটালপ্রযুক্তি ও বিদ্যুতের ব্যবহার, প্রযুক্তিগত শিক্ষার অবস্থা প্রভৃতির বিবেচনায় ২০২১ সালে সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন মোটেই সহজ কাজ নয়। তবে সরকারের দৃঢ়প্রত্যয় এবং সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন কৌশল এই লক্ষ্য অর্জনে জাতিকে সক্ষম করবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে করণীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য অনেক কিছু করার প্রয়োজন হবে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় হলো : গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলাসহ দেশব্যাপী ইন্টারনেট ও টেলিফোনের ব্যাপক সম্প্রসারণ, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম জনবল সৃষ্টি এবং সে জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন। আরো প্রয়োজন ওয়েবের ব্যবহার সম্প্রসারণসহ ই-গভর্নেন্সের ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং ইন্টারনেট তথ্যভান্ডারের জন্য বাংলা ভাষার বহুল ব্যবহার। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে দেশে মোবাইল ফোন এবং ল্যাপটপ কমপিউটার উৎপাদনের প্রচেষ্টা নেয়া দরকার। আশার কথা যে, এসব বিষয় নিয়ে বর্তমানে সরকারের উদ্যোগ লক্ষণীয়। তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাসহ শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা চলছে। এছাড়া ই-মেইল, ভিডিও কনফারেন্সিং ও ই-গভর্নেন্সসহ প্রশাসনে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে বর্তমান অস্বস্তিকর অবস্থা কার না অজানা। ইন্টারনেটের মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া পরিচালনা এই অস্বস্তিকর অবস্থা হতে দেশকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিতে পারে। সরকারি সেবা জনসাধারণের নিকট দ্রুত পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অফিস ও প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত জনবল ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। মোবাইল ফোন, এসএমএস, ই-মেইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে এসব কেন্দ্র থেকে দ্রুত রাষ্ট্রীয় সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন কৃষকন মোবাইল ফোনে কথা বলে অথবা এসএমএস করে ফসলের রোগবালাই সম্পর্কে দ্রুত বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারেন। এভাবে সেবা যোগানোর জন্য নির্ভরযোগ্য কৃষি তথ্যকেন্দ্র, চিকিৎসা তথ্যকেন্দ্র, কর তথ্যকেন্দ্র, শিক্ষা তথ্যকেন্দ্র, আবহাওয়া তথ্যকেন্দ্র, পরিবহন তথ্যকেন্দ্র এবং এ ধরনের অন্যান্য তথ্যকেন্দ্র চালু করার ব্যবস্থা করা দরকার। বিদ্যুৎ ডিজিটাল ব্যবস্থার চালিকাশক্তি। বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন ও পরিবহন সমস্যা সমাধান নিয়ে জাতি শঙ্কামুক্ত নয়। বিশ্বে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় সৌরশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে

জনগণকেও আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া দেশের কয়লাসম্পদ ব্যবহার করে আরো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবে। এজন্য উত্তরবঙ্গে অবস্থিত দ্বিতীয় কয়লাক্ষেত্র হতে কয়লা উৎপাদন শুরু করা প্রয়োজন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন কৌশল বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। ডিজিটাল বাংলাদেশে এই বিপুল জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে, এটাই স্বাভাবিক। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা এবং রাজধানী এই পাঁচ স্তরবিশিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প চালু করতে হবে। এই প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হবে উপজেলা। উপজেলা সদরের সব অফিসকে দ্রুত ডিজিটাল অফিসে রূপান্তর করে ইউনিয়ন ও জেলা সদরের সাথে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা দরকার। এজন্য উপজেলা সদরে অবস্থিত সব অফিসে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ জনবল সৃষ্টি করা প্রয়োজন। মোবাইল ইন্টারনেটপ্রযুক্তি ব্যবহার করে এ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব। উপজেলা সদরে কেন্দ্রীয় তথ্যকেন্দ্রসহ উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন অফিসে তথ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। এমনকি হাইস্কুল ও কলেজ হতেও এ ধরনের তথ্যকেন্দ্র পরিচালনা করা যায়। এ ধরনের তথ্যকেন্দ্রে মুদ্রণ ও মুভি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন ধরনের ইন্টারনেট সেবার ব্যবস্থা থাকবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উৎসব অথবা

অনুষ্ঠানের ছবি স্ক্যান করে অথবা মোবাইল ফোনে গৃহীত ছবি দেশ- বিদেশ দ্রুত পাঠানোর ব্যবস্থা থাকতে পারে এসব তথ্যকেন্দ্রে।

উপসংহার ২০২১ সাল আসতে এখনো এক যুগ বাকি এবং এই সময়ে প্রযুক্তি আরো উন্নত হবে। সাথে সাথে দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে দেশের বিশাল এলাকা তলিয়ে যাওয়া প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। বর্তমানে সাজানো ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্পকে সময় সময় আধুনিকায়নের মাধ্যমে যুগোপযোগী করার প্রয়োজন হবে। যুগে যুগে পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রস্তরযুগ, কৃষিযুগ, যন্ত্রযুগ পেরিয়ে মানবসভ্যতা এখন তথ্যযুগে। বর্তমান তথ্যযুগে দ্রুত এবং সময় মতো কর্ম সম্পাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু সরকারি প্রচেষ্টায় সোনার বাংলা, অর্থাৎ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। সরকারের সহায়তায় এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য সঠিক সময়ে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

৮. বিদেশি বিনিয়োগ

৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর প্রথম কয়েক দিন রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলেও পুরো বছর শান্ত গেছে। কোনো হরতাল-অবরোধ ছিল না। এর পরও গত বছর (২০১৪) সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) কমেছে প্রায় ৫ শতাংশ। ২০১৩ সালে যেখানে বিনিয়োগ এসেছিল ১৬০ কোটি ডলার, এক বছরের ব্যবধানে সেটি নেমেছে ১৫৩ কোটি ডলারে। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস

কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আঙ্কটাড) সর্বশেষ 'বৈশ্বিক বিনিয়োগ' প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটি আজ বুধবার সারা বিশ্বে একযোগে প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে। সে দিন বাংলাদেশ অংশের প্রতিবেদনটি প্রকাশ করবে বিনিয়োগ বোর্ড (বিওআই)।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিনিয়োগ কমার মূল কারণ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আশ্বস্ত হতে পারছেন না। এ ছাড়া গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো খাতেও আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। গত বছর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের ডুয়িং বিজনেস শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতের দুর্বলতার বিষয়টি উঠে এসেছিল। এর সঙ্গে আমলতান্ত্রিক জটিলতা ও মন্ত্রণালয়গুলোর অদক্ষতা তো রয়েছেই। এসব কারণে বিদেশি বিনিয়োগ কমছে এবং তা এক থেকে দেড় বিলিয়ন ডলারের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

আঙ্কটাডের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিদেশি কম্পানিগুলো গত বছর নতুন করে তেমন বিনিয়োগ করেনি। তারা যে টাকা মুনাফা করেছে, তার বড় অংশই আর বিনিয়োগে খাটানো হয়নি। বরং সদর দপ্তর থেকে টাকা ধার নিয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে কম্পানিগুলো। প্রতিবেদন বলছে, কম্পানিগুলো ২০১৩ সালে বাংলাদেশে ৫৪ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছিল। ২০১৪ সালে তা কমে হয়েছে মাত্র ২৮ কোটি ডলার। অর্থাৎ নতুন বিনিয়োগ অর্ধেকে নেমে এসেছে। এ ছাড়া ২০১৩ সালে বিদেশি কম্পানিগুলো যে পরিমাণ মুনাফা করেছিল, তার থেকে ৩৬ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছিল। ২০১৪ সালে তা কমে হয়েছে ২৬ কোটি ডলার। এখানে মুনাফার বিনিয়োগ কমেছে ১০ কোটি ডলার। তবে কম্পানিগুলো তাদের সদর দপ্তর বা অভ্যন্তরীণ ধার ও ঋণ নিয়ে গত বছর বিনিয়োগ করেছে ৯৯ কোটি ডলার। আগের বছর এই পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি ডলার।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার স্বপ্ন রয়েছে বর্তমান সরকারের। সে সোপানে পেঁৗছাতে হলে প্রতিবছর গড়ে ছয় বিলিয়ন ডলার করে বিনিয়োগ দরকার। সেখানে প্রতিবছর বৈদেশিক বিনিয়োগ হচ্ছে এক থেকে দেড় বিলিয়ন ডলার। বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত প্রতিবারের মতো এবারের বাজেটেও নানা উদ্যোগের কথা বলেছেন। কিন্তু বছর শেষে দেখা যায়, কোনো উদ্যোগেরই বাস্তবায়ন নেই। ২০১২ সালে বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে ১৩০ কোটি ডলার। এর আগের বছর এসেছিল ১১৯ কোটি ডলার। ২০১০ সালে তা ছিল মাত্র ৯১ কোটি ডলার।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকায় নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, ২০১৩ সাল ছিল ব্যতিক্রমী বছর। ওই বছর থ্রি-জি লাইসেন্স ও এনআরবি ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভালো বিনিয়োগ আসে। কিন্তু অন্যান্য বছরে বৈদেশিক বিনিয়োগের যে চিত্র, তাতে দেখা গেছে এই হার দেড় বিলিয়ন ডলারের মধ্যে। এটি জিডিপির প্রবৃদ্ধির মতো। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের ফাঁদে আটকে আছে। তেমনি বৈদেশিক বিনিয়োগও এক থেকে দেড় বিলিয়ন ডলারের মধ্যে পড়ে আছে। বাড়ছে না। বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক। চীনে প্রতিবছর গড়ে বৈদেশিক বিনিয়োগ আসে ১০ হাজার কোটি ডলারের ওপর। আর ভারতে তা ৩০০০ কোটি ডলার ছুঁইছুঁই। এই অর্থনীতিবিদের মতে, বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ না বাড়ার প্রধান কারণ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। বিদেশি কম্পানিগুলোকে স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দিতে হবে। পাশাপাশি গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এগুলোতে বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে। যার প্রমাণ দেখা গেছে, সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত ডুয়িং বিজনেস প্রতিবেদনে। সেখানে দেখা গেছে, বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে বাংলাদেশে একজন বিনিয়োগকারীর যে সময়

লাগে, তা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। কোরিয়ান ইপিজেড থেকে সরকার দুই হাজার একর জমি ফেরত নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এর মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে নেতিবাচক বার্তা গেছে বলে মনে করেন তিনি।

আঙ্কটাডের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গত এক বছরে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ এসেছে যুক্তরাজ্য থেকে, ১৮ কোটি ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে দক্ষিণ কোরিয়া। দেশটি থেকে বিনিয়োগ এসেছে ১৪ কোটি ডলার। তৃতীয় অবস্থানে পাকিস্তান। দেশটি থেকে এসেছে ১৩ কোটি ডলার। এরপর রয়েছে যথাক্রমে সিঙ্গাপুর, হংকং, নরওয়ে, জাপান, নেদারল্যান্ড, ভারত ও শ্রীলঙ্কা।

গত এক বছরে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে, ৭২ কোটি ডলার। যে খাতে রয়েছে খাদ্য, কেমিক্যাল, সারসহ অন্যান্য। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগ হয়েছে ট্রেড অ্যান্ড কমার্স খাতে। তৃতীয় পরিবহন খাতে, ২৩ কোটি ডলার।

প্রসঙ্গত ১৯৯১ সাল থেকে প্রতিবছর সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে আঙ্কটাড।

৯. নদী ও পানি সমস্যা এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

বাংলাদেশ প্রতিদিনে ধারাবাহিক তিন কিস্তিতে একটা তথ্যবহুল ও মর্মস্পর্শী দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনাম ছিল 'আমার একটি নদী ছিল'। শিরোনামটিই বলে দিচ্ছে, অতীতে কোনো এক নদী ছিল, এখন আর নেই। একটি নয়, একাধিক নদী। একদা ভরা নদী, এখন মরা খালে অথবা শুষ্ক বালুচরে পরিণত হয়েছে, এ রকম অনেকগুলি নদীর বিবরণ আছে। এর মধ্যে আছে কুষ্টিয়ার ৮টি নদী, করতোয়া, চলনবিল অঞ্চলের ১৬টি নদী, ছোট যমুনা, মহানন্দা, কপোতাক্ষ, নবগঙ্গা, পিয়াইন নদী, পুনর্ভবা, কাজলা, ইছামতি, লালমনিরহাটের ১১টি নদী, তিতাস, ব্রহ্মপুত্র নদ, মানিকগঞ্জের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান চারটি নদী (ধলেশ্বরী, পুরাতন ধলেশ্বরী, কালীগঙ্গা ও ইছামতি), বাগেরহাটের ২৩টি নদী। যোগ করলে সংখ্যাটি বিরাট। এসব নদীই তো বাংলাদেশের প্রাণ। নদীগুলো শুকিয়ে গেলে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা চিরায়ত বাংলাদেশের চেহারাই পাল্টে যাবে। এর চেয়ে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ আর কি হতে পারে।

বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদকমণ্ডলীকে আমি অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, এতগুলো নদীর বিস্তারিত বিবরণ ও তার মরণদশার কারণ অনুসন্ধানী রিপোর্ট তুলে ধরার জন্য। আমি নদী বিশেষজ্ঞ নই। তবে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র আমি ঘুরেছি অনেক। দেশটি এবং দেশের ভৌগলিক অবস্থা আমার খুবই পরিচিত। তারপরও

আমি এ রিপোর্ট পড়ে নতুন জ্ঞান লাভ করলাম। ভাবলাম, এতটা সর্বনাশা অবস্থায় আমরা চলে গেছি। এ বেদনা তো ধরে রাখা যায় না।

প্রতিটি প্রতিবেদন আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি। পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ে গেল কিছুদিন আগে খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক সৈয়দ অহিদুজ্জামান ডায়মন্ডের দ্বারা নির্মিত এক অসাধারণ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'অন্তর্ধান'। বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা ও পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিভাবান চলচ্চিত্র পরিচালক ডায়মন্ড নিম্নবর্ণের মানুষের জীবন কথা তুলে ধরেন সিনেমার পর্দায়। অন্তর্ধানও তেমনি পদ্মাপাড়ের গরিব মানুষের বেদনাসিক্ত কাহিনীকে ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্র। প্রমত্ত পদ্মা যাকে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 'প্রলয়ের সহদরা, কাল নাগিনী', সেই পদ্মাই আবার মাটিকে করে সবুজ, কত মানুষের জীবনে আনে সুখ ও সমৃদ্ধি। ফারাক্কার কারণে পদ্মা শুকিয়ে গেছে। পদ্মা পাড়ের শ্রমজীবী মানুষের জীবনে তা নিদারুণ বেদনাদায়ক প্রভাব ফেলেছে। সেটাই ফুটে উঠেছে এই চলচ্চিত্রে। সেখানে খেলার সাথী দুটি বালক-বালিকা- আকাশ ও নদীর মান-অভিমান খেলা নিয়ে যে ছোট অথচ সুন্দর কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে, তা যেন রূপক আকারে গঙ্গার পানি নিয়ে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি।

সৈয়দ অহিদুজ্জামান ডায়মন্ড নির্মিত ছবিটির নামটাই অর্থবহ। 'অন্তর্ধান'। অর্থাৎ হারিয়ে গেছে। একদা যে নদী ছিল, এখন আর তা নেই। বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিবেদনও তাই বলেছে। এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন নদী মরে যাওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে অপরিকল্পিত বাঁধ, ভেড়িবাঁধ নির্মাণ, অন্যান্য স্থাপনা, ড্রেজিংয়ের অভাব, এ ধরনের কাজ ছাড়াও প্রভাবশালীরা নদী ভরাট করে নদী দখল, চিংড়ি চাষ, বালু উত্তোলন ইত্যাদি ধ্বংসাত্দক কাজও দায়ী। আরও বড় একটি কারণ হলো, কয়েকটি নদীর উজানে ভারতে বাঁধ দিয়ে আগেই পানি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এটি এক ধরনের আন্তর্জাতিক অপরাধও বটে। বাংলাদেশ প্রতিদিনের ২৬ মে'র সংখ্যায় একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম হলো 'ফারাক্কা আর দখলদারের প্রভাবে কুষ্টিয়ার ৮ নদী'। একই সংখ্যায় আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ফারাক্কা বাঁধের বিরূপ প্রভাব ও ১৯৮০-এর দশকে পদ্মার উৎসমুখে অপরিকল্পিত স্লুইসগেট নির্মাণের ফলে চলনবিলের বিভিন্ন নদ-নদী ও বিল-জলাশয়, খালগুলো পলি জমে ক্রমে ভরাট হয়ে গেছে।' বাংলাদেশ প্রতিদিনের ২ জুন সংখ্যায় এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বাগেরহাটে মরে গেছে ২৩টি নদী'। সেখানে আরও বলা হয়েছে '... ফারাক্কা বাঁধের কারণে এসব নদীতে উজানের পানি না আসার ফলে দীর্ঘ সময় জোয়ারের পানি স্থির থাকায় অতিরিক্ত পলি জমেও ভরাট হয়ে গেছে নদী-খাল'।

ফারাক্কা বাঁধের অশুভ প্রভাবে কীভাবে প্রমত্ত পদ্মা শুকিয়ে পদ্মা পাড়ের মানুষের সর্বনাশ হয়েছে তার জীবন্ত ছবি পাওয়া যায় 'অন্তর্ধান' চলচ্চিত্রে। কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'অন্তর্ধান' প্রদর্শিত হলে ভারতীয় দর্শক ও সাংবাদিকরা কিন্তু এটিকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখেননি। বরং তারাও চিরায়ত নদীপ্রবাহ বন্ধের ক্ষতিকর দিক উপলব্ধি করতে পেরেছেন। Statesman পত্রিকায় পরিচালক ডায়মন্ডকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, 'চীন যদি ব্রহ্মপুত্র নদে বড় বাঁধ দিয়ে পানি প্রবাহকে কমায়-বাড়ায় তাহলে ভারতের কি হবে?' একই কথা লিখেছে দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'প্রবাসের চিঠি' এর সম্পাদকীয়তে। 'ব্রহ্মপুত্রের উপর বিরাট বাঁধ বানাচ্ছে চীন। ফলে ভারতের ব্রহ্মপুত্রের মতো নদ শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে ভারত সরকার। ...জল বন্টনের এই তীব্র ও আন্তর্জাতিক সমস্যা এবার মানবিক আবেদন নিয়ে হাজির হলো

সেলুলয়েড পর্দায়।' একই সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, 'ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন স্বয়ং ড. মেঘনাদ সাহা, কপিল ভট্টচার্য।' Times of India পত্রিকায় ডায়মন্ডের 'অন্তর্ধান' সম্পর্কে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তার হেডলাইন ছিল, 'Bangla film on water woes scores a hit.'

পরিচালক ডায়মন্ড আরও বলেছেন, পদ্মার পানির সমস্যা শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতসহ সব দেশেরই সমস্যা। তিনি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে বলেছেন। বাংলাদেশ সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বলেছেন, 'আমাদের নদীগুলো দুই দেশের বিরোধের কারণ নয়, বরং সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণ হওয়া উচিত।'

কিন্তু বাস্তবে ঘটনা হচ্ছে বিপরীত। এবারও তিস্তা চুক্তি হলো না। বরং এ বছর বাংলাদেশের পয়েন্টে তিস্তার প্রবাহ ছিল সর্বনিম্ন। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের সীমান্ত মুখে তিস্তা দিয়ে পানি আসত ৬৭১০ কিউসেক। গত ২২ মার্চে আমরা পেয়েছি মাত্র ২৩২ কিউসেক। ভারতের জলপাইগুড়িতে গজলডোবায় বাঁধ দিয়ে ভারত তিস্তার পানি অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ পানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে পেয়েছি যথাক্রমে ৩৫০৬, ২৯৫০ এবং ৫৫০ কিউসেক। অর্থাৎ ক্রমাগত কম পানি পাচ্ছি। ফলে উত্তরবঙ্গের বিশাল অঞ্চলজুড়ে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ভূগর্ভস্থ পানি হ্রাস পাওয়ায় মরু প্রক্রিয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তিস্তার পানি দ্বারা পুষ্ট অন্য নদীও শুকিয়ে যাচ্ছে, বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনে সর্বনাশ নেমে আসছে।

ভারত কিন্তু একক সিদ্ধান্তে এ কাজ করতে পারে না। তা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। ভাটির দেশের সঙ্গে সমঝোতায় না এসে এককভাবে ভারত নদী প্রবাহ অন্যত্র সরাতে পারে না। এটা জাতিসংঘের নদী কনভেনশন ১৯৯৭-এর ধারার পরিপন্থী। বিশেষ করে এ কনভেনশনের ৭.১ এবং ৭.২ ধারা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ধারা ৭.১ 'Watercourse States, shall in utilizing an international watercourse in their territories take all appropriate measures, to prevent the causing of significant harm to other watercourse States.'aviv 7.2 'Where significant harm nevertheless is caused to another watercourse State, the State whose use causes such harm shall, in the absence of agreement to such use, take all appropriate measures, having due regard for the provisions of articles 5 and 6, in consultation with the affected State, to eliminate or mitigate such harm and where appropriate, to discuss the question of compensation.'

জাতিসংঘের এই কনভেনশন সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলা দরকার। নৌ চলাচল ব্যতীত আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানি ব্যবহার বিষয়ক এ কনভেনশনটি জাতিসংঘের সাধারণ সভায় পাস হয়েছিল ১৯৯৭ সালের ২১ মে। বাংলাদেশের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। ভারত ও পাকিস্তান বিরত থাকে। চীন, তুরস্ক ও বরুন্ডি বিপক্ষে ছিল। যাই হোক এটি আইনে পরিণত হতে হলে পরবর্তীতে ৩৬টি দেশের স্বাক্ষর প্রয়োজন ছিল। ৩৫টি দেশের স্বাক্ষর পাওয়া গিয়েছিল বেশ আগেই। একটা মাত্র স্বাক্ষর বাকি ছিল। বাংলাদেশ কিন্তু পরে স্বাক্ষর করেনি। করলে আইনে পরিণত হত। কেন করেনি? এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সরকার এসেছে এবং গেছে। কিন্তু কেউই স্বাক্ষর করেনি। ভারত অসন্তুষ্ট হবে বলে কি স্বাক্ষর করেনি? এই যদি হয়ে থাকে, তাহলে কাকে দেশপ্রেমিক বলব?

যাই হোক, গত বছর ভিয়েতনাম স্বাক্ষর করাতে এটি এখন আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়েছে। তিস্তা বা অন্য কোনো নদীর পানিবন্টনের বিষয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনার সময় এ আইনটি আমাদের জন্য সহায়ক হবে। অন্যদিকে ভারতকেও বুঝতে হবে একতরফা নদীর পানি প্রত্যাহার হবে আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। আমরা আশা করব, দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী আরও সুদৃঢ় হবে। মৈত্রী স্থায়ী করার ক্ষেত্রে যেসব বাধা আছে, তা অপসারিত হবে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো নদীর পানি বন্টন। সম মর্যাদাভিত্তিক দুই দেশের পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ককে গভীরতর করার প্রয়োজনে, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার প্রয়োজনে এবং সর্বোপরি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিস্তার পানি বন্টন ন্যায়সঙ্গতভাবে হবে এটাই আশা করি। নরেন্দ্র মোদি যা বলছেন সেটাই যেন সত্য হয়, নদীগুলো হোক দুই দেশের সম্পর্ককে এগিয়ে নেওয়ার বাহন।

হায়দার আকবর খান রনো

লেখক : রাজনীতিক।

১০. যৌতুক বিষয়ক কিছু আপডেট তথ্য

পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যৌতুকের কারণে ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের মে মাস পর্যন্ত সারাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা হয়েছে এক লাখ ১৪ হাজার ১৯২টি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যৌতুক কেবল গরিবের ঘরে নয়, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, ধনী সব ধরনের পরিবারেই ছড়িয়ে আছে এই অভিশাপ। তাদের মতে, নির্যাতনের অনেক কম অংশ জানাজানি হয়, গ্রাম–শহরে বহু নারী লোকলজ্জা এবং পারিবারিক অসম্মানের ভয়ে মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছেন নির্যাতন।

পত্রিকার কাটিং থেকে সংগ্রহ করা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ২৩৬ নারীকে এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ১৯৫ নারী। চলতি বছর অর্থাৎ, ২০১৫ সালে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে নিহত হয়েছেন ১৬ জন করে নারী। এ ছাড়া গত তিন মাসে হত্যার শিকার হয়েছেন ৬৫ জন।

মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম বলেছেন, বাস্তবের চিত্রটা আরও ভয়াবহ। যৌতুকের কারণে যে পরিমাণ সহিংসতার ঘটনা বাস্তবে ঘটছে, তার তুলনায় প্রকাশিত ঘটনার পরিমাণ অনেক কম। সামাজিক লোকলজ্জা, পারিবারিক সম্মানহানির কারণে নির্যাতিত অনেক নারীই আইনের আশ্রয় নেন না বা খবর প্রকাশ করেন না। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে যৌতুকের সমস্যা থেকে মুক্তি সম্ভব নয় বলে মনে করেন আয়শা খানম।

২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১

(ক) ধারায় যৌতুকের জন্য হত্যাচেষ্টার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড,

(খ) ধারায় মারাত্মক জখম করার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড,

(গ) ধারায় স্ত্রীকে মারধরের অপরাধে তিন বছর বা সর্বনিম্ন এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। তার পরও যৌতুকের ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে। ইউএনডিপি পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে শতকরা ৫০ শতাংশ বিবাহিত নারী যৌতুকের কারণে শারীরিক অথবা মানসিক নির্যাতনের শিকার হন।

খেটে খাওয়া দিনমজুর থেকে শুরু করে যৌতুক দাবি করায় মামলা হয়েছে এমন তালিকায় রয়েছেন পুলিশের কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, ইউপি চেয়ারম্যানও।

যৌতুক নেওয়া ও দেওয়ার ব্যাপারে দেশে প্রচলিত বিদ্যমান আইন তোয়াক্কা না

করে শিক্ষিত পরিবারগুলোতে যৌতুকের প্রবণতা এখন বেশি দেখা যাচ্ছে। আবার কোনো মধ্যবিত্ত পরিবার বিয়ে উপযুক্ত কন্যার জন্য 'চাকুরে' জামাই পেলে বরপক্ষকে যা লাগে তা দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। এর বাইরে 'যৌতুক না চাইলে কন্যার পিতা বেশি দেবেন' মর্মে শিক্ষিত পরিবারে এখন যৌতুক বিষয়ে তেমন কোনো চাহিদা থাকে না। যে কারণে মেয়ের বাবা গহনা, আসবাবপত্র, ফ্রিজ, টেলিভিশন, মোটরসাইকেলসহ নানা পণ্য মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে পেঁৗছে দেন।

যৌতুকের বিরুদ্ধে দেশে কঠোর আইন আছে। কিন্তু এর সঠিক প্রয়োগ না থাকায় এ ধরনের ঘটনা ক্রমাগত ঘটেই চলেছে বলে মন্তব্য করেন মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট এলিনা খান।

তিনি বলেন, যৌতুকের কারণে মৃত্যু বা নির্যাতনের ঘটনায় যে সব মামলা হয়, দেখা যায় বছরের পর বছর সেগুলো আদালতে ঝুলে আছে। মামলার এই দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেক সময় সাক্ষী হারিয়ে যায়। তাছাড়া রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অনেক আসামিই জামিনে ছাড়া পায় এবং বাদী পক্ষকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। ফলে, বাদী পক্ষ অনেক ক্ষেত্রেই মামলা মীমাংসা করে নিতে বাধ্য হয়। আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা তো আবশ্যিক। সেই সঙ্গে যৌতুকের বিরুদ্ধে তীব্র সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে তা বন্ধ করা সম্ভব।

১১. কর্মসংস্থান ছাড়া প্রবৃদ্ধি টেকসই হবে না

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলেই সব সময় কর্মসংস্থান বাড়ে না। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। কর্মসংস্থান ছাড়া প্রবৃদ্ধি হলে তা টেকসই হবে না। তাই প্রবৃদ্ধি হতে হবে কর্মসংস্থানকেন্দ্রিক।

উন্নয়ন ভাবনায় কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদেরা এ কথা বলেছেন। রাজধানীর বনানীতে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)

মিলনায়তনে গতকাল বুধবার অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে যৌথভাবে পিআরআই এবং বইটির প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)।

বইয়ের লেখক আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কর্মসংস্থানবিষয়ক সাবেক বিশেষ উপদেষ্টা রিজওয়ানুল ইসলাম বলেন, 'প্রবৃদ্ধি বাড়লেই যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, তা ঠিক নয়। যদিও আমরা গতানুগতিকভাবে বলে থাকি যে প্রবৃদ্ধি হলে কর্মসংস্থানও বাড়বে, দারিদ্র্য বিমোচন হবে। কিন্তু এসবের জন্য প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন, তবে তা যথেষ্ট না।'

পিআরআইয়ের চেয়ারম্যান জায়েদী সাত্তার বলেন, 'প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। কিন্তু এটা হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। এ জন্য কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে।' তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে ১৩টি দেশ টেকসই ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, তাদের সেই প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থানহীন ছিল না। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেই তারা প্রবৃদ্ধি করেছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় সমস্যা কর্মসংস্থান। কিন্তু বাংলাদেশের মতো আর কোনো দেশের সংবিধানে কর্মসংস্থান নিয়ে এত কিছু বলা হয়েছে কি না, আমার জানা নেই। অথচ বাংলাদেশের সরকার কর্মসংস্থান নিয়ে কিছু জানে কি না আমার সন্দেহ আছে।' তিনি বলেন, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে কোনো কাজ হচ্ছে না।

বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক রুশিদান ইসলাম রহমান বলেন, দেশে উন্নয়ন হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়ানো গেলে আরও উন্নয়ন হতো।

বেশি শিক্ষিতরাই বেশি বেকার: বইতে রিজওয়ানুল ইসলাম দেখিয়েছেন, কখনোই বিদ্যালয়ে যাননি কিংবা শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বেকার কম। সবচেয়ে বেশি বেকার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করা ব্যক্তিদের মধ্যে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'আমাদের শিক্ষা কি তাহলে কাজে লাগছে না? আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা তাহলে কী শিক্ষা দিচ্ছি?'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক বরকত ই খোদা বলেন, 'উচ্চশিক্ষিতদের চেয়ে স্বল্পশিক্ষিত/অশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব কম। কারণ, আমার-আপনার ছেলের মতো একজন রিকশাচালকের ছেলের কাজ না করে বসে থাকার মতো বিলাসিতা করার সুযোগ নেই। তার দারিদ্র্য তাকে কাজ করতে বাধ্য করে।'

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, 'যুবকদের একটি অংশ এখন হতাশ। তাদের সামনে কোনো ভিশন নেই। তারা মনে করে, যেকোনোভাবেই বিদেশ যেতে পারলেই তাদের ভাগ্য খুলে যাবে। সে জন্য তারা যেকোনোভাবে দেশান্তরি হতে চাইছে।'

বাংলাদেশের চেয়ে বেশি বেকার যুক্তরাষ্ট্রে!: প্রকাশিত বইয়ে বলা হয়েছে, ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী, দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র সাড়ে ৪ শতাংশ বেকার। আর ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের হার ছিল ৮ দশমিক ৩ শতাংশ। অনুষ্ঠানে লেখক বলেন, 'তাহলে কি আমরা খুব ভালো অবস্থায় আছি? না। মূল সমস্যা হলো, দেশের মানুষ কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু যথেষ্ট আয় করতে পারছে না। আবার অনেক মানুষ যথেষ্ট কাজ করছে না।'

একই প্রসঙ্গে সাবেক আমলা কাজী মেজবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আপনাকে কর্মসংস্থানের মধ্যে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু কাজ করে আপনি যে আয় পাচ্ছেন, তা দিয়ে দারিদ্র্য থেকে বের হতে পারছেন না। তাহলে বেকারত্বের হার ৪ শতাংশ হয়ে লাভ কী?'

বইয়ে বলা হয়েছে, ২০০৫ সালে দেশের মোট কর্মরত মানুষের অর্ধেকই দিনে মাত্র ১ দশমিক ২৫ ডলার (৯৮ টাকা) আয় করত। ওই সময় ভারতে এ হার ছিল ৩৯ শতাংশ।

শ্রমশক্তি জরিপ নিয়ে প্রশ্ন: পিআরআইয়ের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'দেশে কোন প্রেক্ষাপটে, কোন ঘটনাক্রমে (ফ্রিকোয়েন্সি) শ্রমশক্তি জরিপ করা হয়, তা আমরা জানি। এই ঘটনাক্রমে করা জরিপের তথ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কাজ করা সম্ভব না।'

জায়েদী সাত্তার বলেন, শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থান নিয়ে যেসব তথ্য-উপাত্ত আছে, তাতে যথেষ্ট গরমিল দেখা যায়।

কাজী মেজবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'শ্রমশক্তি জরিপ-২০১০টি পড়লে আমি খুবই বিরক্ত হই। কারণ এর ছত্রে ছত্রে ভুল।'

১২. তৈরি পোশাক খাত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাঃ বাংলাদেশের সম্ভাবনাই বেশি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতা এ সম্ভাবনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানিকারকদের সংগঠন ইউনাইটেড স্টেটস ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের এক গবেষণায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সম্ভাবনা ও সমস্যা দুটোই উঠে এসেছে। 'ইউএস ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বেঞ্চমার্কিং স্টাডি ২০১৫' শীর্ষক এই গবেষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব রোড আইল্যান্ডের সহকারী অধ্যাপক শেং লু। এতে মার্কিন বস্ত্র ও পোশাক খাতের বিভিন্ন ব্র্যান্ড, আমদানিকারক, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, তৈরি পোশাকের উৎস হিসেবে মার্কিন ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশ এখনো জনপ্রিয়। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতায় গত বছরের তুলনায় এবার তা কিছুটা কমেছে। গবেষণায় অংশ নেওয়া ৪২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন, আগামী দুই বছরে বাংলাদেশ থেকে পোশাক কেনার পরিমাণ বাড়াবে তারা। তবে ২০১৪ সালে এমন মত দিয়েছিল ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা।

দেশের পোশাকশিল্প ব্যবসায়ীরা বলছেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা ছাড়াও বিভিন্ন কারণে তৈরি পোশাকশিল্পে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে। কারখানা পরিদর্শনের কারণে কিছু কারখানা বসে গেছে। আবার অবকাঠামোগত সমস্যার কারণেও শিল্পে নতুন কারখানা আসছে না। ফলে খুব শিগগিরই এই অবস্থার উন্নতি হওয়ার আশা নেই।

পোশাক আমদানির উৎস হিসেবে মার্কিন ক্রেতাদের পছন্দের শীর্ষে আছে চীন। আগামী দুই বছরে চীনের বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশের কথা বলেছেন তাঁরা। পাশাপাশি তাঁদের চীনের ওপরও নির্ভরতা থাকবে বলে জানান। কারণ বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া এখনো কাঁচামালের জন্য চীনের ওপর নির্ভরশীল। তাই আমদানি খরচ বেশি হলেও চীন থেকে এখনই তাদের বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়।

তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশের বড় প্রতিযোগী দেশ হিসেবে ভিয়েতনাম, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার নাম উঠে এসেছে গবেষণায়। এতে অংশ নেওয়া মার্কিন ক্রেতারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে যাঁরা পোশাক কেনেন, তাঁদের ৮৭ শতাংশ ভিয়েতনাম, ৬৭ শতাংশ ভারত ও ৬০ শতাংশ ইন্দোনেশিয়া থেকে পোশাক ক্রয় করেন।

এদিকে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও

প্রতিযোগী দুই দেশ ভিয়েতনাম ও ভারতের চেয়ে পিছিয়ে আছে। পোশাক রপ্তানিতে চলতি বছরের প্রথম দুই ও তিন মাস শেষে বাজারটিতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ২ দশমিক ৮২ ও ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। একই সময়ে ভারতের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৭ দশমিক ৭১ ও ৯ দশমিক ৩৬ শতাংশ।
আগামী পাঁচ বছরে তৈরি পোশাক ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অধিকাংশ মার্কিন ব্যবসায়ী ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। গবেষণায় অংশ নেওয়া ৮৯ শতাংশ মনে করেন, এ ব্যবসার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ৪৩ শতাংশ মনে করেন, উচ্চ উৎপাদন খরচ বা আউটসোর্সিং ব্যয় প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। ৯০ শতাংশ ব্যবসায়ীর মতে, পরিচালন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় মুনাফা কম হচ্ছে।
তৈরি পোশাকিশল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি আতিকুল ইসলাম বলেন, 'প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর তুলনায় কেন আমরা পিছিয়ে পড়ছি, সেটি ভাবার সময় এসেছে। প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারানোর অন্যতম কারণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি। শুধু মুখে না বলে এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করা দরকার।'

১৩. সংখ্যায় শরণার্থী

২০১৪ সালে বিশ্বে শরণার্থীর সংখ্যা নজিরবিহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ বিশ্ব শরণার্থী দিবসের আগে বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচআরসির একটি প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে আশ্রয়প্রার্থী হওয়া এবং নিজের ভূমি থেকে জোর করে উৎখাত হওয়া মানুষের ওপর বার্ষিক এই প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে ইউএনএইচসিআর দেখিয়েছে, উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই শিশুমানুষই নিজেদের ভূমিতে ফিরে যেতে ৮০০হাজার ২৬লাখ ১কিশোর। আর মাত্র – ১৯৮৩পারবে। সালের পর থেকে এ পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে কম।
২০১৪ সালে শরণার্থী সংখ্যার ভয়ানক স্ফীতির কারণ মূলত সিরিয়ায় চলা গৃহযুদ্ধ। এটি বর্তমানে পঞ্চম বর্ষে পা দিয়েছে। এই যুদ্ধে মোট গৃহহীন মানুষের সংখ্যা ৪০ লাখেরও ওপরে। এর মধ্যে ৯৫ শতাংশ শরণার্থী হলো লেবানন, জর্দান, ইরাক, তুরস্ক ও মিসরের। প্রায় ৭৬ লাখের মতো সিরিয়ার সরকার ও বিরোধীদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে ঘরহারা হয়েছে। এর সঙ্গে বিষফোঁড়া হিসেবে দেখা দিয়েছে আইএস। জাতিসংঘের উদ্বাস্তুবিষয়ক হাইকমিশনার আন্তনিও গুটিরেস বলেছেন, 'আমরা এক দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বে উদ্বাস্তু সংখ্যা বাড়ছে খুব দ্রুতগতিতে। আর নিজ দেশ ছেড়ে ভিন্ন দেশে অভিবাসী হতে বাধ্য হচ্ছে মানুষ দুনিয়াজুড়ে অস্থিরতা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির কারণে।'
তিনি বলেন, 'এটা খুবই আশঙ্কার ব্যাপার যে, সংঘাত, হানাহানি ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে, শান্তিপ্রিয় মানুষ তার ভুক্তভোগী হচ্ছে। অথচ সংঘর্ষ থামানোর জন্য স্থায়ী কিছু করতে আমরা পুরোপুরিই ব্যর্থ হচ্ছি।'
মোট শরণার্থী
২০১৪ সালে ৬ কোটি (লাখ ৯৫কোটি ৫)শরণার্থী হয়েছে। ২০১৩ সালে এ সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ১২ লাখ। আর ১০ বছর আগে ২০০৪ সালে উদ্বাস্তু সংখ্যা ছিল মানুষের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৭৫ লাখ। ইউএনএইচসিআর বলেছে, ১ কোটি ৯৫ লাখ শরণার্থীসহ ২০১৪ সালে ৩ কোটি ৮২ লাখ মানুষ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এক কোটি ৮০ লাখ মানুষ অপেক্ষা করছে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করে। ২০১৪ সালে ১ কোটি ৩৯ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ২০১০ সালের তুলনায় এ সংখ্যা ৪০ গুণ বেশি।
৫০ শতাংশ শরণার্থীই শিশুকিশোর–
উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৫০ ভাগই অল্পবয়সী শিশুশটি আবেদন পাওয়া গেছে৩হাজার ৩৪কিশোর। –, যারা একা এবং তাদের মাবাবা হয় মারা গেছেন–, নয়তো হারিয়ে গেছেন। যুদ্ধের ডামাঢোলে কে কোথায় তার খোঁজ নেই। এসব শিশুর বেশিরভাই আফগানিস্তান, ইরিত্রিয়া, সিরিয়া, সোমালিয়া থেকে ভিটেমাটি হারিয়ে রাজনৈতিক

আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছে। গত ৫ বছর ধরে পৃথিবীতে মোট ১৫টি দেশ ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে চলছে।

কোন দেশ থেকে কত শরণার্থী

৭৬ লাখ বাস্তুহারা ও ৪০ লাখেরও বেশি শরণার্থী এসেছে সিরিয়া থেকে। এখান থেকেই সবচেয়ে বেশি শরণার্থী বেরোচ্ছে এখন। আফগানিস্তান থেকে প্রায় ২৬ লাখ এবং সোমালিয়া থেকে ১১ লাখ। সিরিয়ার পর এ দুটো দেশই দ্বিতীয় এং তৃতীয় স্থান দখল করেছে। অর্ধেকেরও বেশি শরণার্থী বেরিয়ে এসেছে এই তিনটি দেশ থেকেই। এছাড়া ইউক্রেনসহ কিছু ইউরোপীয় দেশ থেকেও শরণার্থী বেরিয়ে আসছে। এদিকে যেসব দেশ শরণার্থীদের আশ্রয় দিচ্ছে তাদের মধ্যে তুরস্ক সবার ওপরে। এক কোটি ৫৯ লাখ শরণার্থীকে নিজের দেশে স্থান দিয়েছে তারা। এছাড়া পাকিস্তান, লেবানন, ইরান, ইথিওপিয়া, জর্দান এসব দেশও শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে।

বিভিন্ন মহাদেশে অভিবাসী সংকট

ইউরোপ বেড়েছে ইউরোপে। সিরিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে এসব শতাংশ অভিবাসী সংখ্যা ৫১: শরণার্থী। তবে বেশকিছু সংখ্যক শরণার্থী আছে, যারা ইউক্রেন থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেছে।

এশিয়া শতাংশ বেড়েছে। প্রা ৩১সালে এশিয়ায় শরণার্থীর সংখ্যা ২০১৪:য় ৯০ লাখ এখানে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তার মধ্যে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের সংখ্যাও রয়েছে। যারা নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হয়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে ১৯ শতাংশ, সাব সাহারা আফ্রিকায় ১৭ শতাংশ, আমেরিকায় ১২ ভাগ শরণার্থী বেড়েছে।

১৪. জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে সাফল্যঃ সরকারকে আরো পথ পাড়ি দিতে হবে

সরকারের আপসহীন নীতির ফলেই জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশে সুবিধা করতে পারছে না– মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এ প্রতিবেদন স্বস্তিদায়ক। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেলে জঙ্গিপনা কী জঘন্য চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হতে পারে তার নজির তো খোদ বাংলাদেশই। বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে পরিচালিত ও সংঘটিত জঙ্গি কর্মকাণ্ড শুধু আমাদের না, আন্তর্জাতিক মহলকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। জঙ্গিবাদকে রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়দানের সেই ধারা চলমান থাকলে কিংবা আওয়ামী লীগ সরকার ধারাবাহিকভাবে জঙ্গিবাদবিরোধী অবস্থানে অনড় না থাকলে দেশ কোথায় যেত ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

আল-কায়েদা ও তালেবানের উত্থানের পর বাংলাদেশে তাদের অনুসারী তৈরি হতে সময় লাগেনি। অতি সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে 'ইসলামিক স্টেট' জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থানের পরও একই প্রবণতা লক্ষণীয় এবং ইতিমধ্যে বেশ কিছু জঙ্গি গ্রেপ্তারও হয়েছে। এমন এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে আমাদের আরো সতর্ক থাকতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, সন্ত্রাসী সংগঠনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি এবং সন্ত্রাসবাদবিরোধী প্রচেষ্টা ছিল, তাই বাংলাদেশ আন্তর্দেশীয় সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। এ কথায় এ বার্তাই স্পষ্ট যে জঙ্গিরা মরিয়া এবং সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জঙ্গিরা তাদের অস্তিত্ব বারবার জানান দিচ্ছে। আমরা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার একাধিক চেষ্টা অতীতে দেখেছি। ছায়ানট, উদীচীসহ মুক্তচিন্তার চর্চাকারী সংগঠনগুলোর অবকাঠামোতে কাপুরুষোচিত হামলার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে মুক্তচিন্তামনা বিভিন্ন ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডও আমরা দেখেছি। তবে রয়েছে বিচারপ্রক্রিয়ায় ধীরগতি। জঙ্গি ঘাঁটি শনাক্তকরণ ও গ্রেপ্তারেও বড় কোনো সাফল্য নেই। এই দুর্বলতা কাটাতে হবে। প্রয়োজনে সন্ত্রাসবাদবিরোধী বাহিনী গঠন ও জঙ্গিদের দ্রুত বিচারে ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে; রয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব। তাদের কারো কারো সততা প্রশ্নবিদ্ধ। জঙ্গিবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল উপাদানের অস্তিত্ব থাকাও অস্বাভাবিক নয়। সর্বোপরি, জঙ্গিবাদ যেসব পরিবেশে উৎসাহিত হয়, যেসব উপাদানে জোর পায় নানা আকারে, সেগুলোর অস্তিত্ব আছে এখানে।

জঙ্গিবাদের প্রসারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক যেসব অপশক্তি ভূমিকা রাখে, সেগুলোতে আঘাত হানতে হবে। মার্কিন প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে যে বিভিন্ন এনজিও জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোকে অর্থ সহায়তা দিচ্ছে। চ্যানেলগুলো রুদ্ধ করতে হবে। এ ছাড়া মুক্তচিন্তার প্রসারের মধ্য দিয়েই সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে যায় এবং এটি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে কেউ কেউ ভ্রান্তবিশ্বাসে প্রলুব্ধ হয়। তাই মুক্তবুদ্ধিচর্চাকে উৎসাহ দানের মাধ্যমে আদর্শিক লড়াইটাও জোরদার করতে হবে। এককথায় জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় সরকারের কৌশল হতে হবে বহুমুখিন, অভিযানও হওয়া চাই আরো সাঁড়াশি।

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com